সুদূর নীহারিকা

সুদূর নীহারিকা

ভিয়েতনামের ছোট গল্পের সংকলন

অনুবাদ : মীরা ভঞ্জ

ন্যাশনাল বুক এজেন্সি

DISTANT STARS

A 'COLLECTION OF VIETNAM SHORT STORIES

মে ১৯৫৫

প্রকাশক

সলিল কুমার গাংগুলি

ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড

১২ বঙ্কিম চাটার্জী স্ট্রীট

কলকাতা-৭০০ ০৭৩

মুদ্রক

দুলাল দাশগুপ্ত

ভারতী প্রিন্টিং ওয়ার্কস

১৫ মহেন্দ্র সরকার স্ট্রীট

কলকাতা-৭০০ ০১২

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা : শ্রীগণেশ বসু

সুদূর নীহারিকা

সূচীপত্র

ভূমিকা

মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসে ভিয়েতনাম একটি অবিস্মরণীয় নাম। ১৯৫৫ সালের পর মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীরা যখন এই ছোট্ট দেশ ভিয়েতনামের উপর তাদের নৃশংস আক্রমণ ও অত্যাচার বাড়িয়ে তুলেছিল আর ভিয়েতনামের মানুষ জনযুদ্ধের মাধ্যমে তাদের সঙ্গে মোকাবিলা করছিল সেই ভীষণ অগ্নিপরীক্ষার যুগে এই সংকলনের গল্পগুলি রচিত।

এই জীবনমরণ যুদ্ধের মধ্যেও ভিয়েতনামের মানুষ তাদের জীবনের সূক্ষ্মতর অনুভূতিগুলি নষ্ট হতে দেয় নি, ভুলে যায় নি তাদের সাহিত্য সংস্কৃতির কথা। সংগ্রামের সঙ্গে সঙ্গে তারা সৃষ্টি করেছে নতুন নতুন শিল্প, সাহিত্য, চারুকলা এমন কি চলচ্চিত্র। সাহিত্য ক্ষেত্রে তাদের অবদানের অন্যতম উদাহরণ এই ছোটগল্পের সংকলন—'সুদূর নীহারিকা'।

এই সংকলনের বেশির ভাগ গল্পই নারীচরিত্র প্রধান আর এর এগারোটি গল্পই মহিলা গল্পকার দ্বারা রচিত।

গল্পগুলির ভিতর দিয়ে আমরা একদিকে যেমন ভিয়েতনামের মেয়েদের অসীম বীরত্ব আর সাহসের কথা জানতে পারি অন্যদিকে সমাজতান্ত্রিক গঠনমূলক কাজে তাদের নিষ্ঠা, তাদের আত্মত্যাগের কাহিনীর সঙ্গে পরিচিত হই। সমাজতান্ত্রিক উন্নয়নের প্রচেষ্টায় কোন কাজেই অনীহার অবকাশ থাকে না। যে আত্মত্যাগ দেশপ্রেমের অনুপ্রেরণা থেকে জন্ম নেয় তা' পবিত্র, তার নামান্তর 'উৎসর্গ'।

গল্পগুলিতে শুধু প্রেম, মায়া, মমতা আর মাতৃত্বের ছবি ফুটে ওঠে নি এর পটে আঁকা হয়েছে অন্তরের অন্ধকারে লুকিয়ে থাকা হিংসা, সন্দেহ, সংশয়, স্বার্থ আর আত্মপ্রতিষ্ঠার লোভ। শুধু তাই নয় এইসব ব্যক্তিগত দুর্বলতাগুলি কেমন করে একে অপরের সাহায্যে জয় করেছে তারা, তার দৃষ্টান্ত দু' একটি গল্পে সুন্দরভাবে প্রকাশ পেয়েছে।

প্রথম গল্প 'সুদূর নীহারিকা' যেটি দিয়ে বইটির নামকরণ করা হয়েছে সেটি তাৎপর্যপূর্ণ। তিনটি তরুণী পাহাড়ের গুহায় থাকত আর তাদের প্রধান কাজ ছিল পাহাড়ের ওপরে উঠে রাতদিন শত্রুর বোমায় সৃষ্ট গর্তগুলি ভরাট করে চলা যাতে পাহাড়ের গা-মাথা কেটে তৈরি করা রাস্তায় যুদ্ধের প্রয়োজনে যানবাহন চলাচল অব্যাহত থাকে। এদের উদ্দেশ্য করেই কোন এক চলন্ত ট্রাকের চালক একবার ছুঁড়ে দিয়েছিল একটি কবিতা, তাতে এদের নাম

দিয়েছিল সে—'সুদূর নীহারিকা'। মেয়ে তিনটি ভেবেই পায় না তারা 'সুদূর' হবে কেন? তারপর আলোচনায় ঠিক করল তারা কথাটি নিছক ছন্দ মেলানোর জন্যেই ব্যবহৃত হয়েছে। তারা নিজেদের কখনোই সুদূর কিম্বা নিঃসঙ্গ মনে করত না। তাদের পাশে দাঁড়াবার জন্যে তো রয়েছে বহু সাহায্যকারী দল, সংযোগরক্ষাকারী কর্মীরা—সবচেয়ে বড় কথা সারা দেশের মানুষ।

অনেকগুলি গল্পের মধ্যে আবার মাতৃত্বের অপরূপ রূপ ফুটে উঠেছে। 'মায়ের মন' গল্পটিতে আমরা বিশেষ করে লক্ষ্য করি এক বৈচিত্র্যময় মাতৃত্বের অনবদ্য পরিস্ফুটন।

অবাক হয়ে যেতে হয়, যখন দেখি বিভিন্ন সমবায় সমিতির সঠিক নেতৃত্ব দিচ্ছে অল্পবয়সী মেয়েরা।

সমাজতান্ত্রিক সংগঠনের কর্মীদের চিত্তবিনোদনের প্রয়োজনও উপেক্ষিত হয় নি সে দেশে—তাই তারা গড়েছিল 'জাগরণী সভা' আর প্রায়ই অনুষ্ঠিত হতো নানা জায়গায় জলের মধ্যে পুতুল নাচ।

শেষ গল্পটিতে ব্যক্তিবিশেষের অতিমাত্রায় আত্মপ্রত্যয় আর আত্মম্ভরিতা দেশের ও সমবায় সংগঠনের কতটা ক্ষতি করে সে কথা যেমন দেখি, তেমনি আমরা শিখতে পারি সমাজতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় যৌথ প্রচেষ্টায় কী করে এই দুর্বলতাগুলি কাটিয়ে ওঠা সম্ভব।

এই সংকলন প্রসঙ্গে দু' একটি ব্যক্তিগত কথা না বললে এই ভূমিকা সম্পূর্ণ হবে না মনে করি। আমার অনুজপ্রতিম দেবর শ্রীগোপেন ভঞ্জ ভিয়েত-নামের ছোট গল্পগুলির সন্ধান আমায় দেন এবং তাঁরই অনুপ্রেরণায় আর সাহায্যে 'একসাথে' পত্রিকার সঙ্গে আমার লেখার প্রথম পরিচয় ঘটে। শ্রীমতী কনক মুখোপাধ্যায় ('কনকদি') এই সংকলনের সব কটি গল্পই প্রকাশ করেন 'একসাথে' পত্রিকায়। সংকলনটি সম্পূর্ণ করার ব্যাপারে শ্রদ্ধেয়া কনকদির কাছে আমি অপরিসীম উৎসাহ ও আন্তরিকতা পেয়েছি। তাঁর কাছে আমি চিরকৃতজ্ঞ।

ন্যাশান্যাল বুক এজেন্সি আমার সংকলনটি প্রকাশ করার দায়িত্ব নিয়ে বাধিত করেছেন। তাদেরও আমি আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

মীরা ভঞ্জ

সুদূর নীহারিকা

লে মিন্ খুয়ে

পাহাড়ের কোলে একটা গুহায় থাকি শুধু আমরা তিনজন। তিনটি মেয়ে আমরা। সামনে একটা রাস্তা, সেটা উঠে গেছে পাহাড়ের ওপর, তারপর চলে গেছে সেটা আরো অনেক দূর—কোথায় তা জানে না কেউ। বোমার আঘাতে ক্ষতবিক্ষত এবড়ো-খেবড়ো রাস্তাটার বুকের আস্তরণে কোথাও লাল মাটির কোথাও বা সাদাখড়ির রং ধরা। পথের দুপাশে বিন্দুমাত্র সবুজের চিহ্ন নেই কোথাও। পাতাঝরা পোড়া গাছের ডালপালা তাদের ছেঁড়া খোঁড়া শেকড় নিয়ে ছড়িয়ে আছে চারিদিকে। তার সঙ্গে ছড়িয়ে আছে বড়ো বড়ো পাথরের চাঙড়, কিছু পুরনো ড্রাম, মরচে পড়া, অর্ধেকটা মাটিতে গেঁথে যাওয়া ট্রাকের ভগ্নাবশেষ।

আমাদের কাজ? এখানেই থাকা। যখন বোমা পড়ে আমাদের তখন পাহাড় বেয়ে উঠে যেতে হয় বোমার আঘাতে যে গর্তগুলো তৈরি হলো সেগুলো গুণে নিয়ে ভরাট করবার জন্যে। তারপর না-ফাটা বোমাগুলোকে সব খুঁজে খুঁজে নিয়ে সেগুলোকে অকেজো করে ফেলতে হয় আমাদের। ওরা আমাদের বলে—"পথসংরক্ষণকারী দল"। এই নামটা জাগিয়ে তোলে আর উদ্দীপ্ত করে বীররস। আমাদের কাজটা কিন্তু সহজ নয় একেবারেই। বোমাপড়ার সময় প্রায়ই আমরা চাপা পড়ি ধ্বংসস্তূপে, তারপর আমরা নেমে আসি পাহাড়ের কোলে। মুখ-গুলো তখন চাপা পড়ে যায় ধুলোবালিতে, দেখা যায় শুধু আমাদের চোখগুলো আর আমাদের হাসিমুখের দাঁতের সারি। এই রকম সময়ে আমরা নিজেরা নিজেদের বলি—"কালো চোখো শয়তান"।

আমাদের সংস্থা সত্যিই কিন্তু খুব দেখাশুনো করে আমাদের। তাদের হাতে যখনই মালের যোগান আসে তারা তা থেকে সব সেরা জিনিসগুলো পাঠিয়ে দেয় আমাদের—"পাহাড়ের ওপরকার এই নিঃসঙ্গ কর্মীদলের" জন্যে।

তবে এটা তো ঠিকই যে সংস্থার লোকেরা সারাদিনে কেবলমাত্র সন্ধ্যার মুখে শুধু একবার আসে এখানে, মাঝে মাঝে হয়তো তারা থেকেও যায় সারা-রাত। কিন্তু আমরা, শুধু সারাদিন ধরে পাহাড়ের ওপর উঠছি আর নামছি। আর এই পাহাড়ের বুকে দিনের আলো—এটাও কোন হাসির কথা বলে মনে হয় না। কারণ মৃত্যু রসিক নয়—সে লুকিয়ে আছে বোমার বুকে। এই দেখ

আমার উরুর ওপরের এই ক্ষত চিহ্ন। এটা সারে নি এখনও। মিলিটারি হাসপাতালে স্বভাবতই যেতে পারছি না আমি। প্রত্যেক জিনিসেরই একটা ভালো দিক থাকে, তাই না? তবে বলো তুমি কোথায় দেখেছ এমন পৃথিবী যে শুধু ধোঁয়া ওগরাচ্ছে? বাতাস তরাসে কাঁপছে অপসৃয়মান বিমানের গর্জনে? স্নায়ুগুলো ছিঁড়ে পড়তে চাইছে, পাগলের মতো উত্তাল হয়ে উঠেছে হৃৎপিণ্ড, পায়ের হাঁটুগুলো ঠকঠক করে কাঁপতে থাকে কেন না আমরা জানি এখানেই চারপাশে কোথাও না কোথাও হয়তো পড়ে আছে কোন না ফাটা বোমা আর সেটা যে-কোন মুহূর্তেই ফেটে যেতে পারে। যাকৃগে! তারা কোনো না কোনো একদিন ফাটবেই। ভেবে কী লাভ! তাই কাজ যখনই শেষ হয় আমরা রাস্তার দিকে এক-নজর চেয়ে একটা তৃপ্তির শ্বাস ফেলে তাড়াতাড়ি পাহাড়ের কোলের গুহাটার দিকে চলে আসি। গুহার বাইরের উত্তাপ ৩০ ডিগ্রি সেণ্টিগ্রেড কিন্তু ভেতরটা যেন এক অন্য জগৎ। এই ঠাণ্ডা হঠাৎ কাঁপিয়ে দেবে তোমায়। আমরা মাথা উঁচু করে বড়ো বড়ো ঢোঁকে পাত্রের সব জলটাই প্রায় খেয়ে ফেলি। ঝরণার জল ভারী মিষ্টি। তারপর ভেজামাটিতে চোখ দুটোকে আধবোজা করে শুয়ে পড়ি। সবসময় নতুন ব্যাটারী দিয়ে যত্ন করে রাখা ট্রানজিস্টারে নিবেদিত সুরে মূর্চ্ছনা হয়তো কখনও আমাদের কানে পৌঁছয়, কিছুটা আবার কখনও একেবারেই পৌঁছয় না। আমরা হয় শুনি নয়তো স্বপ্ন দেখি।

দেখে মনে হয় এক উদ্ভট সমর অভিযান করতে চলেছি আমরা। প্রতি রাতে সীমাহীন যানবাহন সার বেঁধে চলেছে রাস্তা দিয়ে। রাতে সাধারণত ঘুমোই আমরা—কিন্তু এখন ঘুমোচ্ছি না। আমরা আমাদের কুশলী-উচ্চতায় উঠে গিয়ে গাঁইতি আর বেলচায় করে মাটি সরাই আর চলন্ত ড্রাইভারদের সঙ্গে হাসি-ঠাট্টা করি। তবে আমরা তিনজনেই একই সঙ্গে হাসতে পারি না। কারণ যে কোন একজনকে গুহায় রাখা টেলিফোনটার সামনে বসে থাকতে হয় আর তাই সে বেচারার হাসা হয় না।

এখন দুপুর। কী অদ্ভুত নিস্তব্ধতা চারিদিকে। আমাদের গুহার পাথরের দেওয়ালে পিঠ হেলান দিয়ে বসে গান গাইছি। গান গাইতে ভালোবাসি আমি। যে সুরই হোক না কেন তাতেই কথা বসিয়ে নিই। কথাগুলোর মাথা-মুণ্ড নেই কোনো। মাঝে মাঝে এমন মজার হয় সেগুলো যে আমি নিজেই হেসে মরি।

হ্যানয় থেকে এসেছি আমি। দেখতে খুব একটা খারাপ নয় আমাকে। মরাল গ্রীবা, নরম ঘন চুল, আর চোখ—ভালো কথা ড্রাইভাররা বলে তাতে নাকি "মাখানো আছে সুদূরের স্বপ্ন"।

সুদূরের? কোথাকার? অবশ্য এতে কিছু আসে যায় না। আসল কথা

হলো আর্শির ভেতর দিয়ে আমি আমার চোখদুটোকে দেখতে ভালোবাসি। বাদাম চেরা চোখ, তারাগুলো কালো আর চোখের পাতার ভাঁজটা এমনই ধরনের যে মনে হয় যেন খুব চড়া সূর্যের আলোর দিকে চেয়ে আছি।

আমি জানি না স্থলবাহিনীর সেনা আর ড্রাইভাররা একে তাকে দিয়ে কিম্বা বড় বড় চিঠি দিয়ে কেন খোঁজ করে আমার? এগুলো দেখেশুনে মনে হয় আমি যেন তাদের থেকে যোজন যোজন দূরে আছি—কিন্তু সত্যিই তো আর তা নয়! ওরা তো আমার চারপাশেই আছে, প্রত্যেক দিনই তো ওদের সঙ্গে দেখা হয় আমার। আমি খুব সপ্রতিভ মেয়ে নই। আমার কমরেডরা যখন কোন একজন ভালো বাক্‌পটু সৈনিককে হাসিঠাট্টায় উত্যক্ত করে সাধারণত তখন আমি একটু দূরে সরে হাতদুটোকে বুকের ওপর কোণাকুণি রেখে ঠোঁটদুটো একদম বুজিয়ে অন্যদিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে থাকি। অবশ্য এটাও একটা ছলনা মাত্র। সত্যি বলতে কি এই টুপিতে স্টার লাগানো ইউনিফর্ম পরা লোকগুলোকে আমার মনে হয় পৃথিবীর সব থেকে সুন্দর, চালাক, সাহসী আর মহৎ লোক বলে।

স্বভাবতই এই সব কথা কাউকে বলি না আমি। কিন্তু এই রাস্তা দিয়ে যারা যায় তারা সবাই আমার সঙ্গে শ্রদ্ধা আর আন্তরিকতার সুরে কথা কয়।

আমার বন্ধুরা কৈফিয়তের সুরে বলে "এটা স্বীকার করতেই হবে যে তোমার সম্বন্ধে কিছু বলতে গেলে তোমাকে শুধু দেখতে সুন্দর আর তুমি ভালো গান করো—এটুকু বললেই যথেষ্ট বলা হবে না। সেইসঙ্গে এটাও বলতে হবে যে তুমি শয়তানের মতো ধ্বংস করতে পার শত্রুপক্ষের বোমাগুলোকে"। অবশ্য এটা কিছুটা অতিশয়োক্তি।

বাইরে গভীর নিস্তব্ধতা। গত দশ ঘণ্টার মধ্যে পাহাড়ের ওপর কোনো বিমানের ছায়াও দেখা যায় নি। আরো দক্ষিণে বোমা ফেলছে ওরা—ওইদিক থেকে শোনা যাচ্ছে একটা আওয়াজ। নিস্তব্ধতার মাঝে দূর থেকে আসা ওই চাপা গর্জন অমঙ্গলেরই ইশারা আনছে। আগুন ছড়াচ্ছে সূর্য। শুকনো হয়ে উঠেছে হাওয়া। তবু গুহার মধ্যে এখনও বেশ ঠাণ্ডা।

নো বালিশের ওয়াড়ে ছুঁচের কাজ করছে। প্রত্যেকেরই নিজস্ব পছন্দ মাফিক এক একটি নেশা আছে। নো ছুঁচের কাজ করতে ভালোবাসে। থাও কোলের ওপর একটা ছোট নোটবই রেখে গানের কথা টুকছে। ওরা গল্প করছে আমি কিন্তু শুনছি না। হঠাৎ একটা কথা এসে কানে বাজল আমার। "কখন শেষ হবে এসবের"? কথাটা বললো নো।

"কী"? থাও নত করে রইল তার চোখ দুটো কিন্তু গলার স্বরে ফুটে উঠল বিস্ময়।

নো হাই তুললো। উত্তর দিল না কিছু। কিন্তু আমি জানি কি বলতে

চাইছে নো। যুদ্ধ শেষ হলে ও জলবিদ্যুৎ কেন্দ্রে একটা কাজ চাইবে। ও ঝালাইয়ের কর্মী হতে চায়। কারখানার ভলিবল দলে যোগ দেবে ও তখন, হয়তো জাতীয় দলের হয়ে খেলবার জন্যে ওকে বেছে নেবে কেউ।

থাও-এর পছন্দ চিকিৎসা বিজ্ঞান। তার স্বামী হবে একজন সেনাধ্যক্ষ। প্রায়ই কাজের জন্যে দূরে যেতে হবে তাকে আর তার গালে থাকবে এ-কান থেকে ও-কান পর্যন্ত ছড়ানো দাড়ি। পায়ে পায়ে জড়িয়ে থাকা স্বামী পছন্দ করে না থাও। ও বলে তাতে ভালোবাসার স্বাদ কমে যায়।

আর আমি? আমিও ভালোবাসি আমার ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা নিয়ে কথা বলতে। বিরাট পরিকল্পনা কিন্তু সেগুলো কী নিয়ে? আমি কি স্থপতি হবো? দারুণ! নাকি শিশুচলচ্চিত্রের ঘোষিকা হবো? কোনো খনিতে কী ক্রেন চালানোর কাজ নেব—না, কোন গাথুনির কাজ চলছে এমন জায়গায় গানের দলে যোগ দেবো? সব কাজেই আছে সুখ, সর্বত্র আনন্দ। এই পাহাড়ে যে উদ্দীপনা আর উৎসাহ নিয়ে কাজ করছি সেখানেও ঠিক একইভাবে কাজ করতে পারবো আমি। আমরা নিঃসন্দেহে বলতে পারি যে এই পাহাড়ই আমাদের সব স্বপ্ন আর পরিকল্পনার মাতৃক্রোড়।

কিন্তু এসব তো অনেক পরের কথা। আজ আমরা রক্ষা করছি এই যে পথকে, যুদ্ধ শেষে সেই পথ যখন হয়ে উঠবে বাঁধানো মসৃণ পথ এসব তখনকার কথা। তখন উচ্চশক্তিসম্পন্ন এই বৈদ্যুতিক লাইনগুলো গভীর অরণ্যকে এফোঁড় ওফোঁড় করে চলে যাবে আর সেই কাজের জন্যে খুঁটি পোতার কাজ চলবে রাতদিন। এসব সেই সে দিনের কথা। তবে এগুলো যে ঘটবেই এ ব্যাপারে আমাদের তিনজনেরই দৃঢ় বিশ্বাস আছে।

নো তার ছোট সাদা বালিশের ওয়াড়ে কিছুটা মোটা ধরনের চড়া রঙ-বেরঙের ফুল তোলে। ওর ছুঁচের কাজের লাইনগুলো খুব মোটা মোটা। এ বিষয়ে আমরা কিছু মন্তব্য করলে ও দৃক্‌পাত না করে সেলাই করে চলে। আমাদের সমালোচনা বেশি কড়া হলে সে তার সুন্দর সাজানো দাঁত দিয়ে সুতোর বাড়তি অংশটা কেটে সেলাইটা আঁকড়ে ধরে বলে "বেশ চোখে পড়ার মতো হবে বলেই এটাকে এইভাবে করছি আমি।"

স্বকীয় ভঙ্গি বলতে যা বোঝায় এই মেয়েটির মধ্যে মূর্ত হয়ে আছে তা। মিষ্টি হাসিখুশি ভাবের সংগে এক জান্তব একগুঁয়েমি আছে ওর মধ্যে। ওর চারিত্রিক গুণগুলো একে অপরের বিরোধী নয়, বরং পরিপূরক হয়ে ওকে এক অপূর্ব ব্যক্তিত্বের মহিমায় উজ্জ্বল করেছে। আমি এখানে আসবার পর থেকে সকলে একই সংগে আছি। এখানে আসার পর প্রথমে সবই অদ্ভুত লাগতো আমার।

মাটি বইতে গিয়ে আমি খুব আশ্চর্য হয়েছিলাম। "এটাই কি যুব স্বেচ্ছা-বাহিনীর কাজ? জঞ্জাল বওয়া"। আপত্তি তুলেছিলাম আমি। আমার ধারণা ছিল যুব স্বেচ্ছাবাহিনী রাইফেল কাঁধে নিয়ে অন্ধকার রাতে পদধ্বনি জাগাবে অরণ্যের বুকে, আর তাদেরই দু'একটি সংক্ষিপ্ত কথার বিনিময়ে অরণ্যে জেগে উঠবে এক অভিনব জিগির।

কিন্তু আমি শুধু জঞ্জালই বইতে লাগলাম। তারপর সেটাই অভ্যাস হয়ে গেল আমার।

বহুদিন খাবার সময় ভাতগুলোকে গলা দিয়ে নামাবার জন্যে একটু ঝোলও জোটে না আমাদের। তখন ভাতগুলো জল দিয়ে গিলি আমরা। এসব দেখে লোকে দাক্ষিণ্যের দৃষ্টিতে চায়। বোমার সংগে প্রথম পরিচয় মুহূর্তে আমাদের মধ্যে যারা নতুন তারা প্রায়ই জ্ঞান হারিয়ে ফেলে।

কিন্তু এখন আমরা বেশ অভ্যস্ত হয়ে গেছি এসবে।

নো আসার কিছু পরে এ দলে যোগ দিয়েছি আমি। প্রথম দিনে একটু ঘাবড়ে গিয়েছিলাম। ক্যাম্পের পেছন দিকে একটা গাছের ডালে জিনিসপত্রগুলো রেখে দাঁড়িয়ে ছিলাম আমি। নো তখন ফিরছিল নদী থেকে চান করে। ওর চুল থেকে জল ঝরছিলো। কপালে নাকে ফোঁটা ফোঁটা জল। আমি ভাবছিলাম জলের অভাব নেই এখানে, হয়তো সাঁতারও কাটা যাবে। নো আমাকে দেখে কিছুক্ষণের জন্যে থামলো, তারপর কোন কথা না বলে তার ভিজে তোয়ালেটা নিংড়োতে নিংড়োতে ধীরে ধীরে এগিয়ে আসতে লাগল। সে পায়ের ক্যানভাসের জুতো থেকে আমার মাথা পর্যন্ত দেখে নিল নিজের মাথা নেড়ে নেড়ে। জুতোর গা থেকে কাদা ছাড়াবার জন্যে আমি তখন পায়ে পা ঘসছিলাম।

"কোন্ শাখা থেকে এসেছো তুমি?" নো জিজ্ঞাসা করল,—"কোন্ শহর থেকে এলে—তোমার নাম কী"?

জুতো ঘষা থামিয়ে একটু রক্ষাত্মক ভংগিতে দাঁড়িয়ে ছিলাম আমি। স্কুলে সামরিক শিক্ষাক্রমে মুষ্টিযুদ্ধ শিখেছিলাম। কোমরে মুষ্টিবদ্ধ হাত রেখে রক্ষাত্মক ভংগিতে ভাবছিলাম আমি—"একে মারতে হবে নাকি? কোথা থেকে শুরু করবো? ও যদি আমায় মারতে আসে তাহলে হাতের একটা বিশেষ অংশে অল্প চাপ দিয়ে একটা ঘুঁসি মেরে অসাড় করে দেব ওকে"।

কিন্তু ঠিক তখনই সে তার হাত দুটো পকেটে পুরে তার চলার গতির পরিবর্তন করে মাথা নেড়ে আমাকে ইশারা করে সি, পি-তে ঢুকল আর আমি শুধু অনুসরণ করলাম ওকে।

সেদিন থেকে দুজনে দুজনকে লক্ষ্য করেছি। ধীরে ধীরে পরস্পরকে

চিনেছি, আমরা জড়িয়ে গেছি এক অচ্ছেদ্য বন্ধনে। ঠিক কবে যে এটা ঘটল ভুলে গেছি তা। আমাদের দুজনেরই বয়স ষোল। কোন অভিজ্ঞ ব্যক্তি যদি কোন নবাগতার ওপর কর্তৃত্বের ভঙ্গি দেখায় তাতে তো আশ্চর্য হবার কিছুই নেই, তাই তাকে ভালবাসতে শুরু করলাম আমি। নো-র চরিত্র অপূর্ব সুন্দর। সে ছেলেদের তাকে বিরক্ত করবার সুযোগ দেয়, কিন্তু তবুও তারা জানে যে এ মেয়ের ঘনিষ্ঠ হওয়া তাদের পক্ষে সম্ভব নয়।

ঠিক আমারই মতো সেও স্বাধীনভাবে থাকাটা পছন্দ করে। আমরা দুজনে বলতাম-"ও, ভালোবাসা! ঠিক আছে, কিন্তু বিয়ে করা—ওরে বাবা, সেটা কখনও নয়। ও একটা ভীষণ ব্যাপার। বুটিদার সাজসজ্জা, ঢাকাঢাকি, মশারী, রান্নাবান্না— আরো কত কী! বেড়াবার সময় থাকবে না মোটে। তার থেকে ছেলে-বন্ধু থাকা ঢের ভালো। সে আমাদের ছবি দেখতে নিয়ে যাবে, রাগ করলে খুশি করবার চেষ্টা করবে আর আমারও ইচ্ছে মতো পড়াশুনা করতে পারবো।"

পুরুষ বন্ধুর কথা যদি বলো তো নো-র ইতিমধ্যেই মিলে গেছে একজন। এক মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার। নো-কে সে অনবরত চিঠি পাঠাচ্ছে। তার কৈফিয়ৎ হলো ফ্রন্ট লাইনের চেয়ে হ্যানয়ের লোকেদের অনেক বেশি কাজ থাকা সত্ত্বেও তাদের হাতে চিঠি লেখবার মতো প্রচুর সময় থাকে তবুও নো-র কাছে তার নিজের দুবছর বয়সের একটা ছবি ছিল সেটাই সে ছেলেটিকে দিয়েছে, আর ছেলেটি সেটাই রেখে দিয়েছে। একটা একশো বছরের পুরানো গাছের তলায় ইজেরবাডি পরে দাঁড়িয়ে থাকা এক ছোট্ট মেয়ের ছবি। বুকে তার কালো রঙের এপ্রন, বড়ো কানাওয়ালা কাপড়ের টুপি মাথায়—হাতে তার বুনোফুলের তোড়া। ছেলেটি নো-কে যে চিঠিগুলো পাঠায় সেগুলো বহুবার পড়েছি আমি। সেই লেখার খানিকটা নমুনা দিচ্ছি এখানে—"আমি ভালো আছি। ফুটবল খেলতে ভালোবাসি আমি। আমার পেশীগুলোর বেশ ভালো উন্নতি হচ্ছে। আমি তোমার দুবছর বয়সের ছবিটা দেখি কিন্তু সেটা দেখে এখন তোমাকে দেখতে কেমন হয়েছে সেটা কল্পনা করতে পারি না কিছুতেই। আমি নিজের মনে বলি—এই তুমি, ফুলের তোড়াহাতে ছোট্ট তুমি। তোমাকে বেড়াতে নিয়ে যাব আমি—তোমাকে লজেন্স কিনে দিয়ে জিজ্ঞেস করব— তুমি কোথায় যেতে চাও, আমাকে বলো? কাকা তোমাকে সেখানেই পেঁছে দেবে। কী মজার খেলা! তবু এগুলো পড়েও হাসবার কথা ভাবতে পারি না আমরা। বিষন্ন চোখে উত্তর দিকে চাই। হ্যানয়—আমরা যাকে ছেড়ে এসেছি অনেকদিন আগে। ওখানেই ওপরের দিকে কোথাও লুকিয়ে আছে আমাদের

হ্যানয়। এখানে এই পাহাড়ের কোলে বড়ো হয়ে উঠেছি আমরা কিন্তু তবুও হ্যানয়কে একটি মুহূর্তের জন্যে ভুলতে পারি না।

একটা সরু গলি, দুপাশে বহু পুরানো ধূসর গাছের সারি। সেই গলির শেষে একটা পুরানো বাড়ির দোতলার একটা ছোট ঘরে থাকতুম আমি। রাতে আমার জানলার ধারে বসে অন্ধকারে সারবাঁধা বাড়ির ছাদগুলোর দিকে চেয়ে প্রাণের আনন্দে জোর গলায় একের পর এক গান গেয়ে যেতাম আমি। আমার সব থেকে কাছের প্রতিবেশী একজন ডাক্তার ভদ্রলোক সেই গানের জ্বালায় সহজে ঘুমোতে পারতেন না। আলো জ্বালিয়ে খুব ভদ্রভাবে আমার দেওয়াল চাপড়াতেন। মাসের মধ্যে বার কুড়ি এই ঘটনার পুনরাবৃত্তি হতো। আমি শান্ত হয়ে তখন তাঁকে ঘুমোতে দিতাম। আর আত্মপক্ষ সমর্থনে নিজেকেই বক্তৃতা দিতাম নিজে—"শহরের মধ্যে—একমাত্র আমিই উপলব্ধি করতে পারি রাত্রের অসীমতা আর পবিত্রতার স্পর্শ। আমার চোখের সামনের এই অপূর্ব ছবি ডাক্তার দেখতে পাবে কি করে? তার চোখে যে মাখানো আছে রূঢ় বাস্তবের স্বপ্ন!" একদিন গানের ঝোঁকে জানলা থেকে প্রায় পড়ে যাচ্ছিলুম। কাঁপা হাতে চেপে ধরেছিলাম জানলার পাল্লাটা। মাথাটা ঘুরছিল ভীষণ, চোখের সামনে শুধু গভীর অতলতা। একটা জলের কল ছিল নিচে। লম্বা পাত্রে সারারাত টুপটুপ ক'রে জল পড়তো সেটা দিয়ে। একটানা জল পড়ার আওয়াজ শুনে মনে হতো ওই জল বুঝি পেঁছে যাবে আমার জানলায়। আমি তখন নিচু গলায় গান গাইতাম আর কান খাড়া থাকতো দেওয়াল চাপড়ানো আওয়াজের প্রতীক্ষায়।

মা একটা টেবিল তৈরি করিয়ে দিয়েছিলেন আমাকে। আমার ঘরের এক-কোণে থাকত সেটা। কিছু লিখতে হলেই আমি টেবিলের ড্রয়ার থেকে সব বইপত্র, ব্যাগ বার করে টেবিল বিছানা সবকিছুর ওপরে ছড়িয়ে ফেলতুম। তার-পর এমন অবস্থা হতো যে সেই কাগজের স্তূপ থেকে আমার দরকার মতো কোন কিছুই আর খুঁজে পেতাম না, কারণ কাগজগুলোকে তখন আর সোজা করে মেলে ধরবার মতো একটু জায়গাও কোথাও থাকত না। তখন কেঁদে চিৎকার করে মাকে ডাকতুম। মা তখন তাঁর সেলাইয়ের কল ছেড়ে উঠে এসে সব ঠিক-ঠাক করে দিতেন। মা গজগজ করে বলতেন "এত বড় মেয়ে হলে তবুও এরকম করবে? বিয়ে হলে মার খেয়ে খেয়ে তবে তুমি সোজা হবে।" এই জন্যেই বাড়ি থেকে এখানে আসবার আগেই প্রতিজ্ঞা করেছিলাম আমি যে বিয়ে কখনো করবো না।

"তাহলে তৈরি হই আমরা"?

"কি বলছ" ?—লাফিয়ে উঠলাম আমি। আমি এতক্ষণ ধরে শুধু গান গেয়েছি আর দিবাস্বপ্ন দেখেছি।

নো তাড়াতাড়ি ওর বালিশের ওয়াড় গুটিয়ে থলেতে ভরল। গুহার দরজার দিকে চেয়ে একটা পরিক্রমারত বিমান দেখতে পেল থাও। নিস্তব্ধতা বলতে সঠিক কি বোঝায় সেটা সম্যক উপলব্ধি করেছি আমরা এখানকার জীবনযাত্রা থেকে।

আর আজ সকাল থেকে এই নিস্তব্ধতা কী অস্বাভাবিক লাগছে। এখন শোনা যাচ্ছে পরিক্রমারত বিমানের নীচু সুরের আওয়াজ, এরপরই শোনা যাবে জেটবিমানের নীচু সুরের কান্না। তারপর এই দুটো আওয়াজ একসঙ্গে মিশে আমাদের কানে তালা ধরিয়ে দেবে, আমাদের কাঁপিয়ে তুলবে।

"ওই আসছে।" বলে নো ঘুরে দাঁড়িয়ে তার হেলমেট্‌টা পরল। থাও পকেট থেকে একটা বিস্কুট বার করে তাতে আস্তে আস্তে কামড় দিতে লাগল। থাও-এর যখনই মনে হয় যে এক্ষুণি একটা কোনো সাংঘাতিক অঘটন ঘটবে সে বিরক্তিকর রকমের শান্ত হয়ে যায় তখন। আবার ওই মেয়েই একটা জোঁক দেখলে প্রায় অজ্ঞান হয়ে যায়। থাও ফুল তোলা অন্তর্বাস পরে, নিজের ভুরুটি নিখুঁতভাবে তুলে সরু তুলিতে আঁকার মতো করে রাখে, কিন্তু কাজের সময় তার অসম সাহস আর তন্ময়তা মুগ্ধ করে দেয় আমাদের।

এখানে প্রাত্যহিকের ঘটনা হলো এই বিমানের গর্জন, গুহা থেকে প্রায় তিনশো মিটার উঁচুতে পাহাড়ের ওপর অজস্র বোমাফাটার আওয়াজ। পায়ের তলার মাটি কেঁপে কেঁপে ওঠে আমাদের, দড়িতে টাঙানো তোয়ালেগুলো দুলতে থাকে, সবকিছু থরথর করে কেঁপে ওঠে মনে হয় হঠাৎ ঠাণ্ডা লেগে জ্বর আসছে যেন। গুহা থেকে বেরুবার মুখটা আচ্ছন্ন হয়ে যায় ধোঁয়ায়। মেঘ, আকাশ কিছুই আর দেখতে পাই না আমরা।

বিস্কুটটা খেয়ে নিয়ে আমার হাত থেকে মাপবার কাঠিটা নিয়ে হাসিমুখে থাও বললো—"দিন, তুমি এখানেই থাকো। ওরা এবারে বেশি বোমা ফেলে নি। আমরা দু'জনেই যথেষ্ট"। নো-র জামার হাতা ধরে তাকে টেনে নিয়ে বেলচাটা কাঁধে তুলে দরজার দিকে এগোলো থাও—মুখখানা তার আলো হয়ে আছে এক অপূর্ব প্রভায়।

আমাকে বাধা দেবার কোনরকম সুযোগ দেয় না ও প্রায়ই। থাও-ই নির্দিষ্ট করে আমাদের কাজের দায়িত্ব। গুহার ভেতর যত সময় যেতে থাকে ততই বেড়ে ওঠে আমার উৎকণ্ঠা। স্নায়ুগুলোও বিদ্রোহ করতে চায় আমার। অতীত ভবিষ্যৎ সব কিছু লুপ্ত হয়ে যায়···শুধু মনে হয় আমার সাথীরা আর যদি ফিরে না আসে ?

টেলিফোন বেজে ওঠে, রিপোর্ট চান দলনেতা। প্রায় বিরক্তি মেশানো স্বরে বলে উঠি আমি—"স্কাউটরা ফেরে নি এখনও"।

জানি না কেন বিরক্ত হয়ে উঠি আমি। একঝাঁক বোমা পড়ার শব্দ হলো আবার। ধোঁয়ায় ভরে গেছে গুহা, কাশতে কাশতে দম বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। আমার দুই সংগী আর বোমাগুলো ছাড়া পাহাড়ে নিশ্চয়ই নেই আর কেউই। আর দেখ আমি এখন বসে আছি এখানে। পাহাড়ের অপর প্রান্ত থেকে বিমান বিধ্বংসী কামানগুলো গর্জন করে উঠল এইমাত্র। সব থেকে একা আর ভীত মনে হয় নিজেকে যখন বোমাগুলো ফেটে পড়ার সময় প্রতিরক্ষাবাহিনীর তরফ থেকে একটা সাড়াও মেলে না। তাদের কাছ থেকে একটা সামান্য গুলির আওয়াজ পেলেও নিজেকে মনে হয় কত সুরক্ষিত। মনে হয় আমরা এত সুরক্ষিত যে তার বুঝি কোন তুলনাই হয় না। অধৈর্য হয়ে মুহূর্তের মধ্যে বাইরে এলাম আমি। চারিদিকে শুধু ধোঁয়া আর ধোঁয়া। দুশ্চিন্তা হতে.লাগল আমার। হঠাৎ পরের পাহাড় থেকে ১২.৭ মিলিমিটার মেসিনগানের গুলির আওয়াজ পেলাম। তবু ভালো এই আওয়াজটা সুড়ংগ খননকারী বাহিনীর আগমন সংকেত। ওরা আসছে বিমানধ্বংসী কামানগুলোকে আর আমাদের উদ্ধার করতে। আনন্দে প্রায় চেঁচিয়ে উঠলাম আমি। আমাদের নির্জন পাহাড়ে কত লোক এখন। কামান চালানোর লোকেরা, যোগাযোগ রক্ষা করার লোক-জন, সুড়ংগ খোঁড়ার লোকেরা সবাই ভালোবাসে আমাদের। আমাদের শক্তিবৃদ্ধি করবার জন্যে শূন্যে শুধু একটি গুলি ছুঁড়লেই ওরা ছুটে আসবে।

আধঘণ্টা পরে ফিরে এল থাও। আমার দিকে না চেয়ে ক্লান্ত, সংযত রুদ্ধস্বরে বললো সে—"হাজার কিউবিক মিটারের থেকেও বেশি।" মাটিতে বসে পড়ে জলের পাত্র থেকে জল খেতে লাগল ও। মুখ থেকে জল চুইয়ে তার জামায় পড়লো।

শাখা অফিসে টেলিফোন করে জানিয়ে দিলাম ওরা ফিরেছে। ওরা বললো —"ঠিক আছে কমরেড, অজস্র ধন্যবাদ।"

বিভাগীয় প্রধানের ভাষা খুব মার্জিত সব সময়েই বলবে "ধন্যবাদ", "আজ্ঞে", "শুভেচ্ছা" এইসব। ভদ্রলোক যুবক, রোগা, একটু বাতের ধাত আছে। প্রাচীর পত্রের জন্যে কবিতা লেখে সে। মনে হয় সেও এসেছে হ্যানয় থেকেই।

নদী থেকে স্নান করে ফিরল নো। নদীর এই ধারটা যে বোমাগুলো দেরিতে ফাটে তাদেরই রাজত্ব। ভিজে কাপড়ে বসে পড়েই লজেন্স চাইল। নিজের পকেট হাতড়ে দৈবক্রমে দুটো চটচটে লেবু লজেন্স পেলাম।

সে বললো—"বেশি নয় চারটে দেরিতে ফাটার বোমা পড়েছে শুধু।"

হাতের ওপর হেলান দিয়ে বললো সে। তার গোল গলা আর ছোট ছোট বোতাম-ওয়ালা জামাটা দেখে আমার মনে হচ্ছিল কোলে তুলে নিই তাকে। দেখতে লাগছিল ঠিক হাল্‌কা তাজা একটা "আইসক্রিম কোন্‌"-এর মতো।

বাহিনীর অধিকর্তা ফোন করে জানতে চাইলেন আমাদের আর সঙ্গী লাগবে কি না। প্রত্যেকবারের মতো আমি উত্তর দিলাম—"না তার দরকার নেই। নিজেরাই সামলে নেবো আমরা।" "শুভেচ্ছা রইল, ধন্যবাদ কমরেড"। তারপর বললো—"সমস্ত বাহিনীর লোকেরা রকেট বাহিনীর জন্যে একটা রাস্তা তৈরি করছে। সকাল থেকে কোন বিশ্রাম মেলে নি কারুরই। আমারও একই অবস্থা। তোমাদের সাধ্যমতো কাজ করে যাও কমরেড, শুভকামনা রইল তোমাদের জন্যে।"

কাজেই আজকে রাতে অন্যান্য বারের মতো আমরাও রাস্তাতেই থাকবো…

আমার জন্য নির্দিষ্ট হলো পাহাড়ের ওপরের একটা বোমা। নো এর জন্য রাস্তার বোমাদুটো আর থাও লক্ষ্য রাখবে আমাদের আশ্রয় শিবিরের বেড়ার ধারের বোমাটার ওপর।

মনে হয় নিস্তব্ধ মরুভূমি, তোমাকে ভয়ে কাঁপিয়ে দেবে। এখানে ওখানে ছড়িয়ে আছে শাখাবিহীন গাছের গুড়িগুলো। মাটি তেতে উঠেছে। বাতাসে ভেসে বেড়াচ্ছে অন্ধকার ধোঁয়ার কুণ্ডলী। বিমান বিধ্বংসীবাহিনীর লোকেরা কি দেখতে পাবে আমাদের? ওদের চোখে নিশ্চয়ই ফিল্ডগ্লাস আছে সেটা দিয়ে ওরা এখানকার সব কিছুই দেখতে পাবে। আমি এগোতে থাকি বোমাটার দিকে। ওর চোখগুলো আমার দিকেই স্থির হয়ে আছে জেনেও ভয় পাই না আমি। গুড়ি মেরে এগোই না আমি। এভাবে হাঁটা পছন্দ করে না ওরা। বলে, সাহসের সঙ্গে মাথা উঁচু করে হাঁটো।

শুক্‌নো ঝোপে মূর্তিমান অমঙ্গলের মতো শুয়ে আছে বোমাটা। খানিকটা অংশ গেঁথে গেছে মাটিতে। ফিকে হলুদ রঙের দুটো ডোরা গায়ে ওর। আমার ছোট বেলচাটা নিয়ে আমি ওর তলাটা খুঁড়তে শুরু করি।

শক্ত জমির পাথুরে মাটিগুলোকে দুপাশে ছুঁড়ে ছুঁড়ে ফেলি। মাঝে মাঝে বেলচাটা বোমাটার গায়ে লেগে একটা তীক্ষ্ন ধাতব শব্দ তুলছে, মনে হচ্ছে সেটা যেন আমার শরীরের মাংস ভেদ করে যাচ্ছে। কেঁপে উঠি আর ভাবি বড্ড ধীরে কাজ করছি আমি। "তাড়াতাড়ি কর"— নিজেকে বলি। বোমাটা এখনও গরম আছে—খুব খারাপ লক্ষণ। বোমাটা নিজে নিজেই গরম আছে না সূর্যের তাপে গরম হয়ে উঠেছে?

থাও সংকেত জানাল। তারপর কুড়ি মিনিট কেটে গেছে। আমারই হাতে খোড়া পাথুরে গর্তের মধ্যে খুব সাবধানে বিস্ফোরকগুলো রেখে তারপর

তার বাঁকা পলতেতে আগুন জ্বালিয়ে দিয়ে আমার আস্তানার দিকে দৌড়ালাম।

দ্বিতীয় সংকেত শোনা গেল। আমি মাটি মাখা দেওয়ালে হেলান দিয়ে ঘড়ির সময় দেখতে লাগলাম। প্রচণ্ড গুমোট, আমার বুক ঢিব ঢিব করছে। একমাত্র যে বস্তুটা এই সমগ্র পরিবেশটাকে টিট্‌কিরি দিচ্ছে সেটা হলো আমার হাতের এই ঘড়ির একটা কাঁটা। ওখানে জ্বালানো আগুনটা যতক্ষণ না বাঁকা তারটাকে গ্রাস করে বোমার অন্তস্থলে পৌঁছচ্ছে ততক্ষণ এই ঘড়ির কাঁটাটা লঘু অচঞ্চল পায়ে ওর অনাদি অনন্ত সংখ্যাগুলো অতিক্রম করে যাবে।

রোজকার ঘটনার কথা যদি বল তো সেটা হলো রোজই গোটা পাঁচেক করে বোমা ধ্বংস করা। ভাগ্য ভালো হলে সংখ্যাটা কোনদিন তিনেও দাঁড়ায়। মৃত্যুর কথা ভাবি আমি! কিন্তু তাকে কল্পনা করি আবছা বিমূর্তরূপে। আমাদের শুধু সঠিক করে জানতে হবে বোমাবিধ্বংসী বিস্ফোরকগুলো ঠিকমতো কাজ করলো কি না, বোমাটা সম্পূর্ণ অকেজো হলো কী না সেটাই। সবকিছু যদি ঠিকমতো না হয় তাহলে নতুন করে কি করতে হবে তখন? আরো জানতে হবে কী ভাবে শুয়ে পড়তে হবে ঠিক সময়মতো। কারণ হাতে একটা বোমার টুকরো লাগা মানে এক বিরক্তিকর ব্যাপার। ঘামে ভিজে ওঠে আমার সারা দেহ। বালি কিচ্‌কিচ্‌ করা মুখের ভেতর একটা নোনতা স্বাদ পাই আমি।

হঠাৎ মনে হলো আমার মাথায় যেন একটা বাজ পড়ল। নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে গেল; চোখগুলো এতো জ্বালা করে উঠলো যে সেগুলো ভালো করে মেলতে বেশ অনেকটা সময় লাগলো। বারুদের গন্ধে আমার পেটে পাক ধরছিল। পরপর তিনটে বিস্ফোরণ শোনা গেল। গলে মিশে যাবার আশা বুকে নিয়ে শিলাবৃষ্টির মতো ঝোপে জঙ্গলে আছড়ে পড়তে লাগলো ফেটে যাওয়া মাটির টুকরোগুলো। টুকরোগুলো বাতাসের বুক চিরে আমাদের মাথার ওপর দিয়ে সশব্দে ছুটে গেল।

আঙুলের উল্টোপিঠ দিয়ে জামার ধুলো ঝেড়ে ধোঁয়ার ভেতর দিয়ে আরো একটু ভালো করে লক্ষ্য করবার জন্য চোখটাকে বড় করে মেলে দিলুম, তারপর থাও-কে খোঁজবার জন্যে ছুটলাম। আমার আর নো-এর সঙ্গে একত্রিত হবার জন্যে তার এইদিকেই আসার কথা ছিল। নো-ও ছুটে আসছিল আমারই দিকে। আমি দেখলাম তার গায়ে একটা ক্ষতচিহ্ন সূর্যের আলোয় জ্বলজ্বল করছে, তার পিঠের প্যারাস্যুট সিল্কের টুকরোটা বাতাসকে ঠেকাতে গিয়ে নিজেই যেন খণ্ডিত হতে চলেছে।

নো হোঁচট খেয়ে পড়ে গেল। ওকে উঠে দাঁড়াতে সাহায্য করলাম আমি কিন্তু ও জোর করে ছাড়িয়ে নিল নিজেকে। ওর ঘোলা চোখগুলোর দিকে

চেয়ে আমার মনে হলো এক্ষুণি বুঝি মরে যাবে ও। কী যে হয়েছে ওর কিছুই বুঝতে পারলাম না আমি। আমার হাতটা ধরে কাদায় লুটিয়ে পড়ল নো। ছোট লম্বা একটা কাদার স্তূপে বারুদের গুঁড়োয় ওটার রঙ, ধূসর হয়ে গেছে। "তোমার কোথায় লেগেছে নো ? কোথায় লেগেছে ছোট্ট বোনটি আমার" ?

কান্না নয়, কথাগুলো জড়িয়ে গেল ওর গলায়। দুহাতে কাদা সরিয়ে নো-কে আমার কোলে তুলে নিই। তার হাত থেকে ঝরে পড়া রক্ত ভিজিয়ে দিচ্ছে তৃষ্ণার্ত মাটিকে। তার গায়ের রঙ পাণ্ডুর হয়ে গেছে, চোখদুটো বোজা। জামায় রক্তের দাগ। বোমাটা লাফিয়ে উঠে শূন্যে ফেটেছে। তারই দাপটে আস্তানার চালটা মনে হয় নো-এর গায়ের ওপরই ধ্বসে পড়েছে। তাই-ই হবে।

ঝরণার জল ফুটিয়ে নিয়ে আমি নো-এর ক্ষতটা ধুইয়ে দিই। সাদা ব্যাণ্ডেজ জড়িয়ে দিলুম। কাটাটা বেশি গভীর নয়—শুধু নরম মাংসটা কেটে গেছে। কিন্তু বোমাটা খুব কাছে ফেটেছে বলেই এতটা বিহ্বলতা। একটা ইনজেকশন দিলাম ওকে। চোখটা অর্ধেকটা খুললো নো। এবার নিশ্চয়ই একটু ভালো লাগবে ওর। আঘাতটা সম্ভবত খুব বেশি নয়।

বাইরে থাও খাঁচার ভালুকের মতো এদিক থেকে ওদিক পায়চারী করে বেড়াচ্ছে। কি করতে হবে কিছুই জানে না বেচারা কিন্তু কোন একটা সাহায্যে লাগবার ইচ্ছেয় মনে মনে দগ্ধ হচ্ছে। রক্ত দেখলে ভয় পায় ও। এখন নো-কে পরিষ্কার করা হয়ে গেছে দেখে ওকে শুইয়ে রাখা বড় এবড়ো-খেবড়ো তক্তাটার কাছে এগিয়ে গিয়ে জিজ্ঞেস করল—"শাখা অফিসে টেলিফোন করে দেব আমরা" ?

নো বললো—"ধ্যাৎ, আমি মরবো না। তাছাড়া ওরা সবাই রাস্তা তৈরিতে ব্যস্ত আছে। ওদের বিরক্ত করার কোন দরকার নেই। এই বোকা, এত ভয় পাচ্ছিস কেন ?"

"জানো, এই রকমই কিন্তু হয়। যাদের আঘাত লাগে তাদের থেকে যারা সুস্থ আছে মনে মনে তারাই কষ্ট পায় বেশি"। দরজার দিকে মুখ ফিরিয়ে জলের পাত্র থেকে জল খেল থাও। চোখে হাত চাপা দিল নো, কারণ এখন যে ওর জল খাওয়া উচিত নয় সেটা ভালো করেই জানে ও। মগে করে ওর জন্যে গুঁড়ো দুধ গুলছি আমি।

থাও নির্দেশ দিলে—"ওটাকে খুব গাঢ় করে গোলো আর বেশি করে চিনি দিও"।

দুধ খাওয়ার পর নো ঘুমোচ্ছে। পরিক্রমারত বিমানের গর্জন পাহাড়ের নিবিড় নীরবতাকে বিদীর্ণ করে গেল। দেওয়ালে পিঠ দিয়ে হাতদুটো

ঘাড়ের নিচে রেখে থাও বললো—"একটা গান করো দিন্। যে গান সব থেকে ভালো লাগে তোমার, সেই গানটা গাও।"

সত্যি বলতে কি অনেক রকমের গানই ভালোবাসি আমি। রণের পথে সৈনিকদের কুচকাওয়াজের গান, কোমল সুরেলা পল্লীগীতি, রেড আর্মির 'কাটুসা' সবই ভালো লাগে আমার। হাঁটুতে চিবুক রেখে বসে স্বপ্ন দেখতে ভালোবাসি আমি—"যবে আমি এলেম হেথা কালো কেশে ছিল ভরা মাথা"—হৃদয়বৃত্তিতে ভরা নেপলস্-এর একটা গান, সুরের ওঠানামার বৈচিত্র্যভরা এই গানটি গাইতে হয় খুব নিচু স্বরে। থাও-এর মনে যে অনুভূতি ওকে উত্তেজিত করে তুলছে সেটাকে পুরোপুরি অনুভব করতে পেরেও ওর ওপর বিরক্ত হয়ে উঠি আমি। নো-কে বারবার না দেখে কিছুতেই থাকতে পারছে না থাও। একবার ওর কলারটা ঠিক করে দিয়ে আসছে, একবার গিয়ে সোজা করে দিচ্ছে ওর জামার ভাঁজগুলো, কখনও বা ঠিক করছে ওর অবিন্যস্ত চুলগুলো। কিন্তু তবুও কিছুতেই কাঁদবে না থাও। চোখের জল একদম ভালো লাগে না ওর। আমরা একে যখন অন্যকে বিশ্বাস করি, একে অন্যের ওপর নির্ভরতা রাখি তখন সেখানে চোখের জল ফেলার অর্থ হলো তো নিজেদেরই শুধু অপমান করা।

আমরা একটাও কথা না বলে শুধু একে অন্যের দিকে চেয়েই পরস্পরের মনের ভাব সম্পূর্ণ বুঝতে পারি।

এবার গান গাইতে শুরু করল থাও—"হেথায় থ্যাঙ লঙ্/হেথায় প্রাচোর রাজধানী…হ্যানয়"।

ওর গলাটা বেসুরো, মোটে মিষ্টি নয়, আর গানও ও শেখে নি কখনো। কিন্তু গানের কলি লিখে লিখে কমসে কম তিনখানা নোটবই ভরিয়ে ফেলেছে ও। আর এখনও লিখেই চলেছে। সব থেকে বিচ্ছিরি ব্যাপার হলো আমার তৈরি আবোল-তাবোল গানের কথাগুলোও লিখে রেখেছে ও।

বাইরে আকাশ ছেয়ে গেছে বিরাট মেঘে। একটার পর একটা মেঘ এগিয়ে আসছে খুব তাড়াতাড়ি, আরো তাড়াতাড়ি। গুহার ভেতর থেকে আকাশের যে ছোট টুকরোটা দেখা যায় সেটা এখন ঘন কালো। ঝড় উঠলো, উড়ে এলো ধুলোর মেঘ। গাছের ঝলসানো ডালপালায় লাগল স্প্যানিস নাচের দোলা। মুহূর্তে বুকের একটি স্পন্দনে ঘটে গেল সব। অরণ্যে জেগে উঠল বর্ষার পদধ্বনি। বৃষ্টি এলো। না-না, শিলাবৃষ্টি। এটা যে শিলাবৃষ্টি প্রথমে তা বুঝতে পারি নি আমি। কিন্তু একটু পরেই মাথার চালার ওপর শুনতে পেলাম এক মিষ্টি সুরেলা বাজনা। ছুটে বাইরে গেলাম আমি। মনে হলো কোন অদৃশ্য অস্ত্রে বাতাস চিরে খান্ খান্ হচ্ছে আর সেই ভেজা বাতাস আঘাত হানছে আমারই গালে মুখে।

"শিল পড়ছে—শিল পড়ছে"—বলে ছুটে ঢুকে যাই গুহার ভেতর আর নো-র বাড়ানো হাতটায় ভরে দিই একমুঠো শিলে। আনন্দে আত্মহারা হয়ে আবার ছুটে যাই বাইরে।

যে বছরে আমি আমার স্নাতক পরীক্ষা দেবার জন্যে তৈরি হচ্ছিলাম সে বছর এমনই শিলাবৃষ্টি হয়েছিল। মাঝরাতে ঘরের দেওয়ালে উঠেছিল এমনই ঝংকার। আমি দরজা খুলে দালানে ছুটে গিয়ে প্রত্যেকটি ঘরের দরজায় ধাক্কা দিয়ে পাগলের মতো চেঁচিয়ে বলেছিলাম "সবাই ওঠো তাড়াতাড়ি, শিল পড়ছে।" ওদের ডাকছি আর ডাকছি—এই অপূর্ব মুহূর্তে একমাত্র কুঁড়ে আর অকর্মণ্যরাই পারে ঘরে শুয়ে থাকতে।

আর সেই ডাক্তার! ও অবশ্য অকর্মা নয়, সে কিনা বললে—"খুকি তুমি যদি এখুনি দরজা ধাক্কানো বন্ধ না কর তো আমাদের উপযুক্ত ব্যবস্থা নিতে হবে..."

আরেকজন প্রতিবেশী এক মহিলা শিক্ষিকা বুক ফাটা শ্বাস ফেলে বলে উঠল—"হা ভগবান, এরা আমাদের শান্তিতে একটু ঘুমোতেও দেবে না।"

শুধু নিচের তলায় একজন ড্রাইভার থাকতো সে ওপরে উঠে এসে সেই মনোরম রাতটি উপভোগ করছিল আমার সঙ্গে। পরে সেনাদলে যোগ দিয়ে সাঁজোয়া-বাহিনীর সঙ্গে লড়াইয়ে খুব নাম করেছে সে। এখনও সে আমাকে যে সব চিঠি লেখে তার মধ্যে তার অতীত স্মৃতির কথার ভেতর দিয়ে সে আমাকে মনে পড়িয়ে দেয় সেই অনেকদিন আগেকার এক শিলাবৃষ্টির কথা।

এখানে এই বোমার টুকরোয় ভরা পাহাড়েও হচ্ছে শিলাবৃষ্টি। কৈশোরের সেই আনন্দ-অনুভূতি আবার দল মেলেছে আমার মনে। আজ এখানে আমাকে বকুনি লাগাবার জন্যে নেই কেউই। থাও ব্যস্ত ভাবে ঝুঁকে পড়ে মেঝে থেকে কী যেন কুড়োচ্ছে। নিশ্চয়ই শিল কুড়োচ্ছে ও। নো হঠাৎ উঠে বসে মুখটা আধখোলা করে বললো—"এই আর ক'টা দে আমাকে"।

কিন্তু শিল পড়া শুরু হয়েছিল যেমনি হঠাৎ থেমেও গেল তেমনিভাবে। বেশিক্ষণ স্থায়ী হয় না এরা। এত তাড়াতাড়ি থেমে গেল বলে হাঁপাতে হাঁপাতে অনুশোচনা করতে লাগলাম আমি। আরো বেশি করে শিল কুড়োতে পারলুম না বলে এই অনুশোচনা তা নয়। প্রত্যেক ঝড়বৃষ্টি থেমে যাবে কোন না কোন সময়ে! কিন্তু এই ধরনের শিলাবৃষ্টিই শুধু আমায় মনে করিয়ে দেয় কোন বিশেষ স্মৃতির কথা, কোন বিশেষ ব্যক্তির কথা, আমার মায়ের কথা। আমার মনে পড়ে বড় বড় তারায় ভরা রাজধানীর সেই আকাশকে, আমার সেই চেনা জানলাটাকে। মনে পড়ে যায় সব কিছুই—যেন পুরো পৃথিবীটাকেই। আমার চোখের সামনে ভেসে ওঠে বড় রাস্তার গাছের সারি, বড় থিয়েটার হলের

গম্বুজটা, মুখর ছেলেমেয়েদের আক্রমণে ব্যতিব্যস্ত সেই আইসক্রীমওয়ালা—যার ছোট ঠেলাগাড়িটা ভরা থাকতো 'এস্কিমো পাই' এ। বৃষ্টি শেষে রাতের পীচ ঢালা রাস্তাটাকে মনে হতো অতি বৃহৎ, অতি দীর্ঘ এক কালো নদী যার বুকে আঁকা অজস্র প্রতিচ্ছবি। চৌকো পার্কের ইলেকট্রিকের বাল্বগুলো গল্পে পড়া পরীর দেশের জীবন্ত তারাদের মতো এদিক ওদিক দুলতো। শুনতে পাচ্ছি সরু গলিতে দুষ্টুমি করে বল ছোঁড়ায় ব্যস্ত ছেলেদের বলের আওয়াজ। সরু চালের বোঝা মাথায় নিয়ে সকালবেলা যে ফেরিওয়ালাটা যেত তার ডাকও শুনতে পাচ্ছি।

কেন এমন হয়? হয়তো আজ এগুলো আমার থেকে অনেক দূরের জিনিস, তাই হঠাৎ এই শিলাবৃষ্টির পর আমার হৃদয় নিঙড়ে ভেসে উঠেছে এদেরই স্মৃতি।

লোকে ঠাট্টা করে হ্যানয়ের মেয়েদের বলতো যে তারা হ্যানয় ছেড়ে তিন-দিনও কাটাতে পারবে না কোথাও। আর আজ তিন বছর হলো আমরা এই পাহাড়ে আছি। স্থলবাহিনীর সৈনিকরা, গাড়ির চালকরা আমাদের ডাক নামে চেনে। আমরাও ওদের বিষয় সবকিছু জানি। ওদের মধ্যে কে ভালো বেসেছে, কার মেয়ে বন্ধু আছে, কে সাহসী আর কেই বা সবকিছুতে বিরক্ত হয় সবই জানা আমাদের। রাত্তিরে আমরা যখন রাস্তা মেরামত করি, কেউ কেউ আমাদের টুথপেস্ট, সুগন্ধি চিঠি লেখার কাগজ, লজেন্স এইসব দিয়ে যায় রাস্তায় যেতে যেতে। ওরা সব কারা—আমরা জানি না, কারণ এই নির্দিষ্ট পাহাড়টা তাদের খুব তাড়াতাড়ি পার হয়ে যেতে হয়। আমরা কিন্তু বলাবলি করি, এগুলো নিশ্চয়ই হ্যানয়ের গাড়ি, কেন না আমরা জানি এসব জিনিসগুলো শুধু হ্যানয়েই পাওয়া যায়।

আমরা হ্যানয়ে থাকতে এসব জিনিসের দিকে ফিরেও চাই নি। আর আজ এই সুগন্ধি পাতলা কাগজে চিঠি লিখে খামে ভরে হ্যানয় থেকে আজ যারা আমাদের থেকেও অনেক দূরে আছে তাদের পাঠাতে যে কী আনন্দ পাই তা বলে বোঝাতে পারব না।

থাও হঠাৎ চেঁচিয়ে ওঠে "শুয়ে পড়ো"।

শোবার আগে এমনভাবে হুমড়ি খেলাম আমি যে দেখলে মনে হবে যে আমার পেটে দারুণ চোট লেগেছে। এর কারণ হলো বোমাগুলো ফাটবার আগেই ভীষণ আওয়াজ শুরু হয়েছে। আওয়াজটা এতো কাছ থেকে আসছে যে বোমাগুলোর দূরত্ব সঠিক বোঝা যাচ্ছে না, শুধু পায়ের তলার মাটিটা কম্পমান দৈত্যের মতো কাঁপছে।

মনে হচ্ছে আমাদের মাথার ওপর হাজার হাজার বিমান যেন নেচে

বেড়াচ্ছে। থাও হামাগুড়ি দিয়ে গুহার ভেতর ঢুকে পড়ে বললো—"হত-ভাগারা আমাদের দম ফেলতে দেবে না।" রাগে ওর দাঁতগুলো কড়মড় করে উঠল। কাপড় শুকোবার দড়িতে হাত রেখে দাঁড়াল থাও। আধো অন্ধকারে ওর মাথার স্কার্ফটা দেখা যাচ্ছে না ভালো করে, কাঁধের ওপর ছড়ানো ওর চুলগুলো। ওর কোমরটি সরু, দেহ সুঠাম, দাঁড়ানোর ভঙ্গিটাও অপূর্ব। শুধু গলার স্বরটা একটু ভালো হলে ও থিয়েটারের একজন অভিনেত্রী হতে পারতো। স্টেজে খুব ভালোই দেখাবে ওকে কিন্তু রক্ষে করো বাবা—যা গলা ওর! কানের পর্দা ফেটে যাবে! ও অবশ্য ওর নিজের এই দোষটা সম্বন্ধে খুব সচেতন।

নো হাত নেড়ে ইশারা করে জানাল টেলিফোনটা কাছে আনো।

টেলিফোনটা এগিয়ে দিয়ে জলের পাত্র নিয়ে থাও-এর সঙ্গে বাইরে গেলাম।

দৌড়ুতে গিয়ে আমার উরুর ক্ষতটা দগ্‌দগ্‌ করতে লাগল। আশাকরি খোঁড়াতে হবে না আমাকে। থাও এত একগুঁয়ে যে একা একা পাহাড়ের ওপর যেতেও একটু দ্বিধা করে না।

বোমার আঘাতে অজস্র গর্ত হয়েছে চারিদিকে। আমরা গর্তগুলোর মাপ নিতে শুরু করি, যে যার আন্দাজের কথা চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে বলি, মনে মনে যোগ করি সেগুলো। থাও তার রেজিস্টারে যোগফলটা লিখে রাখে। দেরি করে ফাটার মতো বোমা এবারে একটাও পড়ে নি। কিন্তু ফেটে যাওয়া বোমার ঘায়ে অজস্র গর্ত হয়েছে। প্রায় দু'হাজার কিউবিক মিটারের মতো জমি ভরাট করতে হবে আমাদের। হঠাৎ পেছন দিক থেকে এক আসুরিক ধাক্কা খেলাম আমি। থাও একলাফে আমার কাছে এসে আমাকে টেনে নিয়ে মাটিতে শুয়ে পড়ল। এক লহমায় একটা বিরাট মাটির চাঙড় এসে পড়ল আমাদের দুজনের ওপর। ভেজা কাদা মেশানো শুকনো মাটির চাঙড়—আমরাই যেটা আগের ফেলা কোন না কোন বোমার তলা খুঁড়ে তুলেছিলাম সেটাই এখন এসে পড়ল আমাদেরই মাথার ওপর। পা ছুঁড়ে চাঙড়ের তলা থেকে বেরিয়ে আসবার চেষ্টা করলুম আমি। নিঃশ্বাস নিতে পারলুম অতি কষ্টে। নাকটা বালিতে বুজে গেছে, মাথাটা নাড়াতে বৃষ্টির মতো ঝরে পড়লো একরাশ বালি-মাটি। আমার চারপাশ ধোঁয়াটে, ঘন ধোঁয়ায় ভরা বাতাসটা সীসের মতো ভারী।

থাও-কে দেখতে পাচ্ছি না আমি। যথাসম্ভব চেঁচিয়ে নাম ধরে ডাকতে চেষ্টা করলাম। কিন্তু আমার মুখের ভেতরটাও ভরে গেছে বালিমাটিতে। থুথুর সঙ্গে একরাশ বালি বার করে ফেললাম। দৈবক্রমে হঠাৎ আমার হাতটা থাও-এর মাথার চুলে ঠেকে গেল। ধাক্কা খেয়ে পিছু হটে যাই আমি, সামনে ফিরে ঝুঁকে পড়ে প্রাণপণ শক্তিকে পাগলের মতো হাত দিয়ে মাটি খুঁড়তে শুরু

করি। ননীর পুতুলের মতো নরম থাও খুব দুর্বলভাবে শ্বাস টানছে। আমার গলাটা জড়িয়ে ধরে সে স্খলিত পায়ে কোনরকমে উঠে দাঁড়াল।

গুহায় ফেরার পর নো অবুঝ শিশুর মতো ভেঙচি কেটে আমাদের জিজ্ঞাসা করল—"আবার?"

থাও একটু অদ্ভুতভাবে হেসে নিজের স্থৈর্য ফিরিয়ে এনে উত্তর দিল—"বেশি কিছু হয় নি, হাড়টাড় ভাঙে নি কিছু।"

বিশেষ কিছু হয় নি, শোন কথা! ছোট বড় মিলিয়ে এখনই ওর শরীরে সাতটা ক্ষতচিহ্ন আছে, আর নো-এর পাঁচটা। আমারই একটু কম—মোট চারটে। পেটের আঘাতটাই একটু বিশ্রী ধরনের হয়েছিল আমার, তাই ওটার জন্যে আমাকে হাসপাতালে রেখেছিল তিনমাস। এখানে আজকের মতো এই কবর-চাপাটা একটা নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার।

সংগীদের দিকে চাইলাম আমি। থাওকে খুব বিবর্ণ দেখাচ্ছে। ক্লান্ত নো উঠে দাঁড়িয়ে ওকে এক মগ ঠান্ডা জল দিয়ে সংগে সংগে নখে করে ওর মাথা থেকে মাটির ঢেলাগুলো তুলতে শুরু করেছে আর সেই সংগে আরম্ভ করেছে তার দর্শনতত্ত্ব—"ভালো, ভালো, আমরা যেন কোন এক নির্দিষ্ট সামরিক পাহাড়ে বাস করছি..."

হাসিতে ফেটে পড়ে আমার দিকে ফিরে থাও বললো—"এই কথাগুলো তোমার নোট বইয়ে টুকে নাও এক্ষুণি পাছে আমরা এগুলো ভুলে না যাই সেইজন্যে!"

টেলিফোনটা ঘোরাই আমি। থাও সংগে সংগে আমার পাশে এসে বসল—"সব কিছু ঠিকমতো বল, ভুলো না কিছু. বল আমরা ঠিকমতো চালিয়ে যাচ্ছি আমাদের কাজ"।

এখন বাহিনীর অধিনায়ক ওখানে নেই—ওঁর সহকারী আছেন শুধু। "অধিনায়ক কোথায়"?

"উনি রাস্তায়, এখনই রকেট বাহিনী যাবে ওখান দিয়ে। বেলা দুপুর হয়ে গেল, কাল রাত থেকে কেউ এখনও ঘুমোতে পায় নি, তোমরা কেমন আছ"?

"বড্ড ক্লান্তি লাগছে আমাদের। প্রায় দুহাজার কিউবিক মিটার ভরাট করতে হবে এখনি। রাত পর্যন্ত কাজ করতে হবে আমাদের। তবু লেগে থাকব আমরা—"

"যদি বেশি ঝামেলা বাড়ে তাহলে গুলি ছুঁড়ে সহায়ক দলকে ডেকে নিও—কেমন? তোমাদের সম্বন্ধে বাহিনী অত্যন্ত সজাগ সেটা জান তো? তোমরা ডাকলে তৎক্ষণাৎ পেঁছে যাবে আমাদের সহায়ক বাহিনী।"

সন্ধে হয়ে এল। থাও আর আমি তিনবার পাহাড়ে উঠেছি আর নেমেছি, আটটা বোমা খতম করেছি। এখন তিন হাজার দু'শো কিউবিক মিটার জমি ভরাট করতে হবে। প্রত্যেকবার আমি থাওকে গুহায় একটু বিশ্রাম নেওয়ার জন্যে রকমারি গল্প ফাঁদছি কিন্তু ওকে বোকা বানানো অত সোজা নয়। ও আমার আগেই গুহা থেকে বেরিয়ে দম বন্ধ করে ছুটছে। হাত আর রগের শিরাগুলো দাঁড়িয়ে উঠছে ওর। দেখে মনে হচ্ছে এবার বুঝি অজ্ঞান হয়ে যাবে ও। যতবার আমাদের বেরোতে হচ্ছে ততবারই বিরক্তিতে গজ গজ করে নো ডেকে উঠছে 'থাও-থাও' বলে।

কিন্তু তৃতীয়বারে অর্ধমৃত অবস্থায় গুহায় ফিরলাম আমিই। থাও আমাকে শুইয়ে দিল। চোখ চাইতে গিয়ে মনে হলো চোখদুটোকে কে যেন আঠা দিয়ে জুড়ে দিয়েছে। আমার ঘুমের ঘোরকে স্পর্শ করল গুহার শীতলতা। আমি নিজেই কেবল শুনতে পাচ্ছি আমার নিজের ফিস্‌ফিস্‌ করে বলা কথাগুলো।

এতক্ষণ যারা রাস্তা তৈরির কাজে ব্যস্ত ছিল, তারা তাদের শিবিরে ফিরে খাওয়া-দাওয়া না করেই আমাদের সাহায্য করবার জন্যে এই পাহাড়ে এসে গেছে। বহুদূর থেকে যেন শুনতে পেলাম কাশির আওয়াজ। ছেলেরা কথা বলছে, থাও উত্তর দিচ্ছে ওদের কথার। নো-কে জ্বালাতন করছে ওরা। ও প্রথমে বিরক্ত হচ্ছে তারপর হেসে উঠছে। গুনগুন করে গান গাইছে।

ওর চুলগুলোর ছোঁয়া লাগছে আমার গালে। ওর গরম নিঃশ্বাসে ভরে গেছে আমার সারা দেহ। আমার মনে হলো যেন আমার মায়ের কোলে শুয়ে আছি আমি।

"হ্যানয়ের লোকেরা এসে গেছে।" সংযোগ সচিবের গলার স্বর চিনতে পারলাম আমি। ঘুম থেকে জেগে উঠি। সংযোগ সচিবও এসেছে হ্যানয় থেকে। ওর বাবা একজন ইলেকট্রিসিয়ান আর ওর মা কাজ করেন পোশাকের কারখানায়। ছাত্রাবস্থায় প্রায়ই ক্লাস পালাতো ও, আর বছরের শেষে খারাপ নম্বরে ঝুড়ি বোঝাই করত। কিন্তু এখানে এসে একবার একই সংগে পাঁচটা জ্যান্ত বোমা খাদে গড়িয়ে ফেলে বিস্ফোরণ ঘটিয়ে রাস্তাটাকে বাঁচিয়েছিল। ওর আচার ব্যবহার খুবই ভালো আর খুব মিশুক ছেলে।

কিন্তু সিগারেট পছন্দ করে না ও একেবারে, আর পছন্দ করে না এই আমাদের মতো মেয়েদের যারা ওকে একবার বিরক্ত করার সুযোগ পেলে কখনও রেহাই দেয় না।

আমরা বলি ওকে—"বল না তোমার পছন্দের মেয়েকে নিয়ে কবে বেড়াতে

যাবে ? মেয়েটির চুলগুলো কি ছোট ছোট করে ছাঁটা হবে ? সে কি সাধারণ জামাকাপড় আর ছেলেদের মতো জুতো পরে বেড়াতে যাবে ?"

ও লজ্জায় লাল হয়ে গিয়ে মাথা চুলকোয় আর বলে—"মেয়েরা শোন, প্রত্যেক নিয়মেরই ব্যতিক্রম আছে। আমি কাউকেই পছন্দ করি নি এখনও।"

চোখ খুলি আমি। অন্ধকার ঘন হয়ে এসেছে গুহার ভেতর। বারুদের কোষে ছোট্ট মোমবাতি জ্বলছে। বড় কার্ডবোর্ডে আঁকা চাচা হো-এর ছবিটা দাঁড়িয়ে আছে। ছবিটার নিচে গোলার খাপে প্রতিদিন রাখা থাকে টাটকা ফুল। আধোছায়ায় কেউই বুঝতে পারে না ফুলের পাপড়ির সঠিক রঙ। আজ রাখা আছে একটা ফুলের তোড়া—নিশ্চয়ই আমাদের দিয়েছে কেউ। ঠিক কাকে দেওয়া হয়েছে ওটা-তা জানে না কেউ। সংযোগ সচিব জল গরম করছে। আমি ওর পিঠটা দেখতে পাচ্ছি শুধু। আয়না বসানো কাপড়ের আলমারি পাল্লার মতো চওড়া ওর পিঠ। কিন্তু উঠে দাঁড়ালে বোঝা যাবে ওর-কোমর কত সরু। ঠিক পিঙ্‌পঙ্‌ খেলোয়াড়দের মতো চেহারা ওর। ভারি প্রাণবন্ত আর মিশুকে ছেলে।

বাইরে সারবাঁধা গাড়ির আওয়াজ শোনা গেল। সারা দিনরাতের সব থেকে মিষ্টি সময় এল। বাইরে যেতে হবে আমাকে। গুহার দেওয়ালে পা-দুটো রেখে হাতদুটো পেছনে দিয়ে জোরে চাপ দিয়ে উঠে বসবার চেষ্টা করি আমি। উরুদুটো দপ্‌দপ্‌ করে উঠল, আমার মাথায় আর শরীরের প্রতিটি গ্রন্থিতে অসহ্য ব্যথা। তবুও উঠে দাঁড়াই আমি। সংযোগ সচিব লাফিয়ে সাহায্য করতে এগিয়ে আসে—"কি, তোমার কি মাথা খারাপ হলো ? ক্লান্তি লাগলে ঘুমাতেই হবে তোমাকে।"

"বাইরে রাস্তায় যেতে চাই আমি।"

"ও রাস্তায়"—বলে ঠোঁটের ফাঁকে সাজানো দু'সারি দাঁত বার করে হো হো করে হাসে ও। তারপর ভ্রুকুটি করে বলে—"এখন কোথাও যেতে পাবে না তুমি। আগে ঘুমাও।"

"ঘুমাবো ? তুমি পাগল হলে নাকি ?"—বলে গজ গজ করতে করতে হাতড়াতে হাতড়াতে দরজার দিকে এগোই। আমি একাই শুধু উত্তেজিত হয়ে উঠেছি তা নয়, নো-ও অদৃশ্য হয়ে গেছে। থাওকেও পাগলামীতে পেয়েছে—পাহাড়ের ওপর ওর উজ্জ্বল হাসি শুনতে পাচ্ছি আমি।

এক সুড়ঙ্গ-খুঁড়িয়ে দলের মধ্যে গলার আওয়াজ শুনে নো-কে চিনতে পারলাম আমি। নো বললো আমাকে, এখন প্রায় মাঝরাত। গাড়ির সার আসছে, আমার ঘুমের অবসরে পাহাড়ে আরো বেশ কয়েকবার বোমা পড়েছে। কিন্তু সহায়ক সেনাবাহিনীকে ধন্যবাদ। এখনও সব কিছু ঠিকঠাক চলছে।

পাহাড়ের ওপর থেকে আমরা বুলডোজার আর গাঁইতি চালানোর আওয়াজ শুনতে পাচ্ছি। অনেক লোকের হাসি আর গলার স্বর শোনা যাচ্ছে। মাঝে মাঝে আসছে বিস্ফোরণের আওয়াজ। আকাশের তারারা কাঁপছে আমাদের মাথার ওপর। অর্ধচন্দ্রাকৃতি আকাশে ছড়িয়ে আছে সবুজ জেড্‌পাথর-গলা স্বচ্ছজলের মতো সুদূর নীহারিকার দল। অসীম এই বঙ্কিম আকাশ। আগ্নেয়াস্ত্রের শক্তিনির্ধারণপটু এক সৈনিকের লেখা একটা কবিতার কথা মনে পড়ছে আমার। চলন্ত গাড়ির সারির মধ্যে কোন একটার ভেতর থেকে আমাদের দিকে কবিতাটা ছুঁড়ে দিয়েছিলো সে। আমাদের উদ্দেশ্যেই লেখা কবিতাটা। সেই কবি আমাদের সম্বন্ধে বলেছিলো—"পাহাড়ের মাথায় সুদূর নীহারিকা আমরা।" দ্যুতিময় তারকা যদি বা আমাদের বলে তো বলুক। কিন্তু আমরা সুদূর হবো কেন? নিজেদের মধ্যে এই নিয়ে অনেক আলোচনা করে শেষে আমরা সাব্যস্ত করেছি যে এই 'সুদূর' বিশেষণটি শুধু কবিতার সৌন্দর্য বাড়ানোর জন্যেই প্রয়োগ করেছে কবি। তাকে একবার দেখতে পেলে খুব খুশি হতাম আমি। কিন্তু সে তো চলে গেছে অনেক দূরে...

এখানে গাড়ির সারি এসে পৌঁছলো ঠিক মাঝরাতে। ইঞ্জিনের জয়ধ্বনি শোনা গেল। পথ হয়ে উঠল সজীব, সরব। পাঁচ নম্বর গাড়ির ড্রাইভার আমাদের দেখতে পেয়ে বললো—"কী হ্যানয়ের খুকীরা, মা'র জন্যে মন কেমন করছে?"

হাতে সাদা ব্যাণ্ডেজ জড়ানো নো বললো—"ওকে কোয়াঙ্‌ ট্রুঙ্‌ রেজিমেণ্টের থ্যাও-এর মতো দেখতে।" সে চুপ করে রইল আবার। নো-এর মুখখানা ভারী মানানসই ধরনের গোল, নাকটা খাড়া। আমার গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে ও, আবার ওকে মনে হচ্ছে হালকা তাজা আইসক্রীমের মতো।

ও বললো—"ওরা আমাকে হাসপাতালে যেতে বলেছিল, কখনো যাব না আমি। একঘেঁয়ে খাওয়া, বড়ি গেলা, মাংসের সুরুয়া—বাপরে বাপ। বেশি করে খেতে হবে বাড়ির দেমাকী আদুরে মেয়ের মতো। আমাকে ধরে নিয়ে যেতে চাইছিল ওরা—আমি কিন্তু ওদের বোকা বানিয়ে পালিয়ে এসেছি। হাস-পাতালের কথা ভেবে এখনও কাঁপুনি হচ্ছে আমার—ধ্যাৎ!"

'ধ্যাৎ' বলে ও এমনভাবে ফিরল আমার দিকে যে দেখে মনে হলো আমিই যেন এক্ষুণি এ্যাম্বুলেন্সে তুলতে যাচ্ছি ওকে। তারপর একজন সুড়ঙ্গ-খুঁড়িয়ের দিকে ফিরে ও তার সঙ্গে খসে-পড়া তারার বিষয়ে আলোচনা শুরু করে দিল। এরা জঙ্গলের ওধারে তারা খসে পড়া দেখেছে।

কিছুটা দূরে বুকের ওপর আড়াআড়ি হাত রেখে দাঁড়িয়ে আছি আমি। চেয়ে আছি লোকেদের দিকে নয়—ট্রাকগুলোর দিকে। আমার ভাবভঙ্গি
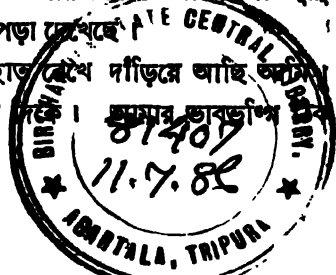
আগেরই মতো। কিন্তু কী করে এমন নিস্পৃহ থাকব? ঠিক এমনই পরম মুহূর্তে? কেন পারছি না—কেন কিছুতেই পারছি না এমন মধুর ক্ষণে পাহাড়ের ওপরের প্রতিটি যোদ্ধার কাছে ছুটে গিয়ে সুখে-আনন্দে কাঁদতে? কিন্তু আনন্দ, সুখ, তারুণ্য সবকিছুই তো পূর্ণ বিকশিত হয়ে উঠেছে আমার হৃদয়ে আজ এই মুহূর্তে। সবাইকেই ভালোবাসার এক জোয়ার লেগেছে আমার মনে। এই ভালোবাসার উষ্ণ স্পর্শ ভাষায় ব্যক্ত করা যায় না। একে শুধু বুঝবে তারাই যারা আমারই মতো এই পাহাড়ের ওপর এই স্মরণীয় মুহূর্তটিকে অনুভব করেছে।

গাড়িতে ভরে গেছে সারা পথ। সব আলো গেছে নিভে। কামোফ্লাজের সবুজ ডালপালাগুলো ট্রাকের উচ্চতাটাকে দ্বিগুণ করে তুলেছে। আমার মনে হচ্ছে এই গাড়ির সারি অনন্ত, অসংখ্য, অতল, বিপুল।

"আজ রাতে এদের মধ্যে কেউ কেউ নিশ্চয়ই হ্যানয় থেকে এসেছে"—আমার কানে ফিস্‌ফিস্ করে বললো নো। তার অবস্থাও ঠিক আমারই মতো। ওর মনেও লেগেছে ভালোবাসার জোয়ার। যুদ্ধের আগুনে ঝাঁপ দিতে চলেছে যে সৈনিকরা তাদের সকলের জন্যই এই ভালোবাসা। এ ভালোবাসা ঠিক তাদেরই মতো মহৎ নিবিড়, নিঃস্বার্থ। নো-র কাঁধটা জড়িয়ে ধরি আমি। চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকি আমরা। ওর নরম কাঁধে আরো জোরে চাপ দিই আমি। ফ্রন্টের পথে, আজকের এই রাতে বোমার টুকরোয় ভরা এই পাহাড়ে আমারই মতো আমার পাশে দাঁড়িয়ে আছে নো রাজধানীর এক সাহসী মিষ্টি মেয়ে।

আমরা দুজনে দুজনকে জেনেছি, বুঝেছি আর অনুভব করেছি দুজনের একক আনন্দ।

বৃষ্টি

নগুয়েন থি ন্যু ট্রাঙ্

রাত্রি নামার সঙ্গে সঙ্গেই বাসটা থামল। সদ্য ঘুম ভাঙা স্বরে যাত্রীরা প্রশ্ন করল—"আমাদের কি এইখানেই নামতে হবে ?"

চালক চাপা স্বরে উত্তর দিল—"হ্যাঁ। ইভাক্যুয়েসনের সময় থেকেই বাস স্টেশনটা এখানে সরিয়ে আনা হয়েছে।"

বাসের ছাদের ছোট্ট আলো জ্বলে উঠল। সবাই ব্যস্ত হয়ে পড়লো যে যার মালপত্র সামলে নামবার জন্যে ; থু মাথার মিলিটারী টুপি আর পিঠে বাঁধা বোঁচকাটা সামলে বাসের নড়বড়ে বসবার জায়গাগুলো ডিঙিয়ে বাইরে বেরিয়ে এল।

গুমোট আবহাওয়ায় দেখা গেল বসন্তের বিবর্ণ চাঁদ। সারিবদ্ধ সুদৃশ্য "ফিলাও" গাছের ছায়ায় ঘেরা পাহাড়টার দিকে দুরন্তবেগে ছুটে চলেছে ধোঁয়াটে মেঘগুলো বৃষ্টি হয়ে ঝরতে। একজন নাবিক সাহায্য করল থু-কে বাস থেকে নামতে। থু-র সঙ্গে আলাপ শুরু করল—"কমরেড, আমি ড্যান-এ যাচ্ছি—ওটা কি তোমার যাওয়ার পথেই পড়বে ?"

মিষ্টি স্বরে উত্তর এল—"আমি এখানে খুব কাছেই থাকি—ওই পাহাড়টার উল্টো দিকে। তোমার বোতলে কি একটু জল আছে ?"

যুবক জলের বোতল এগিয়ে ধরল আর মেয়েটির মুখখানিও সে দেখতে চেষ্টা করল। সে দেখল জুনিয়ার স্ট্রাইপ লাগানো চিকিৎসকের পোশাক পরা একটি সুঠাম দেহ আর দুটি নীল চোখ।

থু কয়েক ঢোক জল খেয়ে বোতলটি ফিরিয়ে দিল আর সেই সঙ্গে মৃদু হেসে ধন্যবাদ জানাল যুবককে।

পাহাড়ের চূড়োয় যে স্কুলটি ছিল থু সেই দিকেই যাত্রা শুরু করল। যুবককে জানাল বিদায় সম্ভাষণ। থু ভাবতে লাগল চারিদিকে খোলামেলা "ফিলাও" গাছে গোল করে ঘেরা স্কুল বাড়িটির কথা, তাদের ক্লাশ ঘরের বাইরের সেই একই ধরনের টানা দালানগুলোর কথা, তাদের সেই লেখার বোর্ড-গুলো, নানান কারুকার্য করা আর অর্থহীন কবিতা খোদাই করা তাদের ডেস্ক-গুলোর কথা। স্বচ্ছ বুকে অজস্র প্রতিচ্ছবি নিয়ে পাহাড়ের কোল ঘেঁষে বয়ে চলেছে যে নদীটি আবার তাকে দেখতে পেল সে। নদীটি যখন "ক্যাম্ নগুওই" আর "মাম্ সোই"-এর ঘন ঝোপের পাশ দিয়ে বয়ে চলে, তখন তার

জলের রঙ হয় গাঢ় কালো। যখন কোন সূর্যালোকিত প্রান্তরের কাছ দিয়ে বয়ে যায় তখন তার বুকে লাগে আলোর ঝলক। খসে পড়া ফল পাতাগুলো ভাসতে থাকে তার বুকে।

সামরিক মেডিকেল স্কুলে পড়তে যাওয়ার আগে থু তার সব শেষ ক্লাশের পড়া সাঙ্গ করেছিল এই স্কুলেই। জীবন পরিবর্তনে ভরা। সেখানে মুহূর্তেই ওলোট-পালোট হয়ে যায় দীর্ঘ চিন্তায় সুন্দর ছকে আঁকা কত মানুষের ভবিষ্যৎ। থু ছিল একটি নরম মিষ্টি মেয়ে। সে রচনায় বরাবর নম্বর পেতো সব থেকে বেশি। তাই সে ভাবতো সাহিত্যিকের জীবনই হবে তার ভবিষ্যৎ। অবশ্য এই আশার কথা সে মুখ ফুটে কখনও তার কোন ঘনিষ্ঠতম বন্ধুর কাছেও প্রকাশ করে নি। সে পড়তে ভীষণ ভালবাসতো। তার সব অবসর-গুলোই কেড়ে নিতো বই আর পত্র-পত্রিকাগুলো। কিন্তু সত্যিকারের সাহিত্যিক হওয়া যে কত কঠিন সেটাও সে বুঝতে পেরেছিল অচিরেই। সাহিত্য সাধনায় সে কোনদিনই পেঁছিতে পারবে না তার আকাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে।

স্কুলের শেষ পরীক্ষায় বেশ ভালো নম্বর পেয়ে মধুর প্রশান্তি নিয়ে থু অপেক্ষা করছিল তাদের আগামী সমাবর্তন উৎসবের জন্যে। তার কারণ এক-মাত্র শিক্ষা-দপ্তরই তাকে পড়তে পাঠাতে পারে তাহার বহু ঈপ্সিত বিদেশী শিক্ষায়তনে। মার্কিনীরা ঠিক এই সময়টাকেই উত্তর ভিয়েতনামে তাদের যুদ্ধ শুরু করার চরম মুহূর্ত হিসেবে বেছে নিল। প্রতি সন্ধ্যায় থু তার বাড়ি থেকে দেখত দূরে দিগন্তে আগুনের ঝলকানি আর সেই সঙ্গে শুনতে পেত বিস্ফোরণের প্রচণ্ড শব্দ। তার দাদা বলতো—"কুয়াঙ বিন্ প্রদেশটাকে ধ্বংস করে দিচ্ছে মার্কিনীগুলো! রাতে ঘুমানোও ক্রমশ অসম্ভব হয়ে উঠতে লাগল। গভীর রাতেও তার মা বিছানায় বসে বসে পান খেতেন। বিছানায় এপাশ-ওপাশ করত তার দাদা। থু-এর মনে হতো তার দাদার অন্তরের পুরানো ক্ষত যেন আবার তাকে অধীর করে তুলছে। দাদার স্বভাবে অদ্ভুত পরিবর্তন লক্ষ্য করল থু। দাদা তার কথা বলা প্রায় ছেড়েই দিল। সর্বদাই তাকে মনে হতো বড়ো বিক্ষুব্ধ।

থু-এর দাদা সপ্তাহ-দু'য়েক পর কাজের জায়গা থেকে ফিরল সম্পূর্ণ নতুন মানুষ হয়ে। মুখে তার বিবর্ণ খুশির ঝলক। তাকে দেখে মনে হচ্ছিল তার বয়েস যেন অনেক কমে গেছে। তার প্রিয়তমার সঙ্গে প্রথম মিলনের দিনটির মতোই তাকে উজ্জ্বল আর প্রশান্ত মনে হচ্ছিল। আজ সৈন্যবাহিনীতে যোগ দেবার আহ্বান পেয়েছে সে।

বাবার সঙ্গে খাঙ্ সেদিন গভীর রাত পর্যন্ত কথা বলেছিল। থু-এর বেশ মনে আছে বাবাকে তার দাদা খুব গম্ভীর আর বিচলিত স্বরে প্রশ্ন

করেছিল—"তোমার কি মনে হয় বাবা সেনাবাহিনীর কোন শাখাতে সবচেয়ে বেশি দক্ষতা দেখানো যায় ?"

সুদীর্ঘকাল সশস্ত্রবাহিনীতে কাজ করে অবসরপ্রাপ্ত বাবা উত্তর দিয়েছিলেন —"সবচেয়ে দক্ষতা ? মার্কিনীদের সঙ্গে লড়তে যারা তোমায় সব থেকে বেশি সুযোগ দেবে সেই শাখাই ।"

মা বড় কষ্ট পেতেন কোমরের ব্যথা নিয়ে। মা চুপ করে শুয়েছিলেন বিছানায়। যখনই মা শুনলেন তাঁর ছেলে সেনাবাহিনীতে যোগ দিতে চলেছে, তাঁর চোখের চাউনি বদলে গেল। এখন মা'র মুখে ফুটে উঠেছে অজস্র বলি-রেখা, কিন্তু কম বয়সে মা ছিলেন অপূর্ব সুন্দরী। সে রাতে মার মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল এক অপূর্ব জ্যোতিতে।

থু-এর বিদেশ যাত্রার প্রতীক্ষায় যবনিকাপাতও হলো সেই মুহূর্তেই। মার্কিনী আক্রমণ ক্রমশ বাড়তে লাগল—আরো কাছে এগিয়ে আসতে লাগল। সর্বত্র নিষ্প্রদীপ ! খাঙ-এর বন্ধুরা সবাই খুব ব্যস্ত। নিজেদের মধ্যে সব সময়েই আলাপ-আলোচনা করছে। সবাই প্রস্তুত হচ্ছে সেনাবাহিনীতে যোগ দেবার জন্যে। বাবা পুরানো বইয়ের মধ্যে লুকানো যুদ্ধের সময় প্রয়োজনে লাগাবার মতো নানান কাগজপত্র খুঁজছেন সারা দিন-রাত।

সংসারের নানা খুঁটি-নাটি কাজ শেষ করে মা অবসর সময়ে ছেলের যাত্রার আয়োজন সম্পূর্ণ করছেন। বিদেশ যাবার প্রতীক্ষারত সেই ছোট্ট মেয়েটির কথা যেন ভুলে গেছে সবাই। নিজের বাড়িতেই নিজেকে বড় বেমানান মনে হতো থু-এর। একটা অশান্তি পাকে পাকে জড়িয়ে ধরেছিল থু-কে। তার বিদেশ যাওয়ার বাসনাটা তার নিজেরই মনে হচ্ছিল নিতান্ত স্বার্থপরতা বলে। তার অত্যন্ত আপনজনেদের এই বিপদের মধ্যে ফেলে রেখে তার বিদেশ যাওয়াটা যেন একটা পলায়নীবৃত্তি।

এই অসহনীয়তার চাপে সে সিদ্ধান্ত নিল যে নিজের দেশেই থাকবে, আর ডাক্তারী পড়বে। প্রথমে যে ধরনের কাজগুলো তাকে বিচলিত করত ক্রমে সবগুলোই তার অভ্যস্ত হয়ে গেল। যুদ্ধের সময় সৈনিকদের কঠোর রুক্ষ জীবনযাত্রা, মাটির নীচের আশ্রয় শিবিরে অস্ত্রোপচার, তাজা বোমার পাশ দিয়ে হেঁটে যাওয়া, সারারাত ধরে ক্লান্তিকর পদযাত্রা—সবেতেই অভ্যস্ত হয়ে উঠলো সে। এই নতুন অভিজ্ঞতা তাকে এনে দিল এক মধুর চমক—যেটাকে সে কখনই লুকোবার চেষ্টা করত না।

এখন সে পৌঁছে গেছে পাহাড়ের চূড়োয় তার স্কুলের চত্বরে। অদ্ভুত পরিবর্তন হয়েছে জায়গাটার। ভাঙা-চোরা পরিত্যক্ত স্কুলবাড়ি। দালানগুলো ভরে আছে 'ফিলাও' গাছের শুকনো ডালে, পাখির পুরীষে আর ছাদের ভাঙা

টালির টুকরোয়। একটা এ্যাণ্টি-এয়ারক্রাফ্‌ট্‌ ব্যাটারী লাগানো হয়েছে সেখানে। তার নলগুলোর মুখ আকাশের দিকে করা আর নীচের দিকটা মাটির সংগে একটা জ্যামিতিক 'কোণ' সৃষ্টি করেছে।

"সবই গেছে বদলে। আমিও আর আগেকার সেই আমি নেই"—ভাবল থু। সংগে সংগেই মনে ভেসে উঠল তার দাদা থাঙ-এর ছবি। এই রাস্তা দিয়েই সে আর থু একসংগে স্কুলে যেত। আজ সে ফ্রণ্টে আছে আর থু-ও চলেছে তার সংগে যোগ দিতে। শুধু চলে যাওয়ার আগে তার মাকে বিদায় জানাতে দু'-একদিনের ছুটি নিয়ে এসেছে সে। স্কুলের 'ফিলাও' গাছগুলো অদ্ভুতভাবে বেড়ে উঠেছে তার দু' বছরের অনুপস্থিতিতে। ধূসর মেঘ ভারাক্রান্ত আকাশের নীচে মর্মর ধ্বনিতে তারা যেন অভ্যর্থনা জানাচ্ছে থু-কে। শিশির ভেজা পাতাগুলো জড়িয়ে যাচ্ছে তার পায়ে। তার মনে পড়ে গেল যেখান থেকে সে সবে এসেছে সেই চতুর্থ 'জোনের' সমুদ্র তীরের গ্রামগুলোতে যাবার পথে সারিবাঁধা 'ফিলাও' গাছগুলোর কথা।

ছোট্ট কালো কুকুরটা দৌড়ে এলো কাছে, সে চিনতে পেরেছে থু-কে। সামনের থাবা দুটো ওর পায়ের ওপর তুলে দিয়ে সে উল্লসিত হয়ে ডাকতে শুরু করল।

গেটে হাত দিয়ে সেটি খুলেই থু সেই অনেক দিনের চেনা গেট-খোলার আওয়াজটা শুনতে পেল। অন্তরের প্রবল আলোড়নকে শান্ত করতে থু বড় করে একটা শ্বাস নিল। একটা আলো তখনও জ্বলছে। দরজার কাছে আরো এগিয়ে গিয়ে দেওয়ালের ফাটার ভেতর দিয়ে সে দেখতে লাগল। বাতির আলোয় মা সেলাই করছেন। কোন পরিবর্তন হয় নি মা-র। দূর থেকে কল্পনায় থু মায়ের যে ছবি দেখত মা ঠিক তেমনিই আছেন। মাধুর্য আর বুদ্ধির দীপ্তি আজও অম্লান হয়ে আছে মায়ের চোখে। শুধু মনে হয় সেলাইয়ে নিপুণ হাত দুটি যেন একটু অপটু হয়ে পড়েছে। থু নিঃশব্দে এই দৃশ্য দেখতে লাগল। তার অস্থির হৃদয় এখনই মায়ের কোলে ঝাঁপিয়ে পড়তে চাইছে। সর্বশক্তি নিয়ে "মা" বলে চেঁচিয়ে ডাকতে ইচ্ছে করছে তার। অনেক কষ্টে নিজেকে সংযত করল থু। হঠাৎ একটা দুষ্টুমি এসে গেল তার মাথায়, মুখে ফুটে উঠল সরব হাসি। সে ধাক্কা দিল দরজায়।

"কে ওখানে ?"

গলার স্বর বদলে উত্তর দিল থু, "আমি মিশনের একজন 'ক্যাডার'। অন্ধকারে রাস্তা ভুল করে ফেলেছি—তুমি আমায় একটু থাকতে দেবে ?"

দরজা খুলে গেল, মা আলোটা একটু উঁচু করে তুলে ধরে আগন্তুককে

দেখতে গেলেন। আলো হাতে মাকে দেখে হাসিতে ফেটে পড়ল থু। মার মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল খুশিতে। "থু সোনা আমার! একজন বুড়ো মানুষকে বোকা বানাতে তোমার লজ্জা করল না?"

মার হাতের কেরোসিনের বাতিটা কাঁপছিল। মেয়ের পিঠে বাঁধা ব্যাগটি খুলতে মা কোনোরকমে সাহায্য করলেন। থু ততক্ষণে তার ইউনিফর্ম খুলে ফেলেছে। ভেতরে পরা ছিল ছোট হাতা সার্ট। অল্প তামাটে হয়ে যাওয়া তার নরম গলার কিছুটা অংশ দেখা যাচ্ছিল। অতি পরিচিত মধুর স্মৃতিগুলোকে আরো সজীব করে তোলবার জন্যে সে ঘরের এধার থেকে ওধার ঘুরে বেড়াতে লাগল। মিষ্টি আলুর মধুর গন্ধ, কালি ছেটানো পুরানো টেবিল, জলার দিকের জানলাটা, সেই পেয়ারা গাছগুলো, সবই তার অতি পরিচিত। মাধ্যমিক পরীক্ষার পরে তোলা তার নিজের একটা ছবি দেখে সে নিজেই হেসে উঠল। এ কি তারই ছবি? ও কি সেই মেয়ে যে এমন ভীরু হাসি হাসতো?

আনন্দের আতিশয্যে মা'ও যে কি করবেন ভাবতে পারছিলেন না। সেলাই-গুলো তাড়াতাড়ি একপাশে সরাতে গিয়ে সেগুলো বিছানার ওপর পড়েই গেল। মায়ের ঠোঁটের ডগায় আসছিল বহু প্রশ্ন আর মৃদু ভর্ৎসনা। থু ফিরে দাঁড়িয়ে মার হাত ধরল। শীর্ণ হাতে অনায়াসেই সে অনুভব করতে লাগল মার অশান্ত নাড়ির গতি। জল আসছিল তার চোখে। মা তার কাছে এসে বসলেন। সে ফিরে এসেছে। মার সেই ছোট্ট আদরের মেয়ে। "তুই কি সত্যিই থু? এটা আমার কল্পনা নয় তো? – খুকু, তোর আর তোর দাদার জন্যে যে আমার কত চিন্তা হয়—আর তোদের দেখতে না পেলে আমার যে কতটা কষ্ট হয় তা তোরা বুঝতে পারবি না রে! প্রতিদিন আমি ভাবি তোরা এখন কোথায় আছিস, কি করছিস। তোদের ঠিকমতো খিদে হচ্ছে কি না। অতদূরে আমাকে ছেড়ে তোরা ভালো করে ঘুমোতে পারছিস কিনা। গাছের পাতার সামান্য শব্দে নয়তো অল্প হাওয়ায় নড়ে ওঠা দরজার শব্দেই কতো রাতে আমার ঘুম ভেঙে যায়!" মা পূর্ণদৃষ্টিতে থু-এর সর্বাঙ্গ দেখতে থাকেন। তাঁর সেই ছোট্ট থু কত বদলে গেছে। আজ থু-এর পদক্ষেপে নেই কোন ভীরুতা। তার প্রতিটি পদক্ষেপে ফুটে উঠেছে তার আপন ব্যক্তিত্ব। আনন্দ পরিপূর্ণ মায়ের বুকে তবু জেগে থাকে সংশয়। থু-এর হাতটা সরিয়ে দিয়ে মা তাঁর কাঁপা আঙুলগুলো বুলোতে শুরু করেন তার মুখে। হাত বুলোতে থাকেন তার ঝুলেপড়া চুলের গোছায়। তারপর মার হাতদুটি নেমে আসে থু-এর কাঁধে—এখানেই স্থির হয় মায়ের হাত। তাঁর হৃদয় শান্ত হয় থু-এর চুলের সুবাসে আর তার স্বাস্থ্যোজ্জ্বল চেহারার ঝলকে। তাঁর মেয়ে ফিরে এসেছে তার মায়ের কাছে। আনন্দ উচ্ছ্বাসে বিদীর্ণ হতে চায় মাতৃহৃদয়।

তারা দুজনে দুজনকে জড়িয়ে ধরে বসে থাকে। আলোর শিখাটা কাঁপতে থাকে।

মা সহসা লাফিয়ে উঠে বিস্ময়াবিষ্ট স্বরে বলে ওঠেন, "এ কি করছি আমি ? তোর নিশ্চয়ই খুব খিদে পেয়েছে ? কি খাবি 'স্যুপ' না ভাত ?"

"মা আমার কোন তাড়া নেই। বাবা কোথায় ?"

দাদা থাণ্ড-এর বদলে বাবা এখন কারখানায় কাজ করছেন। আর শ্রমিকদের কাজের বিশেষ উন্নতির জন্যে নূতন পদ্ধতিতে শিক্ষা দিচ্ছেন। থু দেখল বাবার ছাত্রদের খাতা খোলা পড়ে আছে তাঁর টেবিলে। বাবার তৈরি করা পাঠ্যক্রমের শিরোনামা নজরে পড়ল থু-এর। একটা লাল চৌকোর ভেতরে বড় বড় হরফে লেখা—"ঢালাই লোহার প্রতিরোধ ক্ষমতা।"

"বাবা কি রোজ যায় ?"

"না, সপ্তাহে দু'বার যান। ওঁকে অনেকদূর যেতে হয়। ইভাক্যুয়েশনের সময় কারখানাটা বহুদূরে সরিয়ে নিয়ে গেছে।—আমি যাই তোর ভাত ঠিক করতে।"

"রাত্তিরের খাবারের কিছু বাঁচে নি ?"

"হ্যাঁ, সেই ভাতটাই আমি তোর জন্যে ভেজে দেব।"

মা বাতি নিয়ে তাড়াতাড়ি চলে যান।

"মা !"—ফিরে দাঁড়ান মা।

"তাড়াতাড়ি কর, আমার বড্ড খিদে পেয়েছে"—হাসি ফুটে ওঠে মার মুখে।

থু এসে পড়াতে মার যে জামাকাপড়গুলো সেলাই-এ বাধা পড়ল সেই জামাকাপড়ের স্তূপের ওপরই শুয়ে পড়ে সে। অন্ধকারে সে বারবার বলতে থাকে—'মা ! মা ! মা !', সে হঠাৎ অনুভব করে এখন যে কথাটা জানাতে সে মার কাছে এসেছে সেটা সহ্য করা তাঁর পক্ষে কত কঠিন হবে ! মার মনে কী অনুভূতি হবে যখন তিনি শুনবেন যে তাঁর দুই ছেলেমেয়েই দেশে থেকে গেল। উচ্চশিক্ষার্থে কারুরই বিদেশ যাওয়া হলো না ! এখন তাদের খবরাখবর পেতেও মার অনেক দেরি হবে। মা কি করবেন ?—কাঁদবেন ?—না চুপ করে থাকবেন ? নাকি তাকে এমন কতকগুলো ব্যাপারে সাবধান করবেন যেগুলো সব সময় মেনে চলাও তার পক্ষে সম্ভব হবে না।

"সোনা আমার, সকালে দেরি করে উঠ না, ভেতরে পরবার জামাকাপড়গুলো সকলের চোখের সামনে শুকোতে দিওনা। ভিজে পায়ে চারিদিকে ঘুরো না—" এইরকম নানা উপদেশ।

না, মাকে আজ সে কিছুই বলবে না। কালও না। সে তার বাবা ফিরে আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করবে। নির্মম কর্তব্যের আঘাতে এই মধুর আনন্দের

মুহূর্তটিকে হারাতে চায় না সে। কিন্তু মা'র কাছ থেকে এত বড় খবরটা চাপতে গিয়েও তার হৃদয় ক্ষতবিক্ষত হচ্ছিল।

স্টোভের আগুন জ্বলছে। স্টোভে চাঁপানো চর্বিটা গলছে। দেওয়ালের গায়ে পড়ছে মার ছায়া। ছায়াটা এত বড় আর এত ছাড়াছাড়া যে দেখে হাসি পাচ্ছিল থু-এর।

মা চিরদিন নীরব। যখনই সে তার মায়ের এই বৈশিষ্ট্যটির কথা ভাবে তখনই সে অভিভূত হয়ে যায়। তার ধারণা আজও সে তার মাকে সম্পূর্ণ চিনতে পারে নি। মার সাহসের, তাঁর সহ্যশক্তির পূর্ণ মূল্যায়ন আজও সে যেন করে উঠতে পারে নি। মার দুশ্চিন্তা কত রকমের! কত ব্যস্ততা তাঁর সন্তানদের জন্যে! বিগত বহু দুর্ভোগের ছায়া আঁকা আছে মায়ের বিষণ্ণ চোখ দুটিতে।

মার বাবা ছিলেন একজন নামী চিকিৎসক। তিনি ছিলেন অস্থিবিশেষজ্ঞ। রাজধানীতেও ছড়িয়ে পড়েছিল তাঁর সুনাম। তারা চেয়েছিল রাজ্যের নিয়োজিত বিশেষ চিকিৎসকরূপে তাঁকে পেতে। তিনি কিন্তু ট্যান্ থুয়াট-এর সেবায় নিজেকে নিয়োজিত করে অনায়াসেই প্রত্যাখ্যান করেছিলেন সেই সম্মান ও পদমর্যাদা। দুটি বছর পরেই তাঁর স্ত্রী তাঁর ছোট মেয়েটিকে কোলে নিয়ে চোখের জলে ভাসতে ভাসতে চলেছিলেন একদল বন্দীর সঙ্গে, ফরাসী সাম্রাজ্য-লোভীরা যাদের নাম দিয়েছিলো "বাই সে-এর বিদ্রোহীদল" বলে। চিকিৎসক ও প্রতিনিধিবাহিনীর অন্যান্য দলনেতাদের সঙ্গে হয়েছিলেন কারারুদ্ধ। তিনি নিজের শিরোচ্ছেদের আদেশ শোনার পরও আপন প্রতিজ্ঞায় ছিলেন অনড়।

চাঁদ অদৃশ্য হয়ে গেছে মেঘের আড়ালে। জানলার ফাঁক দিয়ে যতটুকু আকাশ দেখা যাচ্ছিল তাও হয়ে গেছে আবছা। গরাদের ভেতর দিয়ে হাওয়া এসে বিড়ালটার লোমগুলো দিচ্ছে নাড়িয়ে। বিরক্তিতে গর্‌গর্ করছে বিড়ালটা। আঙুরের সুগন্ধ থু-এর খিদে বাড়িয়ে দিচ্ছে। তবু মার সম্বন্ধে চিন্তাটা থু কিছুতেই সরাতে পারছে না মন থেকে।

বিয়ের পরও তার মাকে অনেক কষ্ট সহ্য করতে হয়েছে। তাঁর যুবক স্বামীটি ছিলেন অত্যন্ত ব্যক্তিত্বসম্পন্ন। আণ্ডার গ্রাউণ্ড থেকে যুদ্ধ করতে করতে তাঁকে বহু বিপদের সম্মুখীন হতে হয়েছিল বহুবার, আর বিপদমুক্ত হবার অনেক উদ্ভাবনীপন্থাও আবিষ্কার করেছিলেন তিনি। জাপানীরা যখন ধানচাষীদের দিয়ে জোর করে পাট বোনাচ্ছিল তখন তার বাবা তাঁর কমরেডদের সঙ্গে নিয়ে সেই সরল একনিষ্ঠ চাষীদের মধ্যে এটার বিরুদ্ধে প্রচার অভিযান চালিয়েছিলেন। কর না-দেবার জন্যেও তাঁরা জনতাকে সঙ্ঘবদ্ধ করেছিলেন। মা তখন প্রতি রাতে তাঁর ভীত সন্তানদের নিয়ে একটা কুকুরের ডাক শুনলেও

কেঁপে কেঁপে উঠতেন। স্বামীর কাজের গতিবিধিটা তিনি খানিকটা ভুলতে চেষ্টা করতেন কিন্তু তাঁর অবচেতন মন ঠিকই তাঁকে বুঝিয়ে দিত, যে কোন-দিনই সুখের সংসারটার ওপর নেমে আসতে পারে চরম অমঙ্গল।

বাবা বন্দী হবার পর ছোট্ট ছেলেমেয়েদের খাইয়ে পরিয়ে বাঁচিয়ে রাখতে মাকে অত্যন্ত কঠোর পরিশ্রম করতে হয়েছে। একজন কমিউনিস্ট বন্দীর নিঃসম্বল অশিক্ষিতা স্ত্রীরূপে মাকে যে কত কষ্ট সহ্য করতে হয়েছে তা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। খাঙ, তাঁর বড় ছেলে, তখন মাত্র তাঁর বুকের সমান লম্বা। একদিন তিনি তাকে তাঁর অনেক কষ্টে জমানো চাল থেকে খানিকটা চুরি করে নিয়ে পালাবার সময় ধরে ফেলেন। মা প্রশ্ন করলেন—"এগুলো নিয়ে তুমি কি করবে?"

"মা, 'স্যুপ্' করো, আমার ভীষণ খিদে পেয়েছে।"

"বাজে বোকো না, আমাদের এখনও রাঁধা ভাত আছে। আমার কথার সঠিক উত্তর দাও।"

ছেলে কাঁদতে শুরু করল, মাটিতে ছড়িয়ে পড়ল চালগুলো।

'মা, আমি এগুলো দিয়ে মণ্ড তৈরি করে দেওয়ালে পোস্টার লাগাব।' বাবা আমাকে এটা করতে বলেছিলেন।"

মা কান্নায় ভেঙে পড়েন। স্বামীকে তিনি অত্যন্ত শ্রদ্ধা করতেন। তাঁর স্বামী সত্যিকারের একজন উঁচুদরের মানুষ। সংসারের উপর স্বামীর অত্যন্ত মায়া। সেই স্বামী যতদিন বাড়ি ছাড়া হয়েছেন ততদিন শুধু এই সংসারের চাকাটাকে সচল রাখতে তিনি মুহূর্তও অবসর পান নি সেই মানুষটির কথা ভাবতে। তিনি অন্তরে অটল আছেন শুধু এই বিশ্বাস নিয়ে যে তাঁর স্বামী যা কিছু করছেন বা যা কিছু করবেন সে কাজগুলি সবই নির্ভুল আর সেগুলো সব সমালোচনার উর্ধ্বে।

ছেলে অনবরত বলতে থাকে—"মা, বাবা আমাকে এটা করতে বলেছিলেন। বাবা পোস্টারগুলো লুকিয়ে রেখেছিলেন চালের বাতায়।" কান্না থামিয়ে সানুনয় দৃষ্টিতে মায়ের মুখের দিকে চেয়ে থাকে ছেলে।

"মা, তুমি চিন্তা কোরো না। আমি আগেও অনেকবার পোস্টার লাগিয়েছি। কিছুই হয় নি। ওরা আমার মতো ছোটো ছেলেদের দিকে বিশেষ নজর দেয় না।"

মা দুটি হাত বাড়িয়ে দেন ছেলের দিকে। চোখের জল ঝরতে থাকে ছেলের মাথায়। তাঁর এই ছোট্ট এতটুকু ছেলে এখনও যে খাবার সময় ছোট বোনের সঙ্গে খুনসুটি করে রোজ—তার সম্বন্ধে মা কি করে কল্পনা করবেন যে একদিন এই ছোট্ট হাতদুটিতেও উঠবে হাতকড়া। আর তার রক্ত হয়তো বা…।

না—অসম্ভব। এই রক্ত হবে মার আপন দেহেরই রক্ত—সেটাই ভিজিয়ে দেবে ছেলের মাথার কালো চুলগুলো।

'বাবা' কথাটার ওপর বিশেষ জোর দিয়ে ছেলে আবার পুনরাবৃত্তি করে—"বাবা আমাকে এটা করতে বলেছিলেন।"

মা এক অদ্ভুত ঘোরের মধ্যে অনুভব করেন ছেলের কাছে এই কর্তব্য কত বড়।

এটা যে কত বড় কর্তব্য সেটা অবশ্য মা সঠিক বোঝেন না। তবু তাঁর স্বামী যখন এটা করতে বলে গেছেন, তখন যেভাবেই হোক এটা করতেই হবে —এটুকু শুধু বোঝেন তিনি। উঠে দাঁড়িয়ে চোখের জল মোছেন তিনি। একটিও কথা না বলে ছেলেকে তার প্রয়োজনীয় চালগুলো ফিরিয়ে দিলেন।

প্রত্যেকটি মানুষ যে যার নিজের মতো করে পৌঁছে যায় বিপ্লবের পথে। মার পথ হলো তাঁর অপরিসীম মাতৃস্নেহ আর স্বামীর প্রতি প্রগাঢ় ভালবাসা।

প্রতিরোধের সময় যখন তাঁর স্বামী ও ছেলে ফ্রন্টে ছিল, মেয়েকে নিয়ে তখন তাঁকে বহুবার বাসাবদল করতে হয়েছে। জনসাধারণের স্বার্থে আর তাদেরই বিশ্বাস অর্জন করতে তাঁকে অনেক ত্যাগ স্বীকার করতে হয়েছে। থু অনুভব করতে পারে কতখানি আত্মসংযম ছিল তার মায়ের। কত কঠিন পরিস্থিতিতেও মা ছিলেন অবিচলিত। জীবনযুদ্ধে ছুটি কখনো মেলে নি তার মার। কখনও হয়তো তার বাবা কিম্বা আজকের কঠোর সংগ্রামী যুবক তার দাদা ফিরে এলে মা মুখখানি মধুর হাসিতে ভরিয়ে আবার রান্নাঘরে গিয়ে বসতেন। চোখ ভরে থাকত আনন্দাশ্রুতে। মুগ্ধ হয়ে তিনি শুনতেন পাশের ঘর থেকে ভেসে আসা উপযুক্ত ছেলের কণ্ঠস্বর। রোমাঞ্চিত হতো তাঁর দেহ। আবার যখন স্বামী ও ছেলে ফিরে যেত, প্রতিবারই মা বহুকষ্টে নিজের মুখের চিরাচরিত শান্ত ভাবটি অটুট রাখতেন আর তাদের প্রয়োজনের সবকিছুই করে দিতেন। থু কিন্তু তার মার চোখের দিকে গভীরভাবে চেয়ে বুঝাতে পারত তাঁর নিঃশব্দতার কি মূল্যই না দিতে হতো তাঁকে।

থু জানলার ধারে মার পাশে শুয়ে পড়লো। গরাদের ফাঁক দিয়ে দেখা যাচ্ছে একফালি আকাশ। পাতার ফাঁকে উঁকি মারছে কয়েকটি তারা। আকাশের পট পরিবর্তিত হচ্ছে বার বার। কখনও মনে হয় যেন খুব চেনা, আবার মনে হয় সম্পূর্ণ অচেনা। থু মনে মনে মধুর স্বপ্নের জাল বুনে যাচ্ছিল। কিন্তু যখনই তার স্বপ্নের খেইটা হারিয়ে ফেলছিল, মনটা তখনই বড় ব্যথিত হচ্ছিল।

মা তার চুলে হাত বুলিয়ে দিচ্ছিলেন। মায়ের মুখের পানের সুবাসে মদিরতা এনে দিচ্ছিল—সে নিশ্চল হয়ে শুয়েছিল। বহুদিন পরে আজ আবার

থু ঘুমোবে তার মার পাশে শুয়ে। মানুষের স্নায়ুকে ঘুম পাড়িয়ে দেবার সেই ওষুধের কটু গন্ধে-ভরা অস্ত্রোপচারের ঘরে ছুরি হাতে সেই বিনিদ্র রাত-গুলোকে আজ মনে হচ্ছে কত দূরে। আজ এই চরম পাওয়ার মধুর পরি-তৃপ্তির মধ্যেও শুধু একটি বেদনা তার মনকে করে তুলছিল ক্ষতবিক্ষত। কি করে সে তার মাকে বলবে যে সেও তাঁকে ছেড়ে চলে যাচ্ছে বহুদূরে ?

রাত গভীর হয়ে আসে। জানলা থেকে সরে যায় চাঁদ। মা আর মেয়ে কিন্তু জেগে আছে এখনও। মা মাঝে মাঝে অদ্ভুত সব প্রশ্ন করছেন।

"থু তুই এখনও আগের মতো আস্তে আস্তে খাস ?"

"কি ?"

"আমার তো মনে হয় সৈনিকদের যথাসম্ভব তাড়াতাড়ি খাবার খেতে হয়। তুই যখন ওদের দলে গেলি তখন তুই ভালো করে 'চপ্-স্টিক্'গুলো ধরতে পারতিস্ না বলে ওরা তোকে বকে নি ?"

থু হেসে গড়িয়ে পড়ে। "মা, বল 'সমালোচনা'—সেনাদলে কেউ কাউকে 'বকে' না।"

"বেশ বাবা বেশ—ওই হলো। খাবার টেবিলে যদি লজ্জায় না পড়তে চাস্ তো নিয়মমাফিক চলিস্।"

কিছুক্ষণের নীরবতা। তারপর আবার—"থু,—"

"কি মা ?"

"তোর দাদার কোন খবর জানিস ? কে জানে ওর মাথার যন্ত্রণাটা কমলো কিনা ? এখানে থাকতে তো আমি ওষুধ তৈরি করার জন্যে অনেক গাছ-গাছড়া জোগাড় করে আনতুম ওকে একটু আরাম দেবার জন্যে। আমি এখন আমার বাগানেও সেইসব গাছপালা লাগিয়েছি। যাবার সময় তুই কী সংগে করে নিয়ে যাবি কতগুলো ?—যদি তোর দাদার সংগে দেখা হয় তো ওকে দিতে পারবি ?"

থু-এর মনে হলো ওর বুকের ওপর থেকে একটা বোঝা নেমে গেল। দাদার কী হয়েছিল মা তাহলে জানেন না! মাকে খবর দিয়ে তাঁর দুশ্চিন্তা না বাড়ানোর জন্যে মনে মনে ধন্যবাদ জানালো সে থাঙ্-কে। তার মনে পড়ল দাদার সংগে তার শেষ সাক্ষাতের কথা—যে কথাগুলো জীবনে সে কোনদিনই ভুলতে পারবে না।

সে তার মাকে বললো—"অস্ত্রোপচারের ঘরে দেখাশুনো করার ঠিকমতো সব লোকজন আছে কিনা দেখবার জন্যে আমি যখন একদিন খুব তাড়াতাড়ি করে যাচ্ছিলুম—তখন দেখি তারা ওখানে গোলাতে আহত একজন সৈনিককে সবেমাত্র আনল। অস্ত্রোপচার করে গুলিটি বার করে দেওয়া সত্ত্বেও তিনি তখনও অজ্ঞান হয়ে আছেন। তাঁকে শোয়ানো ছিল দেওয়ালের দিকে মুখ

ফিরিয়ে। অন্য একজন সৈনিক তারই বিছানার ধারে বসে অত্যন্ত আকুল কণ্ঠে বলছেন—"দয়া করে এঁকে বাঁচিয়ে দিন—ইনি আমাদের চীফ্। যদি কোন অসুবিধে দেখা দেয় তো সঙ্গে সঙ্গে আমাদের খবর দেবেন—কেমন ?—এই আমাদের ঠিকানা।"

"তারপর সৈনিকটি হয়তো ভাবল তাঁর চীফের সম্বন্ধে আমাদের আরো একটু বিশদ বিবরণ দেওয়া উচিত। তাই সে বললো—"আমরা ছিলাম খুব কঠোর সংগ্রামে রত। আমরা একটি সেতুকে রক্ষা করছিলাম মার্কিনীদের বিমান আক্রমণের আঘাত থেকে। তিনদিন ধরে ওরা সেতুটাকে ভাঙতে আর আমাদের নিশ্চিহ্ন করবার জন্যে ক্রমাগত আক্রমণ চালাচ্ছিল। তারা মাটির কাছাকাছি নেমে এসে বিমান থেকে গোলা চালাচ্ছিল। গোলার বৃষ্টি হচ্ছিল আমাদের ওপর। আমাদের "কামোফ্লাজের" পাতাগুলি খুব তাড়াতাড়ি শুকিয়ে গিয়ে একের পর এক খসে পড়ছিল, প্রতিরোধ দেওয়ালগুলোও ঝাঁঝরা হয়ে যাচ্ছিল। আমাদের মাথার ওপর দিয়ে যে বিমানগুলো উড়ে যাচ্ছিল, আমরা সেগুলোর ওপর গুলি চালাই নি—আমরা শুধু আক্রমণ করছিলাম সেই বিমানগুলোকে যারা ওই সেতুতে বোমা ফেলছিল। আমরা ধীরভাবে অপেক্ষা করতুম কখন ওই বিমানগুলো আমাদের সামনে আসবে, ওদের ডানাগুলো দেখা যাবে—! তখনই আমাদের চীফ্ আদেশ দিতেন—"গুলি চালাও, তাড়াতাড়ি নামিয়ে আনো সিগন্যাল ফ্ল্যাগটা।" প্রত্যেকবার ধোঁয়ার কুণ্ডলীটা সরে যাওয়া মাত্র আমরা তাঁর দাঁড়িয়ে থাকা চেহারার ছায়া দেখতে পেতুম। আমরা সর্বদা তাঁর কাজের প্রশংসা করতাম সেই সঙ্গে তাঁর জীবনের আশঙ্কাও বিচলিত করত আমাদের। আমরা জানতামও না যে তাঁর আশ্রয়টা ভেঙে গিয়েছিল। খুব কাছেই একটা বিস্ফোরণের আওয়াজ হলো—আমি হঠাৎ দেখলাম তিনি যন্ত্রণায় শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। কোনো সাহায্যকারীকে ডাকবারও অবসর পেলাম না আমি। শুধু শুনতে পেলাম চীফের গম্ভীর ও মৃদু কণ্ঠস্বরে আদেশ করছে—"গুলি চালাও"—। আমার মনে হয় আমি ভালো করে দেখতেও পাই নি। "সূর্য অস্ত গেল। শত্রুপক্ষ তখনই তাদের দুটি বিমান খুইয়েছে। আমি ভাবলাম ওরা বোধ হয় এবার আক্রমণ থামাল। হঠাৎ তৃতীয় বিমানটি দেখা গেল। আমি ফিরে দাঁড়ালাম কিন্তু তখন আর আমাদের চীফ্‌কে দেখতে পেলাম না। আমি ছুটে তাঁর আশ্রয়ের দিকে গেলাম। তিনি তাঁর নির্দিষ্ট জায়গাটিতেই আছেন—কিন্তু নিস্পন্দ হয়ে!"

মা নিঃশব্দে শুনছেন থু-এর কথা। থু থামবার পর মা রুদ্ধস্বরে প্রশ্ন করলেন—"সে বেঁচে আছে ?"

"হ্যাঁ মা তিনি ভালো হয়ে গেছেন আর এখন অনেক দূরে যুদ্ধও করছেন ?"

"হ্যাঁ তাই-ই হওয়া উচিত।"...আর একটিও কথা না বলে মা উঠে আবার পান সাজতে লাগলেন।

থু জানলা থেকে চোখ সরাতে পারছিল না। আকাশ ছেয়ে গেছে গাঢ় অন্ধকারে। আঙুর ফুলের মধুর সৌরভে ঘর ভরিয়ে তুলে বাতাস বইছে আরো জোরে। সে মাকে সব থেকে বড় কথাটা লুকিয়েছে। ওই আহত সৈনিক তারই দাদা। হাসপাতালে যতদিন ছিল সে প্রতিবার ব্যাণ্ডেজ বদলাবার সময় বা আবার অস্ত্রোপচারের সময়ে কেউ তার মুখে শোনে নি এতটুকু কাতরানি। থু-ই শুধু লক্ষ্য করেছে দাদার সদা-উজ্জ্বল চোখ দুটিতে অসহ্য বেদনার ছায়া। দাদা তখন তাকে কাছে ডেকে শুধু তাদের মার কথা বলতে বলত। পুরানো সুখস্মৃতিতে মুছে যেত তার সব বেদনা। মুখে ফুটত হাসি।—একদিন থু যখন দাদার পাশ থেকে উঠে আসছিল, দাদা তখন আস্তে করে তাকে ডেকেছিল। থু বললো—"তুমি এখন ঘুমোও"। দাদা আবার ডেকে বলছিল—"থু, শোন মাকে কোনদিন বল না যে আমি আহত হয়েছি।—মাকে আর কষ্ট দিও না, বুঝলে। আমি সেরে উঠে মার সংগে দেখা করতে যাব।"

মা সেখানেই বসে পান খেতে লাগলেন। বৃষ্টি শুরু হলো। মিষ্টি-মধুর সুরের আবেশভরা বৃষ্টি। ছোট ছোট জলকণাগুলো মাটি স্পর্শ করতেই ভেসে উঠল নাচের ঝঙ্কার। বৃষ্টিকণায় চারিদিক ভরিয়ে তারা টুপটাপ করে ঝরে পড়ল গাছের পাতায়। অদৃশ্য হলো শীতের শুষ্কতা আর রুক্ষতা। নববর্ষার পুনরুজ্জীবিত প্রকৃতি অচিরেই অঙ্কুরিত করবে নব মুকুল। আবার ফুলে আর ফলে ভরে উঠবে গাছের শাখাগুলি।

ঘুম ভেঙে উঠে থু দেখল সে একা। মাকে খুঁজতে সে রান্নাঘরে উঁকি দিল। উনুনের ওপর একটা বড় পাত্রে জল ফুটছে। ঘরের চারিদিকেও চোখ বুলালো সে। বিছানায় পায়ের দিকে এক বোঝা রঙ্‌জ্বলা ইউনিফর্ম স্বযত্নে পাট করে রাখা আছে। সে অবাক হয়ে ভাবতে লাগল ওগুলো কার?

উনুনের আগুনটাকে যখন থু উসকে দিচ্ছিল ঠিক তখনই হাতভর্তি "ম্যানিওক" নিয়ে ফিরে এলেন মা। তাঁর সারা জামাটা ভেজা আর কাদার ছাপে ভর্তি হয়ে গেছে।

"মা, তুমি কি আজ সারা গাঁয়ের লোকের জন্যে 'ম্যানিওক' রাঁধবে?" কোন উত্তর না দিয়ে মা 'ম্যানিওক'-গুলো নামিয়ে রাখলেন। উনুন খোঁচাবার শিক দিয়ে উনুনের কয়লাগুলো সমান করে সাজিয়ে দিয়ে তিনি বললেন—"তোমার খুড়তুতো ভাই টুওঙ সেনাদলে যোগ দিতে যাচ্ছে। এবার বোধহয় ওদের আরো অনেক দূরে যেতে হবে মনে হচ্ছে। তুমি একটু পরে গিয়ে তোমার হাই কাকী-মাকে আমাদের সংগে আজকে খাবার কথা বলে এস। টুওঙ্‌-কে রাতের

খাবারের আগেই আসতে বল—কেমন ? ও চলে গেলে তোমার কাকীমা বেচারী বড় একা হয়ে যাবে। আমি ওকে আমাদের সঙ্গেই রোজ খেতে বলব।"—তিনি একটু থেমে তাকের ওপর থেকে একটা ঝুড়ি নিয়ে "ম্যানিওক"গুলো আগুনের থেকে তুলে তাতে রাখতে লাগলেন। খুব সুন্দর গন্ধ বেরুচ্ছিল ওগুলো থেকে। তিনি থু-কে একটা ছোট্ট টুকরো দিয়ে বললেন—"একটা মুখে পুরে দাও।" এটা আমার নিজের হাতে চাষ করা ছোট্ট একটুকরো জমিতে ফলেছে। এর থেকে খানিকটা আমি সেনাদের জন্যেও পাঠাব—ওদের ওই মেরামতকরা জামাকাপড়গুলোর সঙ্গে।"

মা ক্ষণিক নীরবতার পর গম্ভীরস্বরে বললেন—"আজকের দিনে সবাই সকলের সাধ্যমতো কাজ করে চলেছে। তোমার বাবা আর আমি আমাদের যতটুকু সাধ্য সেইরকম কাজ করে যাচ্ছি। তুমি আর তোমার দাদাও তাই করতে চেষ্টা কর।—রাতে মাঝে মাঝে তোমার আর তোমার দাদার জন্যে চিন্তায় চোখের পাতা এক করতে পারি না।—যতোদিন এই অভিশপ্ত মার্কিনীরা এখানে থাকবে, ততদিন সবাইকেই কষ্ট পেতে হবে। দক্ষিণের সহ-যোদ্ধারা আমাদের দশগুণ কষ্ট সহ্য করছে। তোমরা দুই ভাইবোনেই ভাল হতে চেষ্টা কর। কাল রাতে যে আহত সৈনিকটির কথা বলছিলে—তার আদর্শ অনুসরণ কর। আমার জন্যে চিন্তা কোরো না।"

বিস্ময়ে থু-এর মুখের "ম্যানিওক"-এর টুকরো পড়ে গেল মাটিতে। মাকে সে জড়িয়ে ধরল দুহাতে। তার কাছে সব থেকে কঠিন যে সমস্যাটা ছিল—কত সহজেই হয়ে গেল তার সমাধান! অনুশোচনা শুধু এইটুকুই যে সে তার মাকে আজও চিনতে পারে নি!

কয়েকদিনের মধ্যেই থু চলে যাবে। মনে হয় সে যাত্রা যেন মনে মনে শুরু হয়েই গেছে। মায়ের কথাগুলোই যেন এই যাত্রার ভূমিকা!

চলে যায় যারা তারা সঞ্চয় করে নিয়ে যায় অতীত জীবনের মধুর স্মৃতিকণা। কারুর মনে জেগে থাকে কোনো প্রিয়জনের স্মৃতি, কারুর বা মায়ের স্মৃতি, পাহাড়ের চূড়োয় নদীর ঠাণ্ডা হাওয়ায় প্রাণজুড়ানো গ্রাম্য স্কুলের ছবি! খোড়োঘরের জলার ধারের ছোট্ট জানলাটা যেটার ভেতর দিয়ে মধুর হাওয়ায় ভেসে আসে মিষ্টি আলুর গন্ধ সেটার কথাও! হৃদয়-মণিকোঠায় এই ছোট ছোট স্মৃতির টুকরোগুলোই হয়ে ওঠে এক বিরাট শক্তির উৎস—লড়াইয়ের মস্ত বড় হাতিয়ার! যুদ্ধক্ষেত্রে যারা বীরের মতো লড়তে লড়তে প্রাণ বিসর্জন দিচ্ছে—লোকের মুখে শুধু শোনা যায় তাদেরই আত্মোৎসর্গের কথা! কিন্তু তার মা'র যে আত্মত্যাগ, যে সহনশীলতা, যে অতন্দ্র প্রতীক্ষা—সে কথা জানবে ক'জন?

আবার শুরু হলো বৃষ্টি। প্রায়ই বসন্তের এই বৃষ্টি ফোঁটায় ফোঁটায় ঝরে পড়ে মাটির বুকে। এই অজস্র ধারার উদ্দাম বেগ মনে করিয়ে দেয় সৈনিকের পদযাত্রা।

সুপুরি ফুলের সৌরভ

চু জ্যান্‌

সভা থেকে ফিরতে বেশ রাত হয়ে গেল নখিয়ার। সারা গ্রামগুলি জুড়ে তখন নৈঃশব্দের রাজত্ব চলেছে। চাঁদের আলোয় পরিস্নাত চারিদিক। একটানা ঘর্‌ ঘর্‌ শব্দ শোনা যাচ্ছে খালের ধারের পাম্পটা থেকে। সদ্যকাটা নালাগুলো দিয়ে জলটা গড়িয়ে যাচ্ছে ধান ক্ষেতে। রাতজাগা বকের ডাকগুলো হারিয়ে যাচ্ছে রাতের গভীরেই। পায়ে-চলার পথের ওপর দিয়ে বাঁশঝাড়ের ডালগুলো কাঁপিয়ে বাতাস নিজের পথ কেটে বয়ে যাচ্ছে। সুপুরি ফুলের মৃদু সৌরভ ছড়াচ্ছে বাতাসে। সেই সুবাস রাতের শিশিরে মিশে গাঢ় হয়ে বয়ে চলেছে ঘন জঙ্গল আর খড়ে-ছাওয়া চালাগুলোর মধ্যে দিয়ে। সবে মাত্র সার দেওয়া জমির গন্ধকে নির্মল করে এই সুবাস ভরিয়ে তুলেছে চারিদিক।

মেয়েটি ধীর পায়ে অতিক্রম করল তার বাড়ির আঙিনা। সবাই ঘুমিয়ে পড়েছে। তার মা শুয়ে আছেন ঝোলানো বিছানায়। মায়ের একটি পা ঠেকে আছে মাটিতে। হাতে ধরা পাখাটি ঢেকে দিয়েছে ঘুমন্ত মুখখানি। পালিশ করা 'লিম্‌' কাঠের তৈরি ক্যাম্পখাটে ঠাসাঠাসি করে ঘুমিয়ে আছে তিনটি শিশু। সযত্নে গোছানো ঘরের প্রতিটি জিনিস। চারটি টুল নিখুঁত ভাবে সাজানো টেবিলের ধারে। ঝকঝকে পাত্রে গোছানো চায়ের সরঞ্জাম। নখিয়ার রাতের খাবার এখনও গরম রয়েছে ঢাকা দেওয়া পাত্রে। তার পরিচ্ছন্ন শয্যায় প্রতিফলিত হচ্ছে ঘরের কোণে কমিয়ে রাখা বাতির ছোট্ট বিন্দুটি। বহুদিন ধরে এবাড়িতে সবকিছুই এমনি নিখুঁতভাবে চলে আসছে। এতো রাতেও তার বৌদি ফাক্‌ জেগে আছে। এখনও সে তার কাজ সেরে চলেছে রান্নাঘরে কিংবা শুয়োরের খোঁয়াড়ে।

নখিয়া বাতিটা বাড়িয়ে নিয়ে তাড়াতাড়ি খাওয়া শেষ করে পাত্রগুলো সরিয়ে রেখে বিছানায় হাত পা ছড়িয়ে শুয়ে পড়ল। সারাদিনের হাড়ভাঙা খাটুনির পর হাত পা ছড়িয়ে শুয়ে তার ভীষণ ভালো লাগছিল। তার প্রায় ঘুম এসে যাচ্ছিল একটা চাপা একঘেয়ে শব্দে। কিন্তু সে উঠে পড়ল তখুনি। মনের গহনে জমে থাকা কয়েকটা প্রশ্ন তাকে ঘুমোতে দিল না। তার উৎপাদন শাখার লোকেদের কি করে ঠিকমতো কাজে লাগাবে সে? এই দুশ্চিন্তাই কেড়ে নিয়েছে তার চোখের ঘুম—আগুন ছুটছে তার মাথায়।

প্রায় দু'মাস হতে চললো তার কাকার পরিচালিত বাহিনীর উপনেতা করা হয়েছে নাঘিয়াকে। বৃদ্ধ অসুস্থ কাকাকে হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। সেই জন্যে উনিশ বছরের মেয়ে নাঘিয়ার ওপরেই একানব্বই জন কর্মীর আর বাহান্ন "সাও" ধান জমির ফসলের পূর্ণ দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। যৌথখামারের সবচেয়ে দুর্বলতম শাখা তার বাহিনী। গাঁয়ের জোয়ান ছেলেরা সব চলে গেছে। ফ্রণ্টে গেছে কেউ, আবার কেউ কেউ গেছে সরকারী কাজের জায়গায়। নাঘিয়ার বয়সী মেয়েরাও অনেকেই ঐ ধরনের কাজে গ্রাম ছেড়ে চলে গেছে। কিছু মাঝবয়সীরা গ্রামে পড়ে আছে। তাদের মধ্যে জনস্বার্থে কাজ করতে ইচ্ছুক খুব কম লোকই। তারা চায় শুধু নিজস্ব জমিটুকু চাষ করতে।

গত শরতের অতিবর্ষণে গাছের গোড়াগুলো পচে গিয়ে তাদের শষ্যের প্রচুর ক্ষতি হয়েছে, কিন্তু তা নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছে না কেউই বিশেষ। এখনো অবধি সব ধান কাটাই হয় নি। আরো ভালো ফসল তুলতে হলে আগামী মরশুমে এখনি উচিত তাদের সব ধান তুলে নিয়ে জমিতে নতুন করে চাষ দেওয়া। এটা না করতে পারলে উৎপাদন বাড়ানো যাবে না। বাহিনীর হাতে বারটি মোষ আছে কিন্তু দক্ষ চাষী আছে মাত্র পাঁচ ছ'জন। তারা সত্যিই সুদক্ষ চাষী, কিন্তু কিছুদিন ধরে তারাই ভারি গোলমাল করছে। তাদের মেয়ের বয়সী নাঘিয়ার উপদেশ শুনে কাজ করতে নারাজ তারা। অনেক দেরিতে কাজে আসে আর কাজ শেষ করার জন্যে যে নির্দিষ্ট সময় দেওয়া আছে তার অনেক আগেই বাড়ি ফিরে যায় তারা। ধানক্ষেতে কাদা, মোষগুলো কুঁড়ে, লাঙলগুলো খারাপ— এইসব নালিশ অনবরত শোনা যাচ্ছে তাদের মুখে। খুবই হেলাফেলা করে কাজ করছে তারা! রোজ নেবার বেলায় একদিনও কিন্তু ভুল হয় না কারুর। কাজের বিশেষ রীতিপদ্ধতি সম্বন্ধে কেউ যদি তাদের বলতে যায় তাহলে তারা হাজারো কথা বাড়ায় আর পরের দিন হয় মাথার ব্যথা না হয় কোমরে ব্যথার ছুতো করে বাড়িতে বসে থাকে।

এদিকে অন্যান্য বাহিনীগুলো সরকারের কাছে তাদের প্রতিশ্রুত কাজ সম্পূর্ণ করে ফেলেছে। তাদের নতুন চাষের এক-তৃতীয়াংশ কাজ তারা শেষ করেছে এর মধ্যেই। ঠিক নির্দিষ্ট দিনগুলিতেই তাদের বীজসার সব কিছুই দেওয়া হচ্ছে। শুধু এই নবমবাহিনীকে আজও জমি তৈরি না করার জন্যে নানা সমালোচনা শুনতে হচ্ছে। জমি পরিদর্শনে এসে যৌথ খামারের চেয়ারম্যান জমির এই অবস্থা দেখে বেশ চিন্তিত হয়েছেন। এদের সাহায্য করতে অন্য-বাহিনীগুলো থেকে তিনি কর্মী পাঠিয়ে দিয়েছেন। কিন্তু অন্য বাহিনী থেকে লোক ধার নিয়ে কাজ চালানোটা তো একটা সাময়িক বন্দোবস্ত! নাঘিয়া একেবারে উত্যক্ত হয়ে গেছে। গাঁয়ের সব ছেলেমেয়েদের একত্রে ডেকে সে বলেছে

যে তার একটা একান্ত ইচ্ছে যে তারা সকলেই যেন জমি কিভাবে চাষ করতে হয় সেটা শিখে নেয়। তার কমরেডরা যখন ইতস্তত করছিল নঘিয়া তখন সিদ্ধান্ত নিল যে সে নিজেই জমি চষতে শুরু করবে এবার।

আজ খুব ভোরেই সে তাদের গোয়ালে ঢুকল আগের দিন থেকে বাছাই করে রাখা মোষ আর লাঙলটি নিতে। শান্ত নিরীহ মোষটি অবাক চোখে চেয়ে থেকেছে তার দিকে। যে মেয়েটি এতোদিন ধরে আদর করে তাকে চরাতে নিয়ে গেছে, আজ কিনা সেই মেয়ে তার কাঁধে লাঙল চাপাতে চাইছে! সে তার শিং দুটি নাড়িয়ে ভারি পায়ে যাত্রা শুরু করল। চাষে জুতে দেবার আগে মোষকে পরানো দড়িতে যখন নঘিয়ার পাটা জড়িয়ে গেল তখন সে যেন উপহাসের ভঙ্গিতে চাইল তার দিকে। সারা রাস্তা থেমে থেমে মোষটা রাস্তার দুপাশের ঘাসগুলো ছিঁড়ে ছিঁড়ে খেতে লাগল। তারপর আমুদে খেলোয়াড়ের ভঙ্গিতে তাকে পরানো পুরানো দড়িটায় কতো জোর সেটা পরখ করে দেখতে চাইল। বেচারা নঘিয়া একেবারে নাস্তানাবুদ হয়ে তাকে ক্ষেতের ধারে নিয়ে পৌঁছল। তার পায়ের দড়িটা নিয়ে এইবার মুস্কিল শুরু হলো। মোষের পায়ে দড়িটা জড়িয়ে যাওয়ায় একটু বেশি ছাড় দিলেই মোষটা দৌড়ে চলে যায় অনেকটা। অতিকষ্টে সে দড়ির মাপজোখ ঠিক করে তার কাধে জোয়াল চাপাল, হাল লাগাল। মোষটা কিন্তু এবারেও নঘিয়ার দিক থেকে তার চোখ সরায় নি। কাঠের টুকরোটা তার দিকে এগিয়ে আসতে দেখে ব্যাপারটা ঠিকমতো বুঝতে না পেরেই কি সে ঘাড় আর মাথা নীচু করে দিল?

অতিকষ্টে পাঁচবারের বার সে মোষকে ঠিকমতো জোয়াল পরাতে পারল। কিন্তু নঘিয়া যখন তাকে হাঁটবার জন্যে তাড়া লাগাল, তখন একপাও নড়ল না সে। মেয়েটি যখন তাকে চাবুক লাগাল তখন সে সামনের দিকে ছুটতে শুরু করল। প্রাণপণশক্তিতে নঘিয়া তাকে পিছন দিকে টেনে রাখল। কী কষ্টকর ব্যাপার জমিতে প্রথম আল দেওয়া! বড় বড় মাটির ঢেলাগুলো আর জমির গর্তগুলোর জন্যে আলটা সোজাভাবে দেওয়া প্রায় অসম্ভব! মোষের কাঁধের জোয়ালটায় তার বেশ কষ্ট হচ্ছিল। সে নিজের খুশীমতো এঁকে বেঁকে চলতে শুরু করল, দুপাশে ঘাস নজরে পড়লেই ছিঁড়ে খেতে লাগল। আর তার সঙ্গে মাছি আর জোঁকের কামড় এড়াতে জোরে জোরে লাথি ছুঁড়তে শুরু করল। আলটা দেখতে হলো একেবারেই বিশ্রী ঠিক সাপের মতো আঁকাবাঁকা। মাঠের শেষ প্রান্তে পৌঁছে নঘিয়া পিছন ফিরে দেখে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে নিজের যন্ত্রণা কাতর হাত দুটোতে পরম গ্লানিতে থুতু ছিটালো! আবার সাহস সঞ্চয় করে সে উল্টোদিকে ঘুরল কিন্তু মোষটা নড়ল না একপাও! হাল লাঙল, নিজেই তুলে ক্লান্ত নঘিয়া তাকে চাবুক কষাল। ভীত পশু পিছু

হেঁটে একটানে তার জোয়াল ভেঙে ফেললো। ফোঁসফোঁস করে তার দড়িটা টেনে নিয়ে কাছেরই এক গিরিখাতে পালিয়ে গেল মোষটা।

নঘিয়ার প্রথম জমিচাষের প্রচেষ্টায় যবনিকা পাত হলো এইভাবেই। কপাল ঢাকা টুপির আড়ালে নিজের সব বিভ্রান্তি লুকিয়ে লাঙল কাঁধে ভারাক্রান্ত মনে ফিরে এলো নঘিয়া। পাছে চেনাশোনা কারুর সঙ্গে চোখাচোখি হয় সেই ভয়ে সে ঘুরপথে বাড়ি ফিরল। তার নিজের দোষে হাল আর লাঙলের যে ক্ষতি হয়েছিল বাড়িতে ফিরে সেটা লুকিয়ে মেরামত করতে লেগে গেল। লাঙলের ফলাগুলো আর হাল—দুটোই অক্ষত ছিল শুধু চিড় ধরেছিল নঘিয়ারই মনোবলে। তার প্রতিবেশীদের ঠাট্টা টিটকিরি আর সেই সঙ্গে তাদের অনুক্ত ধিক্কার তাকে বিঁধতে লাগল ছুরির ফলার মতো। দিনের বাকি সময়টা সে ছোটখাট কাজ করে কাটিয়ে দিল। যুবদলকে সভায় আহবান করার জন্যে সে অপেক্ষা করল সন্ধে পর্যন্ত। নানা বিতর্কের ঝড় উঠল সভাতেও। আলোচনা শেষ হলো অনেক দেরিতে কিন্তু সমস্যার সমাধান হলো না। তিন চারটি মেয়ে খালি একমত হলো যে চাষ করতে গিয়ে প্রথম দিকে তাদের যে অসুবিধেগুলো হচ্ছে সেগুলো কাটাতে হলে আরো বেশ কিছুদিন তাদের একাগ্রচিত্তে সাধনা করতে হবে। কিন্তু বাকি সাত আটজন এ ব্যাপারে খুলে না বললেও বেশ বোঝা গেল যে তাদের মনে যথেষ্ট সন্দেহ আছে এখনও। তারা ভাবছে শক্ত সমর্থ পুরুষরা চাবুক পিটিয়ে যে কাজ সমাধা করে সে কাজ কি করে সম্পন্ন করবে মেয়েরা?

তবু বাধার কাছে কি হার মানবে কেউ? এ অঞ্চলের মেয়েরা চিরদিন অভ্যস্ত শুধু তাঁতবোনায়, ধানের বীজ বোনায়, ক্ষেতের জল ছেঁচায় আর আগাছা সাফাই-এ। তবে "তিনদফা প্রস্তুতির" আর তিনদফা দায়িত্বের ভবিষ্যৎ কি? সামান্য কয়েকটা অসুবিধের জন্যে একদল যুবতী কাজ থেকে হাত গুটিয়ে নেবে? কী লজ্জা! আজ চাষের কাজ, আগামী দিনে জমির উন্নতি সাধনে নূতন কোন ব্যবস্থা নিতে সবাই হবে পিছপা?

চিন্তায় জর্জরিত নঘিয়া ঘুমোতে পারল না। সে নিঃশব্দে উঠে এসে বসে রইল দালানে। একটা আলোর শিখা দেখা গেল সামনের গলির শেষ প্রান্তে। ধান ঝেড়ে একটা বড় ঝুড়ি কাঁখে নিয়ে ফাক্ আসছিল তখনই। তার স্বামী থুয়াম্ যখন থেকে ফ্রন্টে গেছে, গভীর রাত পর্যন্ত জেগে থাকা তখন থেকেই একটা অভ্যাসে দাঁড়িয়েছে ফাক্-এর। সে রোগা আর ময়লা হয়ে গেছে অনেক। তবু তার উজ্জ্বল কালো চোখদুটি আর গালের মিষ্টি টোলগুলোর জন্যে আজও তার মুখে মাখানো আছে অপূর্ব লাবণ্য। বৌদিকে এতো রাত পর্যন্ত সংসারের কাজ করতে দেখলেই নঘিয়ার বুকটা ব্যথায় মুচড়ে ওঠে। ফাক্-কে ভারি

বোঝাটা মাটিতে নামাতে সাহায্য করল সে লাফিয়ে উঠে। সংগে সংগেই তার মনে হলো তাদের যৌথখামার থেকে ধান ঝাড়ার যে ছোট্ট কলটা আনতে দেওয়া হয়েছে সেটা এসে গেলেই এদের খাটুনী অনেক কমবে।

হাত পা ঝেড়ে ফাকু শান্তস্বরে প্রশ্ন করল—"ঠাকুরঝি তুমি এখনও জেগে? তোমাদের সভা কি অনেক দেরিতে শেষ হলো?" নঘিয়ার দুশ্চিন্তাগুলো আবার তাকে আকুল করল বৌদির প্রশ্নে! সে বৌদির হাত ধরে তার নিজের পাশে বসিয়ে সকালে জমি চষতে গিয়ে কিভাবে সে ব্যর্থ হয়েছে সেই ঘটনাটা শোনাল। তাকে একবারও বাধা না দিয়ে ফাকু সবটা শুনল। তারপর মৃদু হেসে বললো—"বড় শিংওলা মোষগুলো জোয়াল কাঁধে নিতে ভয় পায়। কেন—তা'কি তুমি জানো?"

নঘিয়া অবাক হয়ে বললো—"না তো!"

"এটা মিস্টার খোয়ানু যখন বেঁচেছিলেন তখনকার কথা। তিনি মোষটাকে মেরেছিলেন! প্রথম জমিচাষের পরেই ভয়ে আর যন্ত্রণায় মোষটা ছুটে পালিয়ে গিয়েছিল। প্রায় অর্ধেকদিন ধরে ছুটে তবে তাকে ধরা গিয়েছিল। তারপর থেকে এটা ওর স্বভাবে দাঁড়িয়ে গেছে। জোয়ালটা এগুতে দেখলেই ওর মেজাজ খারাপ হয়ে যায়। তোমার উচিত ছিল প্রথমেই ওর চোখ দুটো বেঁধে দেওয়া। কিন্তু তুমি তো এটা জানতে না তাই এতো অসুবিধে হলো।"

কত কিছু জানে তার বৌদি! আর নঘিয়া কিনা তার এই বৌদির কাছেই তার কাজের ব্যাপারটা লুকিয়ে রেখেছিল। তার বৌদি কিভাবে চাষের কাজ করত এখন সে নানা প্রশ্ন করে একটু একটু করে সব কিছুই জেনে নিল তার কাছ থেকে। কী আশ্চর্য ব্যাপার। বৌদি চাষের এমন সব জিনিস জানে যেগুলোর কথা নঘিয়া কোনদিন কানেও শোনে নি!

"তুমি কি ঐ প্রবাদটা জানো? 'আট হাতেই মোষ তুষ্ট দশহাতে সে হয় রুষ্ট'? প্রশ্ন করেন বৌদি। এর মানে মোষের দৈর্ঘ্য অনুসারে দড়িটা ঠিক মাপ মতো করে নিতে হবে। ঠিক যেন তোমার উচ্চতা অনুযায়ী তোমার কাঁধের বাঁকের বোঝাটা হওয়া উচিত। জোয়ালটা ঠিক ভাবে বাঁধতে হবে—না হলে নড়তে চড়তে গেলেই তোমার মোষের ব্যথা লাগবে। তোমার কাঁধের বাঁকটা কাঁধের হাড়ের ওপর পড়লে যে অসহ্য ব্যথা লাগে মোষেরও ঠিক ওই রকম ব্যথা লাগে। যে জন্তুগুলো খুব দস্যি হয় তারা সব কিছু ফেলে পালাতে চায়। কিন্তু যারা এমনিতে শান্ত তারা যখন দামাল হয়ে ওঠে সেটা আমাদের দোষেই। ওদের ঠিক মতো চালাতে হয় কি করে সেটা আমাদের জানা দরকার—তাই না?"

নঘিয়া চোখ গোলগোল করে বৌদির কথাগুলো গিলতে থাকে। ফাকু যত্ন নিয়েছে অনেক জন্তুজানোয়ারের, চাষ করতেও জানে সে, আর মোষদের

নাড়ীনক্ষত্র তার নখদর্পণে। দুর্ভাগ্যক্রমে, সে যখন গেরিলাবাহিনীতে ছিল, তখন একটি বুলেটের আঘাতে তার একটা হাত ভেঙে গিয়েছিল—তা নাহলে তার মতো কর্মী বিরল। নঘিয়াকেও চাষ করতে শিখতে হবে ভাল করে। সে তো তার বৌদির কাছে খাটো হতে চায় না।

পরের দিন খুব ভোরেই জমি চষতে বেরিয়ে পড়ে নঘিয়া। শুরুতে আলটা সাপের মতো আঁকাবাঁকা হচ্ছিল, ক্রমে ক্রমে সেটা সরল রেখার রূপ নিতে লাগল। মোষটাও অনেক শান্ত হলো। যুবতী কর্ত্রী তাকে চিৎকার করে যা যা আদেশ দিতে লাগল সেগুলোতে সে বেশ অভ্যস্ত হয়ে উঠল। আলটা সম্পূর্ণ সোজা নাহলেও আর জমির অনেক ছোটখাট জায়গায় লাঙলটা ঠিকমতো না ঠেকলেও নঘিয়া বিকেলের মধ্যে প্রায় তিন "সাও" জমি চষে ফেলল। মোষের জোয়াল খুলে দিয়ে লাঙল কাঁধে নঘিয়া অনেক হাল্কা মনে ফিরে চললো। ক্লান্তিতে কাঁধ আর হাত দুটো যেন ভেঙে পড়ছিল। গ্রামে পেঁছে সে কোন একজনকে বলতে শুনল "আহা, চাষ করাটা যেন ঠিক কেক্ খাওয়ার মতো—তাই না? আর কয়েকটা দিন যেতে দাও, তারপর বোলো এর স্বাদটা কেমন।"

গলার স্বরটা চিনতে পারল সে। এটা বলছে একজন অভিজ্ঞ চাষী, নাম তার হিয়েঙ। চাষীটি তাকে ঠাট্টা করছে এটা সে বেশ বুঝতে পারল কিন্তু তবুও না শোনার ভান করে চলে গেল নঘিয়া। দাম্ভিক হিয়েঙের মতো লোক যখন বুঝতে পারছে যে এবার তাদের কদর কমবে তখন সে তো অন্যদের কাজ ভণ্ডুল করার চেষ্টা করবেই।

টিপ্পনী কাটার বুঝি এখানেই শেষ ভাবল নঘিয়া। আসলে কিন্তু তা হলো না। পরের দিন সকালে তার চাষীর দলটি নিয়ে সে যখন গোয়ালে ঢুকতে যাবে তখন দেখল খড়ের গাদার পাশে পাঁচ-ছ'জন লোক তার সংগে ঝগড়া বাঁধাবার জন্যে অপেক্ষা করছে। ঝগড়া শুরু করল হিয়েঙের স্ত্রী। সে বললো, "আমিও যৌথ খামারের একজন সদস্য—তাই এর ভালমন্দ নিয়ে আমারও কিছু মাথাব্যথা আছে। আমরা এইসব অর্বাচীন মেয়েদের জিম্মায় মোষগুলোকে ছেড়ে দিতে পারি না। এদের পালতে আমাদের অনেক কষ্ট করতে হয়েছে। তোমরা চাষে হাত পাকাবার জন্যে এদের ব্যবহার করে যদি এদের গলায় কোন চোট্ টোট্ খাওয়াও তাহলে ভবিষ্যতে এদের দিয়ে আর ভালভাবে চাষই করানো যাবে না। মোষগুলো ছাড়া আমরা তো আর খালি হাত দিয়ে জমি চষতে পারব না।"

তার স্বামী যে আগের দিন নঘিয়াকে টিট্কিরি করছিল সেও বললো, "আর লাঙল! একবার খারাপভাবে ঘোরালেই তা ভেঙে যাবে। লাঙল না থাকলে মোষগুলোর কোন কাজ থাকবে না আর তাহলেই পরের বারের চাষের দফারফা! একমাত্র রাস্তা আমাদের না খেয়ে বেঁচে থাকা!"

এদের সঙ্গে বাকি ক'জনও তাদের মন্তব্যগুলো শুনিয়ে দিল। ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে দলের মেয়েগুলো রেগে উঠল। তারা বললো "এতো শুধু গাফিলতির জন্যে আমরা নিজের হাতে চাষ শিখতে চেষ্টা করছি, কিন্তু ব্যাপারটা যদি তোমরা এইভাবে নাও তো আমরা এটা ছেড়ে দিচ্ছি। তাহলে এ ব্যাপারে তোমাদের আর দুশ্চিন্তা করতে হবে না।"

আলোচনাটা ক্রমশ তিক্ত হয়ে উঠছে দেখে নাঘিয়া এ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করল। সে সামনে এগিয়ে এসে মিসেস্ হিয়েঙের চোখের দিকে চেয়ে বললো—"এখানকার দায়িত্বভার দেওয়া হয়েছে আমাকেই। আমি সম্পূর্ণ নিজের দায়িত্বেই এই সিদ্ধান্ত নিয়েছি। মিস্টার হিয়েঙ নিজের পছন্দমতো একটি মোষ আর লাঙল নিয়ে কাজে চলে যান। বাকি মোষগুলোকে নিয়ে আমরা কাজ শিখব। আর যৌথখামারের সম্পত্তির ব্যাপারে আমাদের সকলেরই সমান মাথাব্যথা। কিন্তু আপনি এমন ইঙ্গিত দিচ্ছেন যেন আমাদের মতো মেয়েরা যৌথ খামারের কেউই নয়।"

দু'জন মহিলা তখন মধ্যস্থতায় এগিয়ে এলেন। তাঁরা বললেন—"এদের ওপর সর্দারি করবার কে তোমরা? এদের কাজে বাধা দিচ্ছো কেন? ওই প্রবাদটা স্মরণ করো তুমি—'মোষের শিঙ্ ভাঙে হাসি—হাতের জোরে সপ্তদশী'।'

চুপ করে গেলেন মিসেস্ হিয়েঙ। তাঁর স্বামীও বেশ ভাল করে বুঝতে পারলেন যে কথায় তাঁকে হার মানতেই হবে এই অকুণ্ঠ যুবতীর কাছে! তাই অসন্তুষ্ট মনে মাথা নেড়ে গোয়ালের পথে ফিরলেন তিনি। এমন ভাবখানা দেখালেন যেন এ ব্যাপারে সম্পূর্ণ হাত ঝেড়ে ফেললেন, বিড়বিড় করে বলতে লাগলেন, "ঠিক আছে, সব দায়িত্ব যখন তুমিই নিচ্ছো তখন আর কী! ঠিক আছে!"

জটলার লোকরা অপসৃত হলো বিক্ষুব্ধ স্তব্ধতায়। দলের মেয়েদের দিকে ফিরে চেয়ে অবাক হল নাঘিয়া। প্রায় সবাই চলে গেছে! আছে শুধু ম্যান্ আর থাই। যাক কি আর করা যাবে!

নাঘিয়া তাদের নিয়েই মোষগুলো আনতে চলে গেল। মাঠে একসঙ্গে কাজ করতে করতে একে অপরকে সাহায্য করে তারা বেশ কিছুটা উন্নতি করে ফেললো তাদের কাজের। কিন্তু তাদের চোখ আর হাত তো দক্ষ চাষীর মতো নয়। তাই খুব সাবধানে তারা একে অপরকে নানা প্রশ্ন করে করে কাজ করছিল। সারাক্ষণ তারা জর্জরিত হচ্ছিল নানা সমস্যায়।

দুপুর নাগাদ ফাক্ তাদের খাবার নিয়ে এল। বটগাছের তলায় বসে মেয়ে ক'টি গোগ্রাসে তাদের খাবার খেতে লাগল। সেদিকে ক্ষণকাল তাকিয়ে ফাক্

দেখলো ওদের মাথা থেকে পা পর্যন্ত কাদায় মাখামাখি হয়ে গেছে। অবশেষে সে বললো—"ভালো, তা' তোমরা মাত্র এই ক'জন কেন? ছেলেমানুষ মায়েদেরও তোমাদের সংগে কাজে হাত লাগাতে বল না তোমরা!"

নঘিয়া প্রথমে ভাবল তার বৌদি বুঝি ঠাট্টা করছে। বৌদি কিন্তু একেবারে ঠাট্টা করে নি। সে বেশ চিন্তা করেই বলছে কথাগুলো। বৌদি বললো—"অল্প-বয়সী মায়েদের তো খাটাখাটুনি করাই উচিত তাহলে তারা কেন করবে না এই ধরনের কাজ? তোমাদেরও একদিন বিয়ে হয়ে যাবে তোমরাও মা হবে একদিন। তখন কি তোমরা সব কাজকর্ম ছেড়ে দেবে? কাজটা বেশ কঠিন সেটা ঠিক কিন্তু আমি তো ভেবে পাচ্ছি না শুধু তোমরা ক'জনেই এটা নিয়ে মাথা খুঁড়ে মরবে কেন? সব সমস্যারই আছে সমাধান।"

নঘিয়া বৌদির উপদেশ শুনল। সেদিন বিকেলে সে চাষের কাজ বন্ধ রেখে লোক জোগাড় করতে বেরুল। ফিরল নতুন চারজনকে সংগে নিয়ে—তারা সবাই যুবতী মা। তার এখন চাষের একটি ছোটখাট দল তৈরি হলো যদিও তারা কাজের থেকে গল্পই করত বেশি।

কিছুদিন পরেই এটা তাদের কাছে বেশ পরিষ্কার হয়ে গেল যে যারা সবচেয়ে কাজের মেয়ে তাদের পক্ষেও দিনে তিন "সাও"-এর বেশি জমি চাষ করা অসম্ভব। মাটির ঢেলাগুলো বড্ড অসমান, বাড়তি খড় খাওয়ালেও বেশ ক্লান্ত হয়ে পড়ে মোষগুলো। রোজ রাত্তিরে মেয়েরা মোষদের ঘাড়গুলো রগড়ে দেয় নুনজলে। নঘিয়া চাষকরা জমিগুলো আগে ভাল করে দেখতে বেরুল। তারপর মিস্টার হিয়েঙ আর অন্যসব সুদক্ষ চাষীদের একটি বিশেষ সভায় ডেকে পাঠাল। নঘিয়া তাদের বসিয়ে একটি ভাষণ দিল। যেহেতু একই চাষীদের দলটি শুধু মেয়েদের নিয়ে গড়া হয়েছে তাই সুদক্ষ পুরুষ চাষীরা বেশ নিরাসক্ত মুখে তাদের নিজেদের কাজগুলো করে যায়, এদের দলের সংগে একটিও কথা বলে না।

"আপনারা আমাদের গুরুজন, আমাদের দলের যে চাষের প্রচেষ্টা এটা শুধু আপনাদের কাজেই সাহায্য করার জন্যে। পাকা বাঁশ থেকেই জন্ম নেয় নতুন বাঁশের কোঁড়া। কিন্তু সেই ছোট বাঁশের কোঁড়াগুলোকে রক্ষা করে কারা? —বড় বাঁশেরাই!—তাই আমি বলি কি যে এখন থেকে আপনারা আমাদের দলের দু'জন করে মেয়েকে আপনাদের সংগে নিন। আমাদের কাজের গলদগুলো কোথায় সেটা বোঝাতে পারবেন আপনারাই। আপনারা আমাদের কিছু না শেখালে অবশ্য আমরা কোনরকমে কাজগুলো শিখে নিতে পারব কিন্তু তাতে অনেক সময় নষ্ট হবে। কারণ সব অজ্ঞতাগুলোকেই কাটিয়ে উঠতে হবে আমাদের অনেক ঠেকে ঠেকে তাই না?"

জনতার মধ্যে কিছুটা ঔৎসুক্য দেখা গেল। খানিকটা লোক দেখানো ইতস্ততার পর তারা রায় দিল যে তারা চেষ্টা করে দেখবে। তখন অভিজ্ঞ চাষীদের অনেক স্তুতিবাদ শোনানো হলো, এরই সংগে তাদের রোজও বাড়িয়ে দেওয়া হলো। ক্ষেতের কাজের ফাঁকে ফাঁকে মেয়েরা তাদের চা, পান সব এনে দিত, তাদের যন্ত্রপাতিও পরিষ্কার করে দিত। কাজের পর মেয়েরা এদের কাছ থেকে শিক্ষা নিতে শুরু করল। যারা বেশ ভাল করে শিখতে পারত তাদের প্রশংসাও জুটতো সংগে সংগেই। ক্রমে দেখা গেল মেয়েরা চাষের সবরকম কাজই করতে পারছে। চাষ করার সময় মোষগুলোর চালনা করতে মুখ দিয়ে যে সব 'হ্যাট হ্যাট্' শব্দগুলোও করতে হয় সেগুলোও বেশ রপ্ত করে ফেললো মেয়েরা। তাদের চষা আলগুলি অনেক ভাল সোজা হলো আগের থেকে। নঘিয়া একদিন চার 'সাও' জমি চষে ফেললো। মেয়েরা ছেলেদের থেকে কিছুটা কম কাজ করলেও উৎপাদকবাহিনী দলের কাজের প্রশংসা করে সকলেরই দৈনিক রোজ ১৫ পয়েন্ট বাড়িয়ে দিল।

এই সিদ্ধান্তে কিন্তু দলের ভেতর প্রচণ্ড অসন্তোষ দেখা দিল। অনেকে বললো দৈনিক রোজের ব্যাপারে কেন এই সমান ব্যবস্থা করা হলো? তখন যৌথ-খামারের লোকেরা এ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করলেন, তাঁরা এটা কমিটির ও পার্টির গোচরে আনলেন। পার্টি সেক্রেটারী একদিন সরেজমিন তদন্ত করে রায় দিলেন নঘিয়া ঠিক সিদ্ধান্তই নিয়েছিলেন। নঘিয়ার বাস্তববুদ্ধি সম্পন্ন বলিষ্ঠ সিদ্ধান্তের জন্য তিনি তাকেই উৎপাদকবাহিনীর নেতা নির্বাচন করলেন তার অসুস্থ অক্ষম কাকার বদলে।

এই পদোন্নতিতে কিন্তু আনন্দের থেকে দুশ্চিন্তা বাড়ল নঘিয়ার। দলের মধ্যে একতা আনবে সে কেমন করে? সে তার মেয়েদের দলটির সংগে আলোচনা করল। তারা ঠিক করল এক সপ্তাহের মধ্যে তারা সেরা চাষী হয়ে উঠবে তা নাহলে তারা বাড়তি রোজ নিতে অস্বীকার করবে। দক্ষ চাষীর সমকক্ষ হবার দারুণ প্রতিযোগিতা হলো শুরু। মাত্র পাঁচদিনের মাথাতেই দক্ষ চাষীদের স্বীকার করতে হলো যে যুবতী মায়েরা চাষের কাজে তাদের সংগে একই আসনে দাঁড়িয়ে গেছে। নঘিয়াকে যারা একদিন উপহাস করেছিল আজ তার প্রশংসায় তারা পঞ্চমুখ হলো। "হ্যাঁ এই ছেলেমানুষ মেয়েটাই ঠিক জানে সমস্যার সমাধান করতে। এইভাবে এগুতে পারলে আমাদের সুসময় রুখবে কে?"

দ্বিগুণ পরিশ্রম করতে লাগল নঘিয়া। সভাগুলোতে আরো বেশি করে সময় দিতে লাগল। এরই সংগে আশপাশের যৌথ-খামারগুলো থেকে আরো বেশি ধানের আর 'আজোল্লা'র বীজ সংগ্রহের জন্যে লেখালেখি করতে লাগল। শুধু খাবার সময়টুকুই বাড়িতে তার দেখা মিলত। একদিন রাতে একা বিছানায়

শুয়ে নতুন মাদুরে গালটি চেপে কাঠির সুঘ্রাণ নিতে নিতে সে শুনল রান্নাঘরে ফাক্-এর কুলোয় করে চাল ঝাড়ার শব্দ। সে ভাবল বেচারা বৌদি! এই সামান্য কাজেই ওকে এত পরিশ্রম করতে হয়।

সে চোখ বুঁজে স্মরণ করতে চেষ্টা করল ফাক্ যখন প্রতিরোধবাহিনীতে ছিল তার তখনকার চেহারাটা। একটি ছোট ডাকহরকরা—মেঠো ইঁদুরের চেয়েও প্রাণবন্ত। প্রতিরাতে ছুটে বেড়াচ্ছে সারা শহরে, কোমরে তার একটি ঝোলা দেখে মনে হতো সেটি যেন তার দেহ থেকে অচ্ছেদ্য! সে ফিরে আসতো প্রত্যুষে ঠাণ্ডায় অসাড় দেহে! কিন্তু তখন কি উজ্জ্বল দেখাতো তার চোখ-দুটো আর গালদুটোতে ছিল কি অপূর্ব লালিমা! তাকে শত্রুর সীমানা দিয়ে ছুটতে হতো সাতবার তার মধ্যে চারবার অন্তত আহত হতো সে। একটা 'ফেমু, এমু' বুলেট ভেঙে দিয়েছে তার ডান হাতটা। তবুও সে কাজ করে গেছে সেনাদলে যুদ্ধের শেষ দিন পর্যন্ত। যখন শান্তি পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হলো তার স্বামী আবার ফিরে পেল গ্রাম প্রশাসনের চেয়ারম্যানের পদ। বৌদির তিনটি ছেলে-মেয়েই এখনও বেশ ছোট। মা বেশ বুড়ো হয়ে গেছেন। ঘরের কাজে বৌদিকে কিছুই সাহায্য করতে পারেন না। ওই যুবতী মেয়েটি শারীরিক খুব সক্ষম নয়, তবুও সারাটা দিন সে নিজেকে ডুবিয়ে দিয়েছে এই সংসারের কাজে। যৌথ খামারের দায়িত্ব ছাড়া গ্রাহস্থ্য দায়িত্বও রয়েছে তার ওপর। রান্না করা, সব্জির বাগান তদারকি করা, মুরগীগুলোর দেখাশোনা করা—আরও নানান কাজ। নঘিয়াকেও ভীষণ যত্ন করে সে—তার স্বামীর ছোট-বোনটি বলে! আদর দিয়ে সে নঘিয়ার মাথাটিও খেয়েছে। সে যত দেরিতেই বাড়ি ফিরুক তার জন্যে ভাল খাবারটি ঠিক গুছানো থাকে। নঘিয়া চায় সংসারের কাজে ওকে একটু সাহায্য করতে কিন্তু বৌদি এত দুষ্টু যে ঠিক সেই সময়েই ও পাড়ার অন্য কোন বাড়িতে গিয়ে তাদের ছোটখাট কাজে হাত লাগিয়ে দেবে। ভাবখানা এমন যেন বাড়িতে কোনই কাজ নেই। বৌদির আসল উদ্দেশ্য হলো নঘিয়াকে ভাল করে বিশ্রাম করতে দেওয়া।

তার বৌদির সঙ্গে নঘিয়া তুলনা করত ফাক্-এর প্রতিরোধবাহিনীর সহ-যোদ্ধাদের সঙ্গে। তারা সকলেই বিশিষ্ট লোক হয়ে গেছে—কেউ কেউ জেলা বা প্রদেশের দলনেতা হয়েছে আবার অন্য কেউ রাজ্যের সংগ্রহশালায় নির্দেশক হয়েছে। তারা মাঝে মাঝে ঝক্ঝকে নতুন সাইকেলে চড়ে গ্রামের লোকেদের চোখে জ্বালা ধরিয়ে এই গ্রামের ওপর দিয়েই চলে যায়। ফাক্ কিন্তু নির্বিকার, সকলের সঙ্গেই সে মধুর ব্যবহার করে। তাদের পদমর্যাদা বা সামাজিক প্রতিষ্ঠার জন্য একটুও হিংসে করে না তাদের। তার এই কঠিন পরিশ্রমে ভরা দিনগুলো নিয়েই সে খুশী। সে কাউকে উত্যক্ত করে না তার সাংসারিক অনটন

আর অন্য দুশ্চিন্তাগুলো নিয়ে। তার স্বামী স্বচ্ছন্দেই গ্রামসেনাবাহিনীতে কিম্বা সেনাদলে নির্বিঘ্নে কাজ করতে পারত। ফাক্ যদি এখানে না থাকত তাহলে নঘিয়াকেই বৃদ্ধা মায়ের দেখাশোনা করার সম্পূর্ণ দায়িত্ব নিয়ে বেশির ভাগ সময়টাই বাড়ির কাজে ব্যস্ত থাকতে হতো। যুবদলের উৎপাদক বাহিনীর আর যৌথ-খামারের সম্পূর্ণ দায়িত্ব কি সে নিতে পারত তাহলে?

কিন্তু ফাক্ শুধু তার এই ছোট সাম্রাজ্যটির কথাই ভাবে? নঘিয়া মাঝে মাঝে বিরক্ত হয় যখন সে দেখে বৌদি গাছের প্রত্যেকটি লেবু গুণে রাখছে। বেড়ার একটা ছোট ফাঁককেও তার বৌদি ডালপালা দিয়ে ঢাকছে। মুরগীগুলো পাছে প্রতিবেশীদের মুরগীর সঙ্গে মিশে যায় সেই ভয়ে বৌদি তাদের মাথায় সবুজ চিহ্ন দিচ্ছে, তখন তাকে নঘিয়ার বড্ড কৃপণস্বভাবের মেয়ে বলে মনে হয়। কিন্তু নিজের কোন কিছু খুঁজে না পেলে এই বৌদির সাহায্য নিতে তার খুব ভাল লাগে। একবার সে যখন তার কলম আর নোটবুক খুঁজে না পেয়ে মাথার চুল ছিঁড়ছিল হতাশায় ঠিক তখনই বৌদি ঘরে ঢুকে তার ড্রয়ারটা খুলে ধরল। বিস্ফারিত চোখে দেখল নঘিয়া, তার এলোমেলোভাবে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রাখা জিনিসগুলো কি যত্ন করে সুন্দরভাবে গুছিয়ে রেখেছে বৌদি। বাড়িতেও থাকে যখন নঘিয়া তখনও তার বৌদি সস্নেহে তার এলোমেলো ছড়িয়ে রাখা প্যান্ট, জামা, খানিকটা দূরে ফেলে রাখা আর্শি, মাথার কাঁটা একটি একটি করে তুলে গুছিয়ে রাখে শান্তভাবে। এসব দেখেই বৌদির ওপর নঘিয়ার মনে একটা সকুণ্ঠ শ্রদ্ধার ভাব জেগেছে। আর এই মনোভাবের জন্যেই সে বৌদির সঙ্গে খোলাখুলিভাবে সবকিছু আলোচনা করতে পারে না। আর সত্যি কথা বলতে কি মানসিক উদ্বেগ খুব না-বাড়লে এসব বিষয়ে চিন্তা করবার সময় পায় না নঘিয়া। আর মিনিট কুড়ি পরেই তার চোখের পাতাদুটি ভারী হয়ে আসবে গাঢ় ঘুমে তলিয়ে যাবে সে। পরের দিনটি কাটবে নঘিয়ার আবার সেই সংগ্রামের দিনে মেয়েদের জীবন, যে অসীম ব্যস্ততায় আবর্তিত হয়, সেই অসীম ব্যস্ততার নাগরদোলায়।

বৌদির জীবন তার কাছে একটা রহস্যই রয়ে গেল। গেরিলাবাহিনীতে কাজ করবার সময় থেকেই ফাক্ তার জীবনে গড়ে তুলেছিল একটা স্বচ্ছন্দ সাধারণতাবোধ ও অসীম কর্তব্যনিষ্ঠা। অস্ত্র হাতে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়া আর দেহ ঘিরে যোদ্ধার ক্ষতচিহ্ন বয়ে বেড়ানো তার কাছে একটি অতি সাধারণ ব্যাপার ছিল। এগুলোর জন্যে সে কোনদিন গর্বিতও হয় নি আর এগুলোকে সম্বল করে সে নিজের কোন লাভের ভাগ বাড়াতেও চায় নি। তার বর্তমানের এই ছোটখাটো সাংসারিক দায়িত্ব, বৃদ্ধা মায়ের যত্ন নেওয়া, বাচ্চাদের বড় করে তোলাটাই যেন চরম পাওয়া বলে মনে হতো। সে যে-কোন অবস্থায়ই মানিয়ে

নিতে পারত। যৌথ-খামারের কাজে নিজের খাটুনী অনুযায়ী বেশি চাল না নিয়ে সে নিজে কম নিয়ে খুশী হতো। চাষের মধ্যবর্তী সময়গুলোয় সরকার যখন অভাবী সংসারগুলোতে বাড়তি চাল দিত ফাক্ সবসময়ে নিজের ভাগটা ছেড়ে দিত। সে মনে করত যুদ্ধের সময়ে যে যার সাধ্যমতো প্রত্যেকেরই যথা-সম্ভব সাহায্য করা উচিত। বন্দুক নিয়ে ফাক্ আর কোনদিনই লড়তে পারবে না। কিন্তু পার্টি বা যৌথখামারকে নিজের সংসারের ব্যাপারে বিব্রত না করা-টাকেই সে তার যুদ্ধ প্রচেষ্টায় সাহায্য হিসেবে গণ্য করত। ছোট ননদটিকে সে হিংসে করত না একটুও। নঘিয়া সাংসারিক সমস্ত দায়দায়িত্ব থেকে পিঞ্জরমুক্ত পাখির মতোই ছিল মুক্ত।

তাকে সংসারের দায় থেকে মুক্ত রাখাই বিশেষ প্রয়োজন বলে মনে করত তার বৌদি। ফাক্-এর ধারণা একই বংশের দুই ভাই বোন—একজন সেনাদলে আর অন্যজন এতটুকু বয়সে উৎপাদকবাহিনীর নেত্রী এটা বড়ই গৌরবজনক!

অতীতে ফাক্-কে তার ছেলেমেয়েদের জন্যে অনেক দুশ্চিন্তা করতে হয়েছে। এ দুশ্চিন্তা তাদের স্বাস্থ্যের জন্যে নয়। তারা সকলেই বেশ সুন্দর-ভাবে মোটাসোটা গোলগাল হয়ে বড় হয়েছে। মেজো আর ছোটজন তখন স্কুলে যাচ্ছে। কিন্তু চীনহ্ তার সব থেকে বড় মেয়েটির শিক্ষাদীক্ষা একেবারেই ভাল হচ্ছে না। সে ভাল করে লেখাপড়া করে না, সব কিছু ভুলে যায়। মেয়েটি যদিও বুদ্ধিমতী কিন্তু বড্ড কুঁড়ে, আর সে তার জীবনীশক্তির অপচয় করে চলেছে বাজে কাজে। তৃতীয় শ্রেণীতে যখন পড়ত তখন থেকেই কোনরকমে পাশ করাতেই সে একটা অস্বাভাবিক আনন্দ পেত। এখন তার বাবা বাড়ি না থাকায় আর মা ও পিসী নানান কাজে ব্যস্ত থাকায় এই অল্পবয়সেই সে তার স্বভাবের মাধুর্যও হারাতে বসেছে।

মেয়ের সঙ্গে যুঝতে যুঝতে পরিশ্রান্ত শিক্ষক বার তিনেক বাড়িতে এসে ফাক্-কে বলে গেছেন ওকে আরো কড়াভাবে নজরবন্দী কর। কিন্তু মিষ্টিকথা বা কড়া শাসন কোনটাতেই মেয়েকে বশে আনা যাচ্ছে না। চীনহ্ সর্বদা উত্তর করে "আমার পড়া তৈরি হয়ে গেছে। বাড়ি থেকে যা যা করে নিয়ে যেতে বলেছে সব আমার করা হয়ে গেছে।"

কিন্তু ঠিক পরদিনই স্কুলের শিক্ষক বলতেন চীনহ্ খুব খারাপ নম্বর পেয়েছে কোন পড়াই সে তৈরি করে নি।

ভীষণ সমস্যা, এর থেকে মুক্তি পেতেই হবে। ফাক্-এর মনে পড়ল স্বামী তাকে প্রায়ই অনুযোগ করতেন ছেলেমেয়েদের ওপর তার অত্যধিক কোমলতার জন্যে। এখন তিনি স্বচ্ছন্দেই বলতে পারেন অত আদরেই ছেলেমেয়েরা নষ্ট হয়ে গেল। কোন মা যদি শিক্ষকের কর্তব্যে হস্তক্ষেপ করে আর কোন পিতা

যদি ডিরেক্টরের কথা অমান্য করে তাহলে তাতে শিশুরই ক্ষতি হবে বেশি। শুধু যে তারা ভালভাবে লেখাপড়া শিখবে না শুধু তা নয়, তারা চরিত্রবলও হারিয়ে ফেলবে। নিজের সুখসুবিধের জন্যে অন্যের ওপর নির্ভরশীল হবে। খোসামোদপ্রিয় হয়ে উঠবে আর সব থেকে যেটা বড় তার নিজের আত্মসম্মান বোধ, সেটাও ফেলবে হারিয়ে। ফাক্ নিজেই বললো—না, আমার ছেলেমেয়েদের আমি কখনই এত খারাপ হয়ে যেতে দেব না। আমি তাদের নরম কাদার তালের মতো বেড়ে উঠতে দেব না। জীবনের পথে তাদের যত বাধাবিপত্তিই আসুক না কেন তারা যেন সেগুলির সঠিক মোকাবিলা করতে পারে সগর্বে নিজের বুদ্ধি আর বাহুবল দিয়ে। তাদের নিজের চোখের সামনে খারাপ হতে দেওয়া একটা মহাপাপ আর তার স্বামীর কাছে তার অত্যন্ত লজ্জাকর বলে মনে হলো।

ফাক্ মেয়ের কাছে বারদুয়েক কেঁদেছিল তাকে শোধরাবার জন্যে। মেয়ে তাতে রুখে দাঁড়াল তার কারণ সে বেশ জানত স্কুলের পড়ায় ফাঁকি ধরবার মতো বিদ্যে তার মায়ের নেই। দ্বিতীয় শ্রেণীর পরীক্ষাই পাশ করা হয় নি ফাক-এর। এছাড়া গ্রামে গ্রামে যে সব বিশেষ শিক্ষাব্যবস্থা ছিল সেগুলোও না শিখে সে খুব বড় ভুল করেছে। ফাক্ ঠিক করল চীনহু-কে পড়ায় সাহায্য করতে হলে তাকে অন্তত চিনহু-এর ক্লাস পর্যন্ত পড়ে নিতে হবে। বৃদ্ধা মা আর নঘিয়াকে লুকিয়ে সে প্রতিদিন শিক্ষকের কাছে আধঘণ্টা করে পড়ে আসত। প্রতিদিন ভোরে মোরগ ডাকার সংগে সংগেই সে উঠে পড়ত। এতে তার কষ্ট হতো খুবই কিন্তু ধীরে ধীরে সে অভ্যস্ত হয়ে এল এটাতে, আর এই নতুন শিক্ষায় সে বেশ আনন্দ পেতে লাগল। লেখাপড়ায় সে তার মেয়েকে প্রায় ধরে ফেললো, তারপর তাকে ছাড়িয়েও যাবে। খুব তাড়াতাড়িই সে গৃহশিক্ষকের বদলে বাড়িতে স্কুলের পড়া তৈরি করতে তার মেয়েকে সাহায্য করতে পারবে।

এ ব্যাপারে নঘিয়া কিছুই জানতে পারল না কারণ ফাক্ বিচক্ষণতার সংগে আলো আড়াল করে নিজের ঘরে বসে এটা করতে লাগল। আর নঘিয়াও যখন থেকে তার বাহিনীর নেতা নির্বাচিত হয়েছিল তখন থেকেই তার একটুও অবসর ছিল না অন্য কোন ব্যাপারে মাথা ঘামাবার। তাকেই ঠিক করতে হচ্ছে কোন ধরনের "আজোল্লা" রোয়া হবে? জল সংগ্রহের জন্যে কিভাবে লোকেদের কাজে লাগাবে? চাল ভাগ করা হবে কি ভাবে? মজুত চালের গুদাম তৈরি করা, কুয়ো খোঁড়ানো সব ব্যবস্থাই করতে হতো তাকে। প্রত্যেক যৌথখামারেই সমস্ত পরিকল্পনারই উপযুক্ত খসড়া উৎপাদকবাহিনীই তৈরি করে রাখত। তা-ছাড়া জমাখরচের হিসেব ঠিকমতো রাখা, সব রসিদপত্র সামলানো এসব কাজেও অনেক সময় লাগত। মাঝে মাঝে নঘিয়ার সারা সপ্তাহটাই কেটে যেত এইসব ঠিকঠাক করতে।

ছ'মাস কেটে গেল এইভাবে। ফাকু যদিও তার পড়াশুনা চালিয়ে যাচ্ছিল কিন্তু সংসারের খুঁটিনাটি কাজেও এতটুকু অবহেলা ছিল না তার। সে চতুর্থ শ্রেণীর পড়া পড়তে শুরু করেছিল আর অঙ্কে সে প্রায় পঞ্চম শ্রেণীর পাঠক্রমে পৌঁছে গিয়েছিল। তার অসীম নিষ্ঠা দেখে আশ্চর্য হয়ে শিক্ষক আরো বেশি সময় দিয়ে পড়াতে লাগলেন তাকে। ফাকু পড়াশুনায় সত্যিই খুব আনন্দ পেত। ক্ষেতে যাওয়ার সময়, ধানঝাড়ার সময়, শুয়োরের খোঁয়াড়ে কাজ করতে করতে সর্বক্ষণই যে শিক্ষক তাকে যে সব বেশ কঠিন প্রশ্নগুলো দিয়ে যেতেন সেগুলোর সঠিক সমাধানের জন্যে আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে যেত।

নবমবাহিনী, যারা কাজ শুরু করেছিল সবার শেষে তারাই আজ যৌথ-খামারের দ্বিতীয় স্থান অধিকার করল। আবার প্রথম স্থান অধিকার করল এরাই জলনিকাশের সুব্যবস্থার জন্যে। নতুন পদ্ধতিতে চাষ আর স্বেচ্ছায় সরকারকে ধান বিক্রির জন্যে এরা পেল "বিজয়ী পতাকা"। নাঘিয়াকে জেলা ও প্রদেশ স্তরে নানা সভায় যোগ দেবার জন্যে যেতে হতো। তার বাহিনীতে কী ভাবে সে কাজ করেছে সে বিষয়ে নানা প্রশ্ন করে বিভিন্ন সভাতে তাকে সম্মানিত করা হতো। নতুন অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের জন্যে তার কাছে আসতে লাগল বিশেষ প্রতিনিধিরা। নাঘিয়ার ছবি তুললো বিশেষ সংবাদদাতারা, তার গলার স্বর টেপ্‌রেকর্ডারে ধরে নিলেন তাঁরা। কারণ এটা একটি বিরল ঘটনা। একটি উনিশ বছরের মেয়ের পক্ষে এত বড় উৎপাদকবাহিনীর নেতৃত্ব দেওয়া, আদর্শ সেচের বন্দোবস্ত করা একজন নিখুঁত মিলিশিয়া মহিলা হওয়া এবং বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে উৎপাদনরত সমবায়ের শীর্ষস্থানে পৌঁছানো আর যুবদলের আদর্শ কর্মী হওয়া সচরাচর চোখে পড়ে না।

ঝিরঝিরে বৃষ্টি ঝরা এক বসন্ত রাতে নাঘিয়া বাড়ি ফিরল মধুর স্মৃতি নিয়ে। এতদিনে সে তার জীবনের নির্দিষ্ট লক্ষ্যমাত্রায় পৌঁছবার হদিস পেয়েছে। মেঘে কালো হয়ে আছে তবুও স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে নাঘিয়া পথের সবকিছু। আজ প্রতিটি বস্তুই বিচলিত করছে তাকে। সুপুরি ফুলের সৌরভ যেটা বছরের এই সময়ে সবচেয়ে দুর্লভ সেটাই তাকে ঘিরে ফেলেছে চারিদিক দিয়ে। প্রথম প্রচেষ্টার সেই ব্যথাভরা রাতটা—যে রাতে সে দালানে বসে হৃদয়ের সব ব্যথা উজাড় করে দিয়েছিল তার বৌদির কাছে সেই বিশেষ রাতটার কথাই মনে পড়ছিল তার। সে ভাবল বেচারা বৌদি আমার এত দ্রুত উন্নতির খবরে ওর কি মনে হবে ?

রাত দশটা বেজে গেছে। ফাকু নিশ্চয়ই তার ছেলে-মেয়েদের সঙ্গে ঘুমিয়ে পড়েছে। নাঘিয়া গিয়ে ওকে আস্তে করে জাগাবে তারপর বিজয়ী সম্বর্ধনা সভা থেকে ওকে যে তোয়ালেটা উপহার দিয়েছে সেটা ওর বৌদিকে

দেবে। তারপর বৌদিকে নঘিয়া আগাগোড়া সব ঘটনাগুলি শোনাবে। তারা দু'জনে কথা বলে কাটিয়ে দেবে সারাটা রাত।

বাড়ি ঢোকার মুখেই কিন্তু থমকে দাঁড়াল সে। একটা আলো জ্বলছে। ফাকু কার সংগে যেন ফিস্ ফিস্ করে কথা বলছে তার ঘরে। সম্ভবত কোনো প্রতিবেশী মহিলার সংগে। নঘিয়া পা টিপে টিপে ঘরের দরজা পর্যন্ত এগুল। তার চোখদুটো আটকে গেল এক অবিশ্বাস্য দৃশ্যে। ফাকু বসে খুব মন দিয়ে একটি স্কুলের খাতা খুঁটিয়ে পরীক্ষা করছে। আর তারই সামনে খুব নম্রভাবে চোখ দুটো নীচু করে বসে আছে চীনহু। ফাকু-এর গলা শোনা গেল—"তুমি কিছু বুঝতে পার নি খুকু! অঙ্কে তোমার খুব সাধারণ জিনিসগুলোই ভুল হয়েছে। তোমার সব উত্তরগুলোই ভুল। আমার দিকে তাকাও, এগুলো কিভাবে করতে হবে আমি দেখিয়ে দিচ্ছি তোমাকে। এই যে এটা হলো সঠিক উত্তর। এগুলো খুব সোজা অঙ্ক একটুও কঠিন নয়, না বোঝবার কোনই কারণ নেই।"

চীনহু মাথা তুলে খুব ক্ষীণকণ্ঠে বললো—"হ্যাঁ মা, তুমি ঠিকই বলেছ।"

ফাকু আর একটি খাতা তুলে নিল, আবার বললো—"তোমার রচনাও একদম ভালো হয় নি। তুমি প্রবাদটার মানেই বুঝতে পার নি! কি সব মাথা-মুণ্ডু লিখেছ? যে সব লোক কোন কাজ করে না আর লেখাপড়া করে না তাদেরই বলে—

মাথামোটা মানুষ—
তাকে চিনবে কেমন করে?
কাপড় বিনে আলনা
আর চাল বিনে থলে—
পায়ে হেঁটে চলে যদি
জানবে তাকেই বলে।

—কেন তা কি তুমি জান? কারণ তাদের খালি ভাত ঠাসবার মতন আছে একটা পেট আর সাজপোশাক চড়াবার মতো আছে খালি মানুষের আকৃতি। কোনো কাজেই আসে না তারা, তাই জনসাধারণের পরিশ্রমে অর্জিত ভাত কাপড়েও নেই তাদের কোন অধিকার। তুমি যদি ঠিকভাবে কিছু না কর তাহলে তুমিও ঠিক ঐরকম হবে। এবার বুঝতে পেরেছ?"

নিস্তব্ধ হয়ে বসে রইল মেয়ে। ফাকু ভুরু কঁচকে বললো—"আমার কাছে প্রতিজ্ঞা করবে কি তুমি যে কাল থেকে রাতদিন খেলা ছেড়ে মন দিয়ে লেখাপড়া করবে বলে?"

"আমি প্রতিজ্ঞা করছি মা কাল থেকে মন দিয়ে লেখাপড়া করব।"

"বেশ তোমার প্রতিজ্ঞায় বিশ্বাস করছি আমি। এখন বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড় সোনা মেয়ে!"

চীনহু মায়ের দিকে একপলক চেয়ে মশারীর ভেতর ঢুকে পড়ল আর নিজেকেই নিজে প্রশ্ন করতে থাকল মা কি করে এত সব শিখল? তার স্কুলের পড়া এত ভাল করে বোঝাল কি করে?

ফাকু-কে আবার বলতে শোনা গেল—"আমি লেখাপড়া কিছুই জানি না ভেবে আমাকে বাজে ধাপ্পা দেবার চেষ্টা কর না আর! তুমি দশম শ্রেণীতে পড়লেও আমি পারব তোমাকে পড়াতে।"

ছোট্ট চীনহু-এর মতো নম্বিয়া বিস্ময়ে বিহ্বল হয়ে গেল। বৌদির ইদানিং-কালের কাজগুলোর কথা মনে পড়ল তার। খুব ভোরে ওঠা, বিড় বিড় করে সারাক্ষণ হিসেব করার কথা মনে পড়ল তার। বৌদি যে খুব নরমধাতের মেয়ে সেটা সম্পূর্ণ মিথ্যে বলে প্রমাণ হয়ে গেল এক লহমায়। মেরুদণ্ডহীনতার অপবাদের বদলে ইচ্ছাশক্তির প্রচণ্ড মহিমার এক উজ্জ্বল নজির সৃষ্টি করল তার বৌদি।

দরজা ঠেলে সে ঘরের ভেতর ঢুকে ডাকল—"আমার বৌদি। ...... আমি...... ।"

নম্বিয়ার হাতদুটি ধরে ফাকু দেখল তার চোখদুটি দিয়ে মুক্তোর মতো ঝরে পড়ছে আনন্দাশ্রু। নিমেষে সব কিছুই বুঝে নিল সে। "অভিনন্দন ছোট বোনটি!...কিন্তু..."

"আমি অনেক আগেই জানতাম যে তুমি ঠিকই একদিন পাবে এই আনন্দের স্বাদ। আর তুমি নিশ্চয়ই জান যে এটাই তোমার ন্যায্য পাওনা।"

নম্বিয়া বৌদির দিকে চেয়ে বলল—"আমি কিন্তু দরজার বাইরে থেকে তোমার ব্যাখ্যা শুনছিলুম আর মনে ভাবছিলুম যে আমি আজও তোমার পায়ের নখের যোগ্যও হই নি। আমি কখনও তোমার মতো এত ভাল নই।"

ফাকু মধুর হেসে উত্তর দিল—"না না, তুমি সম্পূর্ণ দুটো বিপরীত জিনিসকে মিশিয়ে ফেলছ।"...

নম্বিয়া চুপ করে রইল। ফাকু-এর পাশে বসে তার কাঁধে মাথাটি রাখল। তোয়ালেটা আলতো করে বৌদির গালে চাপাল। বৌদির গালের উষ্ণতার স্পর্শ শিহরণ জাগাল তার হাত দুটিতে। নম্বিয়ার হঠাৎ মনে হলো তাদের মতো সাধারণ মেয়েদের জাগিয়ে তুলতে এই সব অসাধারণ নারীর সত্যিই বড় প্রয়োজন। আর এই চিন্তাই তাকে আত্মবিশ্বাসে ভরপুর করে দিল। রাত অনেক হলো। রাতের শিশিরের ছোঁয়া লেগে সুপুরিফুলের সৌরভ ছড়িয়ে পড়েছে চারিদিকে। অনেক দূরে খালের ধারের পাম্পটা ঘর্ ঘর্ করে চলেছে একটানা।

মিও বধূর কথা

মা ভ্যান খাঙ্

আরো পাঁচজন মিও দম্পতির মতন করেই ভালোবাসার আবেগমুখর মুহূর্তগুলোকে নিবিড়ভাবে অনুভব করেছে দুয়া ফঙ্ আর সুঙ্ মাই। মাত্র বছর তিনেক আগে সুঙ্ মাই ছিল অষ্টাদশী, মাথায় একরাশ চুল আর গালে পাহাড়ী গোলাপের লালিমা। দুয়া ফঙ্-এর বয়সও তখন বাইশ ছুঁতে চলেছে। তার চেহারা সবুজ সামু গাছের মতো সুন্দর আর নিটোল। তাদের দু'জনেরই বাড়ি ছিল সিন্ চাই-এর একটা ছোট গ্রামে, তাই খুব ছোট্ট বয়স থেকেই তারা চিনত দু'জনে দু'জনকে। কিশোরী সুঙ্ মাই-এর বাড়ির পাশে একটা সরু সমতল জমি ছিল সেখানে বসে প্রতিটি সন্ধ্যায় বাঁশী বাজাত আর গান গাইত তরুণ দুয়া ফঙ্।

"শৈল চূড়ায় ফুটে আছে দেখ
পাহাড়ী গোলাপগুলি—
মধুর মিলনে সুখে থাকি আমি
বিদায়ের কাল ভুলি ॥
গোলাপের দল ফুটে আছে ওই
পাষাণ আলিঙ্গনে
ভালবাসি প্রিয়ে, চলে যেতে তাই
দ্বিধা ভয় জাগে মনে ॥"

তাদের ভালবাসা ছিল নিখাদ। বিয়ের পাকা-কথা দেওয়া থেকে শুরু করে প্রথাগত কোন কিছু অনুষ্ঠানেরই ত্রুটি রাখেন নি অভিভাবকরা। মন্ত্রোচ্চারণ, মোরগের পায়ের তলায় তাদের নিয়তিগণনা, কুষ্ঠিবিচার, উপবাস নিয়মমাফিক সব কিছুই নিখুঁতভাবে সম্পন্ন হয়েছিল।

কিন্তু এইসব অনুষ্ঠানগুলো পালন করেছিল তারা দু'জনে শুধুই তাদের মা-বাবাদের খুশি করবার জন্যে। তাদের দুজনের কাছে তাদের প্রধান ও চূড়ান্ত কর্তব্য ছিল জেলার প্রশাসক সমিতির আর তাদের যুব সমিতির কমরেডদের সামনে নবদম্পতি হিসেবে খাতায় নাম সই করা। অপূর্বভাবে উদ্‌যাপিত হয়েছিল সেই বিবাহ অনুষ্ঠান। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সমিতির কর্মসচিব ভ্যাঙ্ আ গ্রা। তিনি নবদম্পতির শুভকামনায় তাঁর পান-

পাত্রটি তুলে ধরে বলেছিলেন—"আজ একত্রে মিলিত হলে তোমরা দুজনে, অক্ষয় হোক তোমাদের শান্তি, অটুট হোক তোমাদের মিলন।"

বিয়ের পর বাবা মা'র সঙ্গেই থাকত তারা। তারপর তাদের প্রথম সন্তানের জন্মের পর তারা নিজেদের সংসার গড়ে নিল। তাদের প্রথম সন্তানটি ছিল পুত্র সন্তান, দুয়া প্যাঙ্ বলে তাকে ডাকত ওরা।

খুব ভাল স্বাস্থ্য ছিল ওদের আর কাজকর্মের ব্যাপারে সমবায় সমিতির ওরা ছিল প্রথম সারির কর্মী। ওরা ওদের নিজস্ব জমিতে তুলোর চাষ করত। এই জমিটা খুব সমতল থাকায় ওখানকার তুলোর আঁশগুলো খুব খাড়া হতো। প্রত্যেক বছর নিজের হাতে সুতো কেটে আর বুনে সুঙ্ মাই তার স্বামীর সারা বছরের জামা-কাপড় তৈরি করে দিত। তাদের সম্মিলিত সুখী পরিবার-টিকে দেখে প্রতিবেশীরা বলত—"শুধু শস্য নয় ভাঁড়ার ঘরটিও ভাল, শুধু বাঁশী নয়, রাখালের ভেঁপুটিও বেশ মিষ্টি।"

তবু জীবন তো কখনও শাশ্বতছন্দে অবিরাম শান্তির খাত ধরেই বয়ে চলে না! আজকের ছোট শিশু যেমন তিড়িং তিড়িং করে নাচতে নাচতে লাফাতে লাফাতে হঠাৎ কখন বড় হয়ে প্রশ্নের রাশি বয়ে আনে তেমনি হঠাৎই বদলে যায় সব কিছু। গতকাল যা দেখে মনে হয় কত দৃঢ়, কয়েক ঘণ্টার ব্যবধানেই সেটাই হয়ে পড়ে ভঙ্গুর।

এক বছরের আগে থেকে পনেরোটি পরিবার—আবার তার মধ্যে কয়েকটি খুবই ছোট পরিবারকে নিয়ে গড়ে ওঠা সিন্ চাই গ্রামের সমবায় সমিতিটিকে দেখলে মনে হয় সেটা যেন ক্রমশ ক্ষয়ে যাচ্ছে আরো।

সবকিছুই চলছে ধীরগতিতে, বড় কোন কিছুরই প্রত্যাশা নেই কারুর। মিও মেয়েদের অবস্থা তথৈবচ। তারা সারাদিন সুতো কাটছে, ধান ভানছে, কোলের বাচ্চাটাকে পিঠে বেঁধে নিয়ে জঙ্গল থেকে কাঠকয়লা কুড়োচ্ছে। সারা-দিনই কেটে যাচ্ছে ঘর-গেরস্থালি আর নিজের নিজের ক্ষেতখামার সামলাতে। একদিন তাদের মধ্যে একজন বললো সে যৌথ কর্মসংস্থাতে একটা বড়সড় গোছের কোন কাজ করতে চায়। যেমন ধর সমবায় সমিতি বা জেলা শাসন পরিষদে সে একটা কোন দায়িত্বপূর্ণ কাজ নিয়ে দেখতে পারে।

কথাটা প্রথম শুনেই গাঁয়ের মেয়েরা সমস্বরে বলে উঠল, "এ বলে কি!" এমন অশোভন কথা শুনে হতচকিত হয়ে কেউবা দুহাতে ঢেকে ফেললো নিজের মুখখানা। সুঙ্ মাই-এরও অবস্থা হলো ওই রকমই যখন সে শুনল যে উৎপাদক সংস্থার সবাই একমত হয়ে ওকেই তাদের শাখার নেত্রী নির্বাচিত করবার জন্যে এক্ই সংগে হাত তুলেছে। তার পক্ষে নেত্রী হওয়া কত অসম্ভব

বলে সে যত যুক্তি দেখায় সংস্থার প্রতিনিধিরাও তার প্রতিটি যুক্তি আরো জোরালো যুক্তি দিয়ে খণ্ডন করতে থাকেন।

তাদের বক্তব্য দলনেত্রীর জ্ঞাতব্য বিষয় হলো পয়লা নম্বর—সঠিকভাবে ফসল ফলানো পদ্ধতিটা জানা আর দুনম্বর হলো—কিছুটা লেখাপড়া জানতে হবে তাকে যাতে করে সে আর সবাইকে শেখাতে পারে কি করে আরো ভাল চাষ করা যায়। আগের নেত্রীর এই গুণগুলো ছিল না আর সুঙ মাই-এর এগুণগুলো সবই আছে। কাজে কাজেই তাকে আমাদের নেত্রী করাই সমীচীন বন্দোবস্ত।

দলনেত্রী নির্বাচিত হবার পর তাঁদের সামনে দাঁড়িয়ে আনাড়ী শিক্ষানবিশের মতো কিংকর্তব্যবিমূঢ় অবস্থা হলো সুঙ্ মাই-এর। ভাল করে বক্তৃতা দেবার বেলায় তার ঠোঁটগুলো অবাধ্যতা আরম্ভ করল।

তার হাতদুটো কিন্তু খুবই নিপুণভাবে করে যেতে লাগল তুচ্ছাতিতুচ্ছ কাজগুলো। গ্রামের স্কুলে তৃতীয় শ্রেণী পর্যন্ত পড়েছিল সুঙ্ মাই। এতদিনের অনভ্যাসে তখনকার শেখা অনেক কিছুই আজ ভুলে গেছে সে। কিন্তু তবুও লিখতে বা নোট নিতে পারে সে এখনও বেশ ভালভাবেই। একটা তালিকা তৈরি করে সে তার বাড়ির দেওয়ালে টাঙিয়ে দিল। এই তালিকার একপাশে সে প্রত্যেকটি পরিবারের নাম লিখল আর সেই নামের তালিকা অনুযায়ী শীত-বসন্তের মরসুমে ক্ষেতখামারে কাজ করে প্রতিটি পরিবার কে কত পয়েন্ট অর্জন করেছে সেগুলো লিখে রাখল।

যেমন ধর—মিসেস ফ্যান সেন্ লুঙের পরিবার—

১,২৩৬ পয়েন্ট

মিস্টার লু আ ঝিন্—১,৬৫০ পয়েন্ট

সমবায়ের প্রতিটি সদস্য-সদস্যা আনন্দবিহ্বল হয়ে এই তালিকাটি শুধু যে দেখতে আসত তা নয়, তারা সবাই বলত হাজার খুঁজলেও সুঙ মাই-এর মতো এমন মধুর মিষ্টিস্বভাবের মেয়ে কোথাও পাওয়া যাবে না। সুঙ্ মাই-কে তাদের প্রত্যেকটি সমস্যার মোকাবিলা করে দিতে হতো। সে কখনও উঁচু গলায় কথা বলত না এদের সঙ্গে।

যেমন চাচা চিন্-কে সে মৃদুগলায় বলে উঠত, "কে যেন আমায় বললো আপনি নাকি ইঁট বইবার জন্যে আপনার মোষটাকে পাঠান নি। আপনি কি ভয় পেলেন আপনার মোষ ক্লান্ত হয়ে পড়বে বলে?—না কাকা, ভয় পাবার কিছুই নেই কারণ পশুদের খাবারের বরাদ্দ আরো বাড়িয়ে দেবার ব্যবস্থা নিয়েছি আমরা।"

হয়তো কু-কে বললো—"কি ভাই, একা দু'লাইন বেড়া বাঁধতে পারবে বলে

কথা দিতে পারছ না? চল আমিও হাত লাগাচ্ছি তোমার কাজে—কেমন? এবার আর কোনো নালিশ মোকদ্দমা রইল না তো? কি বল?"

এমনি করে মধুর রুচিসম্মত উপায়ে সব কাজ সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হতে থাকল সুঙ্ মাই-র বুদ্ধিতে।

শরৎ মরসুমে এই নবীন নেত্রী নিজের ক্ষমতার আরো সুন্দর নজির রাখল। শীতের বরফ বেশ দেরিতে গলতে আরম্ভ করাতে সে বছরে সয়াবীজ-গুলো বুনতে অনেক দেরি হয়ে গেল। বছরে ছ'মাসের মাথায় যখন সব জমি পরিষ্কার করে আগামী সনের ফসল বুনে ফেলার কথা তখন সবেমাত্র ফুল ধরল সয়াগাছগুলোতে। এই দলের হাতে চাষের জন্যে আছে মোটে আটটি মোষ। অন্য বছরের নিয়ম অনুসারে চললে অর্থাৎ মোষগুলোকে এক বেলা কাজ করালে সোজা হিসেবে দেখা যাচ্ছে যে গরমের শুরুতেও তারা ধানের বীজ ফেলে ধান রোয়ার কাজ কিছুতেই শেষ করতে পারবে না। সুঙ্ মাই সবাইকে জমায়েত করে বললো, "আমি বলি কি সমবায়ের নেতারা আমাদের আরো কিছু মোষ দিন। আমার যদ্দুর মনে হয় ওদের দিয়ে দু'বেলা কাজ করাতে পারব আমরা।"

মনে হয় এই কাজ এ গ্রামে এই ভাবে কেউ কখনও করে নি।

তাই কেউ কেউ বলে উঠল—"মোষগুলো মরে যাবে যে?"

আবার অপর দল বলে উঠল—"একমুঠো ঘাস বেশি খাইয়ে এভাবে জোর করে খাটাবে ওদের!"

কি করে এদের ভাল করে বোঝানো যাবে তা বুঝতে না পেরে সুঙ্ মাই নিজে এবং আর একটি কমরেডকে নিয়ে মাঠে নেমে পড়ল দুটি মোষ নিয়ে সরেজমিনে চেষ্টা করে দেখতে যে ওদের দিয়ে দুবেলা কাজ করানো যায় কিনা। প্রথম দিন মাঝ দুপুরে বেঁকে দাঁড়াল মোষগুলো। আর এক পাও নড়বে না তারা—একগুঁয়ের মতো কাদায় গড়াগড়ি দিতে লাগল। সুঙ্ মাইরা নিজেদের মধ্যে বলাবলি করল যে, "কাল রাতে আমাদের উচিত ছিল আরো বেশি করে ওদের খাওয়ানো। এটা আমাদের ভুলেরই শাস্তি"। সেদিন রাতে তারা অনেক বেশি করে ঘাস ওদের দিল। পরের দিন দিবা নিদ্রায় অভ্যস্ত মোষগুলো খানিকটা অনিচ্ছা সত্ত্বেও প্রায় সারাদিনই কাজ করল আর দিনের শেষে তাদের দিকে চেয়ে মোটেই বেশি ক্লান্ত বলে মনে হলো না।

দারুণ একগুঁয়ে লোকেদেরও মোষগুলোকে দেখে স্বীকার করতে হলো যে ওদের বেশি ক্লান্ত দেখাচ্ছে না।

উঃ কি দুর্বৎসর ছিল সেটা। সবেমাত্র ধানের চারাগুলো মাটিতে শেকড় চালিয়েছে, আর ঠিক সেই সময়েই দিন পাঁচেক ভাল আবহাওয়ার পর একনাগাড়ে

সাতদিন ধরে বৃষ্টি চললো। চাষের ব্যাপারে ওয়াকিবহাল সুঙ্ মাই জানতো যে এ ধরনের আবহাওয়াতেই জন্ম নেয় ক্ষেতের পোকামাকড়। তাই স্কুলের ছেলেমেয়েদের নিয়ে একটা দল গড়ে নিল সে। ওদের কাজ হলো রোজ ক্ষেতে গিয়ে লুকোনো পোকামাকড় খুঁজে বের করা। আগেরদিনে ক্ষেতে পোকা-মাকড়ের উপদ্রব শুরু হলে ওখানকার নিয়ম ছিল যে যার ঘরে দরজা বন্ধ করে বসে যাগযজ্ঞ করবে। এই ঠিক গত বছরেই যখন তারা পুজোপাঠ শেষ করে মাঠে পা দেবার মতো সাহস সঞ্চয় করল তখন ক্ষেতে গিয়ে দেখে যে পোকা-গুলো গাছের মূল থেকে ডাটাটি পর্যন্ত চিবিয়ে শেষ করে ফেলেছে। এ বছর সুঙ্ মাই গাঁয়ের লোকেদের ডেকে একনাগাড়ে তিনদিন ধরে পোকা মারার কাজে লাগিয়ে দিল তাদের। এর ফলে ক্ষেতগুলো পুরোপুরি বেঁচে গেল।

সুগন্ধি ফুলের সৌরভ নিমেষে ছড়িয়ে পড়ে দূর থেকে বহুদূরে—সুঙ্ মাই-এর এই কল্যাণকর প্রচেষ্টার কথাও তেমনি গাঁ থেকে প্রতিবেশী গাঁগুলো পেরিয়ে জেলা শহর পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ল।

এ গাঁয়ে এসে সবকিছু সরেজমিনে দেখে শেখবার জন্য অন্যান্য দলনেতা-নেত্রীদের আমন্ত্রণ জানালেন ভ্যাঙ্ আ ত্রা। মুখ্যসচিব নিজে এলেন সচক্ষে এদের সাফল্য দেখতে।

তারপর সারা বছরের কাজকর্মের হিসাব-নিকাশের জন্যে যখন বিরাট জন-সভার আয়োজন হলো, সেই সমাবেশে তিনি তাঁর সিন্ চাই-এর অভিজ্ঞতার কথা বর্ণনা করে সমস্ত সমবায়গুলিকে তিনি এই গ্রামটিকে তাদের আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করতে অনুরোধ জানালেন।

আর সিন্ চাই-এর লোকেরা তাদের দলনেত্রীর গর্বে গর্বিত হয়ে বলতে লাগল যে, "হ্যাঁ এইরকম নেত্রীর ওপর আমরা সম্পূর্ণ নির্ভর করতে পারি।"

এরপর থেকে অগাধ বিশ্বাস আর অসীম শ্রদ্ধা নিয়ে সারা গ্রামের মানুষ তাদের সবকিছু সমস্যা নিয়ে সুঙ্ মাই-এর সঙ্গে খুব খোলাখুলিভাবে আলোচনা করতে এগিয়ে এল। খিট্‌খিটে শাশুড়ী, কুঁড়ে পুত্রবধূ, নৃশংস স্বামী, জবরদস্তি করে ঘাড়ে চাপিয়ে দেওয়া বিয়ের পাত্রপাত্রী কিম্বা কোন নিন্দনীয় কাজের খোলাখুলি আলোচনা করতে সবাই যেত সুঙ্ মাই-এর কাছে। মিও নারীরা আগে যারা জানত শুধু কাঠকয়লা কুড়োতে, বজরা পিষতে, সুতো কাটতে, জল তুলতে আর বাচ্ছাদের খাওয়াতে—এখন তারা এগুলো ছাড়াও আরো অনেক কিছু শিখতে লাগল।

ওড়াপাখির ঝাঁককে পথ চিনিয়ে নিয়ে যাবার দায়িত্ব থাকে কোন একটি নেতাপাখির ওপর। সুঙ্ মাই-এর স্বামী দুয়া ফঙ্-ও সাধারণত সেই নেতা পাখির ভূমিকা নিত সব কাজে। আবেগ-প্রবণ, যৌবনোচ্ছল উৎসাহী দুয়া

ফঙ্ ছিল যুবদলের নেতা। একান্ত তারই উৎসাহে এই দলে যোগ দিয়েছিল সুঙ্ মাই। তৃতীয় শ্রেণী পর্যন্ত পড়ে স্কুল ছেড়ে সমবায় সমিতিতে কাজ করতে গেল সুঙ্ মাই আর দুয়া ফঙ্ তখনই জেলার সংখ্যালঘুসম্প্রদায়ের স্কুলে চতুর্থ শ্রেণীতে পড়তে চলে গেল। জেলা স্কুল সঙ্গে সঙ্গে দুয়া ফঙ্-কে প্রযুক্তি বিজ্ঞান শিক্ষার জন্যে ভর্তি করে নিল। প্রাণবন্ত সক্ষম আর চালাক ছেলে দুয়া ফঙ্ খুব তাড়াতাড়ি সবকিছু শিখে ফেললো। গ্রীষ্ম মরসুমের শেষের দিকে সমবায় সমিতি সয়াবীজ ঝাড়বার একটি যন্ত্র কিনে ফেললো।

যন্ত্রটা কিন্তু চালানোর পর তারা দেখল বীজের দানাগুলোও যন্ত্রের চাপে পিশে যাচ্ছে। দুদিন ধরে হেঁটে দুয়া ফঙ্ শহরের এক মেকানিকের দোকানে গিয়ে হরেক রকম প্রশ্ন করে সব রীতিপদ্ধতিগুলো ভাল করে জেনে এল। তারপর গাঁয়ে ফিরে ঘণ্টাখানেকের মতো ঝাড়াইয়ের যন্ত্রটা নিয়ে সে কাজ করার পর হঠাৎ সবাই দেখল যন্ত্র থেকে নদীর ধারার মতো খোসাছাড়ানো বীজগুলো বেরিয়ে আসছে।

ছোটখাটো যন্ত্র মেরামতির দোকানের ওপর ভীষণ দুর্বলতা ছিল ভ্যাঙ আ রা-র। তিনি তো আনন্দে আত্মহারা হয়ে প্রশংসা করতে লাগলেন দুয়া ফঙের। তার পিঠ চাপড়ে তিনি বললেন, "প্রযুক্ত শাখার একজন প্রথম সারির কর্মী হবে তুমি, তুমি সত্যিই অতুলনীয়"।

কোন বিবেকবান ব্যক্তির সমাজে নারীর স্থান সম্পর্কে একটি নির্ভুল ধারণা থাকা উচিত। মজার কথা হলো সুঙ্ মাই যখন প্রথম দলনেত্রী হলো তখন দুয়া ফঙের মনে কোন সমস্যাই উঁকি দেয় নি। সে বলত, "কে দলের নেতা বা নেত্রী হলো তাতে কি যাবে আসবে ? লোকে আগের মতোই যে যার কাজ করে নিজের নিজের রুজি রোজগার করে যাবে"। কিন্তু দুয়া ফঙ্ যখন প্রযুক্তি বিজ্ঞান শাখার নেতা হলো, তখনই বসন্তের পীচফুলের সৌরভের মতো তার স্ত্রীর সুখ্যাতি ছড়িয়ে পড়তে লাগল চারিদিকে। বাড়ির দেওয়ালে একদিকে দুয়া ফঙের প্রযুক্তি বিজ্ঞানে পারদর্শিতার একটি প্রশংসাপত্র আর অন্যদিকে ঝোলানো আছে সুঙ্ মাইয়ের শরৎকালীন অতুলনীয় ধান চাষের জন্যে আর একটি প্রশংসাপত্র। এই দুটি প্রশংসাপত্রের মাঝখানে টাঙানো রয়েছে তাদের সুন্দরবিবাহিত জীবনের স্মারক হিসেবে দু'জনের যুগল ছবি। ছোট্ট দুয়া পাঙ্ একবার ছবির দিকে আঙুল দেখায় কখনো বা প্রশংসাপত্রের দিকে আঙুল দেখিয়ে আধো আধো গলায় বলে— 'বাবা, মা"। তার কাকলিতে একত্রে হেসে ওঠে দুয়া ফঙ্ আর সুঙ্ মাই।

সমবায় সমিতি মোটর ইঞ্জিনের গতিতে উন্নতি করতে করতে পা রাখে বড় রাস্তায়। শীত বসন্তের ফসলের মরসুমে গ্রামের আরো চারটি সমবায় সমিতি

একত্রিত হয়ে একটি বড় গ্রামের সমান হয়ে দাঁড়ায়। পুরাতনপন্থীরা আরো অবাক চোখে চেয়ে থাকে যখন বাইশ বছরের মেয়ে সুঙ্ মাই এই নবগঠিত বৃহৎ সমবায় সমিতির ভাইস চেয়ারম্যান হিসেবে নির্বাচিত হয়।

সুঙ্ মাই নিজের দিকেও একটু অবাক বিস্ময়ে চায়। "আমার একটু ভয় করছে। এতটা যোগ্যতা নেই বোধহয় আমার।" দীর্ঘশ্বাস ফেলে ভ্যাঙ্ আ ত্রা-কে বলে যে—"কমরেড সম্পাদক, আমায় বল তুমি কি করে এত-বড় সমবায় সমিতি চালাব আমি ?"

কমরেড ভ্যাঙ্ আ ত্রা-র বয়স চল্লিশের ওপর। ফরাসী ঔপনিবেশিকদের বিরুদ্ধে এবং অন্যান্য হামলাবাজ দলগুলোর বিরুদ্ধে গণ সেনাবাহিনীতে যোগ দিয়ে বহুদিন লড়েছেন তিনি। সুঙ্ মাই-এর উৎকণ্ঠা বোঝবার মতো অভিজ্ঞতা তাই খুব ভালই আছে তার। তবু অনেকদিন ধরে ওকে কাজ করতে দেখেছেন উনি সেই জন্যে ওর প্রতি অগাধ বিশ্বাস আছে তাঁর। তিনি তেরচা চোখে ওর দিকে চেয়ে উৎসাহের হাসি মাখিয়ে তাকে বললেন—"দেখ সুঙ্ মাই সমবায়ের দুশ' সদস্য একবাক্যে সমর্থন জানিয়ে নির্বাচিত করেছে তোমাকে। এই দুশ' লোকের চিন্তাশক্তি মিশে আছে এর মধ্যে আর তার সঙ্গে তোমাকে নির্বাচন করার জন্যে প্রত্যেকের স্বকীয় যুক্তিও আছে"।

সুঙ্ মাই-এর আত্মবিশ্বাস ফিরে এল কিছুটা। স্বামীর কাছ থেকে আরো খানিকটা আশ্বাস পাবার আশা বুকে নিয়ে বাড়ি ফিরল সে।

আশ্চর্য ব্যাপার, তাকে বাড়ি ফিরতে দেখেও কিন্তু তার স্বামী যে লাঙলটা তৈরি করছিল সেটার ওপর থেকে চোখ তুলে একবারও দেখল না তার স্ত্রীকে। চার ভাঁজওয়ালা সৈনিকের টুপি পরা দুয়া প্যাঙ্ ছুটে এসে ঝাঁপিয়ে পড়ল মায়ের কোলে। সুঙ্ মাই হাঁটু গেড়ে বসে ছেলেকে এক হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরে অন্য হাতে স্বামীর চারপাশে ছড়িয়ে থাকা বাড়তি কাঠের টুকরোগুলো কুড়োতে লাগল। দুয়া ফঙ্ একটা কথাও বললো না সুঙ্ মাইয়ের সঙ্গে। রাত্রে খাবার সময়েও চুপচাপ রইল শুধু দুয়া প্যাঙ্ যেই জল খাবার জন্যে বায়না জুড়ল তখন নিজের চপস্টিক্‌গুলো নামিয়ে রেখে চিৎকার করে বললো—"কাল থেকে তুমি তোমার মা'র সঙ্গে সভাসমিতিতেও যেও। দিনরাত আমি তোমার বায়না সামলাতে পারব না।"

সুঙ্ মাই স্বামীকে খুশি করবার চেষ্টায় ছেলের পিঠ থাবড়াতে থাবড়াতে বললো—"ঢের হয়েছে আর দুষ্টুমি করতে হবে না। শুনছ, কাল তুমি বাচ্ছাদের স্কুলে একবার যাও। এটা আমাদের শাখার সব শিশুদের জন্যে তৈরি করা হয়েছে। সমবায়ে এখন আমরা একসঙ্গে অনেকে মিলে কাজ করছি তাই

যে কোন কাজই খুব চটপট হয়ে যাচ্ছে।" সুঙ মাই তার স্বামীকে বললো—"জানো, এই বাচ্চাদের স্কুলটা দু দিনের মধ্যে তৈরি হয়ে গেছে"।

কথাগুলো বলে কিছু প্রশংসা শোনবার আশায় ছিল সে কিন্তু তার স্বামীর উজ্জ্বল চোখে তখন আগুনের আভাস। অবশেষে একটি দীর্ঘশ্বাস ফেলে দুয়া ফঙ্ পরিস্থিতিটার খুব সুন্দর মোকাবিলা করল অত্যন্ত নির্লিপ্ত স্বরে—"হ্যাঁ ছোট সংসারই সামলাতে পারছি না এখনও, তার ওপর আবার বৃহৎ পরিবার!"

সব কটা সমবায়সমিতি একত্রিত হবার সমালোচনা করছে কি সে? নাকি সুঙ্ মাই-এর সমবায় সমিতির ভাইস্ চেয়ারম্যান হওয়া নিয়ে টিট্কিরি দিচ্ছে? স্বামীর মন্তব্যে সদ্য জ্বালানো প্রদীপের পলতেতে ঝড়ের ঝাপটা লাগলে যা হয় সুঙ্ মাই-এর মনের অবস্থাটাও দাঁড়াল সেই রকমের। ভেঙে গেল তার মনোবল। মাটিতে মিশে গেল যেন সে।

দিনকয়েক পরে একদিন বেশ বেশি রাতে ফ্যাস্লাইট হাতে সভা থেকে ফিরে সে দেখল যে বাড়ির দরজা বন্ধ। বারকয়েক ডাকাডাকি করেও কোন সাড়া পেল না সে। স্বামী তাকে ইচ্ছে করেই বাড়ি ঢুকতে দেবে না বুঝতে পেরে বাড়ির দরজার গোড়ায় বসে নিঃশব্দে কাঁদতে লাগল সে।

সেদিন থেকে তার জীবনটাকে ছেয়ে ফেললো গাঢ় অন্ধকার। এতদিনের সঞ্চারিণী পল্লবিনী লতা শত চেষ্টা করেও তার মুখের ওপর থেকে চাপা বেদনার ছাপটিকে মুছে ফেলতে পারল না। এতদিন ধরে একে সে লুকনো মদের বোতলের মতো আর পাঁচজনের কাছে লুকিয়ে রেখেছিল। পীচফলের পাতার মতো ঢলঢলে চোখ দুটোকে দেখে মনে হতো যেন জানলার খড়খড়ির মতো এখনই বন্ধ হয়ে যাবে তারা। বিনিদ্র দুখের রাতগুলো বিবর্ণ করে দিল তার পুরন্ত মুখের লালিমা।

তবু এই বেদনার কথা কাউকে জানাল না সে। শুধু সেদিন যেদিন তাকে পার্টিতে যোগদানের অনুমতি দেওয়া হলো সে বললো—"এই পার্টি এক নতুন জীবনের সন্ধান দিয়েছে আমাকে, দলের ছোট শাখা অনেক সাহায্য করেছে আমাকে, সমবায়ের লোকেরা সমর্থন জানিয়েছে আমায়। শুধু আর সকলের মতো আমার স্বামীও যদি এসে সাহায্য করত আমাকে তাহলেই আমি এখানে সানন্দে আমার যথাশক্তি দিয়ে কাজ করে যেতাম কমরেড।"

ভ্যাঙ্ আ ত্রা তাঁর ধূসর মাথা চুলকোতে চুলকোতে বলে উঠলেন—"একজন আমলাতন্ত্রবাদী হয়ে গেছি আমি। হ্যাঁ, নিশ্চয়ই সেরকম হয়েছি, তা নাহলে সুঙ্ মাই-এর এতবড় বাধার কথাটা কেন আগে বুঝতে পারি নি আমি?"

এরপর থেকে দুয়া ফঙ্-এর সঙ্গে প্রায়ই গল্প করতে যেতেন ভ্যাঙ্ আ ত্রা।

সাধারণ গল্পসল্প, হাল্কা ধরনের কিছু কিছু কথাবার্তা হতো—শুনলে মনে হবে যেন তারা দুজনে একসঙ্গে বেড়াতে বেরিয়েছে।

তিনি বলতেন—"এখন কত সুখে আছি আমরা। সব সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ই প্রায় একই ধরনের। কিন্তু বল মিয়ো সম্প্রদায়ের লোকেরা যে অন্য সম্প্রদায়ের লোকেদের থেকে কাজের যোগ্যতায় কম দক্ষ এটা বিশ্বাস করা কত বড় অন্যায়।"

দুয়া ফঙ্ বললো—"তুমি ঠিক বলেছ। তুমি তো নিজেই দেখছ সয়াবীনের খোসা ছাড়াবার যন্ত্রটা আমি কত অনায়াসে অন্য সমতলবাসীদের মতো চালাতে শিখে নিলাম।"

"আর আজ দেখ ছোট্ট শিশু সিও প্লে কেমন চালাচ্ছে ওটা! চালাচ্ছে না—তুমি বল?"

"খুব ভাল চালাচ্ছে। ওকে শেখাতেও খুব বেশি সময় লাগে নি আমার। একটু দেখিয়ে দিতেই ও সুন্দর শিখে নিল।"

"তাহলে কাজের ব্যাপারে মিও মেয়েরাও বেশ সক্ষম বল?"

"হ্যাঁ মন্দ নয় ভালই।"

"মেয়েটি প্রায় একজন পুরুষের মতোই কাজ করতে পারে।"

"তা সত্যি"। দুয়া ফঙ্-এর গলায় আন্তরিক উচ্ছ্বাসের সুর ফুটে উঠল। আসল ব্যাপার হলো মিও মেয়েরা যেদিন থেকে সমবায়ের কাজ করতে শুরু করেছে সেদিন থেকে তাদের যোগ্যতা সম্বন্ধে কোন বিরূপ মন্তব্য করবার মতো কোন অজুহাতই খুঁজে পাচ্ছে না দুয়া ফঙ্, আর তাতেই তার পৌরুষের গর্ব কিছুটা খাটো হয়ে গেছে, তাই সে বিশেষ সোয়াস্তি পাচ্ছে না মনে।

এর ওপর তার কিছু কমরেড যারা এখনও বিশেষ প্রগতিশীল হতে পারে নি, কিম্বা কয়েকজন যারা সামান্য এগিয়েছে প্রগতির পথে তারা দুয়া ফঙ্‌কে মাঝে মাঝে উস্কানিও দিচ্ছে। "কি হে দুয়া ফঙ্ একটা নারী তার স্বামীকে চালনা করছে—এটা কি খুব ভাল দেখাচ্ছে।"

"কি আমার স্ত্রী চালনা করছে আমাকে? কি বলতে চাও তোমরা?" উত্তেজিত হয়ে বলে দুয়া ফঙ্—"ঘর গেরস্থালিতে আমি সব সময়েই তার প্রভু আর কর্তা। প্রত্যেক বছরে নিয়ম করে সে নিজের হাতে আমাকে একটা করে নতুন স্যুট তৈরি করে দেয়, কল্পনা করতে পার তোমরা?"

"তা হলে তুমি বলতে চাও যে তোমার স্ত্রী যিনি একজন নবনিযুক্ত দল-নেত্রী, একজন ভাইস চেয়ারম্যান—তুমি তাঁর অধীনস্থ একজন কর্মচারী নয়? কিন্তু তোমাকে তার আদেশ-নির্দেশ মেনে চলতে হবে সর্বদাই। কাজ ঠিকমতো না হলে সে ধমকও লাগাবে! আর সব থেকে বড় কথা হলো এই যে তোমার

স্ত্রী এত রাত করে সভা-সমিতি থেকে ফিরছে এতে করে অন্য কিছু ঘটে যেতে পারে না কি ?"

ওদের এড়িয়ে যাবার জন্যে দুয়া ফঙ্ বলে—"ওঃ, তোমরা এখনও সেই সামন্ততান্ত্রিক যুগেই আছ।

কিন্তু একথাটা ও শুধু বলে ওই কটু কথাগুলো শোনার হাত থেকে মুক্তি পেতে।

এই উত্তরটা ওর আত্মপ্রত্যয়ের স্বীকৃতি নয়। ওই ঠাট্টাগুলো থেকে ওর মনে জমাট বেঁধে ওঠে ধুলোর আস্তরণ। তাই হাতের কাছে যখনই সে কোন ছুতো পায় যেমন কিনা তার ঘাড়ে ঘরের কিছু কাজ চাপিয়ে সুঙ্ মাই প্রায়ই যখন সভা-সমিতিতে যায় তখনই এই নোংরা ধুলো তার মনের মধ্যে ঘুলিয়ে উঠে মনটাকে ধোঁয়ায় ভরিয়ে তার চিন্তা শক্তিটাকে আচ্ছন্ন করে দেয়।

তার রাগের ঝাঁজ আর কটুকথাগুলো দিন দিন আরো তিক্ত হয়ে ওঠে। এই রকম দিনগুলোর মধ্যেই একদিন প্রস্তাব ওঠে সমবায়ের তরফ থেকে যে গ্রামের প্রত্যেকের নিজস্ব সমস্ত মোষগুলোকে সমবায়ের আওতায় আনতে হবে।

দুয়া ফঙ্ আর সুঙ্ মাই-এর একটি নিজস্ব মোষ ছিল। সমবায় সমিতি বেশ কয়েক বছর আগে গ্রামের সকলের আলাদা জমিগুলো সমবায় ভিত্তিতে একত্রিত করেছিল। কিন্তু এখন তাদের কর্মসমিতি সকলের সব মোষগুলোকেও সমবায় ভিত্তিতে একত্রিত করতে চাইল কারণ এর ফলে তারা তাদের ভাল বাছাই করা একটি মোষের দল তৈরি করতে সক্ষম হবে আর তাদের নিপুণভাবে রক্ষণাবেক্ষণ করে তাদের দিয়ে সমবায়ভিত্তিক চাষ করাতে পারবে।

কিছুদিন আগে বাড়ন্ত পীপগাছ উপড়ে ফেলার যে প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল এই মোষ নিয়ে নেওয়ার প্রস্তাবটি তার থেকেও অনেক বেশি বিরূপতার সৃষ্টি করল। সিনু চাই গ্রামের লোকেরা মোষগুলোকে প্রাত্যহিক চাষের কাজের প্রয়োজনে লাগানো ছাড়াও তারা ওদের এখনও মৃতব্যক্তি বা ভগবানের উদ্দেশ্যে বলির খোরাক হিসাবে দেখত। প্রত্যেকটি পরিবারই মনে করত এক একটি মোষ উৎসর্গ করে তারা তাদের স্বর্গের সিঁড়িটা পাকা করে নেবে।

গাঁয়ের জনসাধারণের থেকে ভাইস চেয়ারম্যান সুঙ্ মাই ও আরো বেশ কিছু লোক কিছুটা প্রগতিশীল ছিল। সত্যি কথা বলতে কি দুয়া ফঙ্ও এই সমবায়ভিত্তিক কাজের একেবারেই বিপক্ষে ছিল না। সবাই জানতো যে সামান্য একটা মোষ নিয়ে ঝামেলা করবার লোক সে নয়। তার নিজের স্ত্রী যদি এই আন্দোলন শুরু করার প্রস্তাব না রাখত তাহলে সেই হয়তো প্রথমেই তার মোষটা সমবায়ে দান করতে এগিয়ে আসত। আর যখন ব্যাপারটা দাঁড়াল এই যে তার স্ত্রীই যেন তাকে শিক্ষা দিতে আসছে এই ব্যাপারে।

সুঙ্ মাই বললো—"ওগো শুনছো, আমরা দুজনেই দলের প্রথম সারির কর্মী তার ওপর আমি আবার কর্মসমিতির নেত্রী, কাজেই তুমি তো বুঝতেই পারছ আমাদের মোষটাকে···কি বল আমাদের উচিত না ওটাকে দিয়ে দেওয়া··· ?"

"এ ব্যাপারে তোমার সঙ্গে আমি একমত নই।"

"কিন্তু কেন গো ?"

"সমবায় সমিতির ভাইস চেয়ারম্যান, আমাকে শিক্ষা না দিয়ে গাঁয়ের অন্য লোকদের শিক্ষা দিতে যাও, বুঝলে ?"

সুঙ্ মাই আরো নরম করে বলে—"শোনো গো, তুমি তো সর্বদা যুব-সমিতির সভায় যাও, তুমি আমার থেকে অনেক বেশি জ্ঞান এবং বোঝ তাহলে এরকম করে কথা বলছ কেন গো ?"

এই কথা শুনে খোঁচা খেয়ে গর্জে উঠল দুয়া ফঙ্—"বাঃ বাঃ এইবার ঠিক বলেছ ! এর মানে হলো—আমার তোমার মতো অতটা প্রগতি হয় নি এখনও। তোমার থেকে অনেক পিছিয়ে আছি আমি, তাই না ?"

"না না, কই তাতো বলি নি আমি একবারও।"

"হ্যাঁ তুমি বলেছ। আমাকে অপমান করেছ তুমি। আমার বিরুদ্ধে তোমার মনে অনেক নালিশ জমে আছে তাই প্রত্যেকটা সভায় তুমি আমার সম্বন্ধে আজেবাজে কথা বল।"

সুঙ্ মাই তার হাতদুটো ধরে ফিস্ ফিস্ করে বলে—"যারা মিথ্যে গুজব রটায় তারাই এসব কথা বলেছে তোমায়"।

কিন্তু দুয়া ফঙ্ স্ত্রীর হাতদুটো ঝট্‌কা মেরে সরিয়ে দিয়ে মুখখানাকে মোরগঝুঁটির রঙে রাঙিয়ে তাঁর মুখের ওপর চেঁচাতে লাগল—"কারুর কথায় তোয়াক্কা করি না আমি। আমি নিজে যা বুঝি তাই বলি ? আজ থেকে বলে রাখলাম তোমাকে সন্ধেবেলা ওই একরাশ পুরুষমানুষে ঠাসা সভাগুলোতে তোমার আর যাওয়া চলবে না একদম বুঝলে ?"

সুঙ্ মাই অনুনয় করে কাঁপতে কাঁপতে বললো—"চুপ চুপ, ছিঃ, এসব কথা বোলো না তুমি।"

কিন্তু সবচেয়ে কড়া মাদক দ্রব্যের থেকেও বেশি ক্ষতিকর বোধহয় মানুষের হিংসা। দুয়া ফঙ্ প্রতিটি কথায় জোর দিয়ে দিয়ে বললো—"তুমি কি ভাব আমি অন্ধ ? ভ্যাঙ্ আ গ্রা তোমাকে দেখতে ভাল লাগে বলে আজকাল এখানেও সে আসতে শুরু করেছে রোজ"।

ভ্যাঙ্ আ গ্রা-র মতো এমন একজন মাননীয় ব্যক্তি সম্পর্কে এমন হীন সন্দেহ কি করে জন্মালো দুয়া ফঙ্-এর মনে ? ঘোড়ার মুখের লাগাম ছিঁড়ে

গেলে সেটা যে কত বিপজ্জনক হয়ে উঠতে পারে সেটা কি কল্পনা করা যায় ? পাথরের প্রতিমার মতো দাঁড়িয়ে রইল সুঙ্ মাই। তাকে দেখে মনে হলো তার স্বামী যেন এক নিষ্ঠুর আঘাতে একটি স্ফটিকের ফুলদানিকে ভেঙে টুকরো টুকরো করে দিয়েছে। মাথাটা হাতে চেপে বিছানায় লুটিয়ে পড়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগলো সে। তার দ্বিতীয় সন্তান প্রায় ভূমিষ্ঠ হতে চলেছে, আট মাসের অন্তঃসত্ত্বা সে।

সেদিন সারারাত দু'চোখের পাতা বোজাতে পারল না একবারও। পরের দুদিন সে বাড়িতেই রইল দিনরাত। সমবায় সমিতির প্রত্যেকটি কাজ থেকে সে নিজেকে দূরে সরিয়ে নিল। কোন সভাসমিতিতে যোগ দিতে গেল না— এমনকি পরিচালক সমিতির সভাতেও গেল না সে।

সাংসারিক জীবন, অর্থাৎ দুটি লোকের মিলিত জীবন—তার প্রাধান্য কতটা! এটা হয়তো সত্যি যে মেয়েদের সুখী বিবাহিত জীবনই তাকে সমাজে একটা প্রতিষ্ঠা এনে দেয়!

মিও মেয়েদের স্বামীভক্তির খবর তারা কেউই জানবে না যারা নিজের চোখে না দেখেছে, কিভাবে একটি মিও নারী তার মৃতের মতো রাস্তার ধারে পড়ে থাকা মত্ত স্বামীকে পথে পথে খুঁজে বেড়িয়ে ঘরে তুলে এনেছে।

সুঙ্ মাই-ও তার স্বামীকে ভালবাসতো প্রাণ দিয়ে আর সেই সংগে ভয়ও করত তাকে। তাই সে বাড়িতেই বসে রইল সমবায় সমিতির সব কাজ থেকে।

গ্রামের অন্য সব সদস্য-সদস্যারা চুপি চুপি রকমারি মন্তব্য করতে লাগল। তারা বলাবলি করল—"সুঙ্ মাই কি নিজের স্বার্থ ত্যাগ করতে পারল না দলের স্বার্থে ? তার যে সন্তান আর কিছুদিন পরে ভূমিষ্ঠ হবে— সেই কি তার সবটুকু মন দখল করে রইল ? নাকি বিনা মাইনের খাটুনীতে তার অরুচি ধরে গেল!" কি ব্যাপার কিছুই বুঝতে পারল না তারা।

এ যেন ঝরণার জলে এক টুকরো সোনা খুঁজে বেড়ানো।

সুঙ্ মাই-এর কানে এর সংগে আরো নানা গুজবের খবর পৌঁছল— যেমন, "সে ঠিকই করেছে। তার নিজের সংসারের সুখ কেন উপভোগ করবে না সে। ভাইস চেয়ারম্যানের দায়িত্ব নিয়ে এত খাটুনি সে খাটবে কেন ?"

"এটা তো প্রায় চেয়ারম্যানের মতোই দায়িত্বপূর্ণ কাজ, তাই ভাইস চেয়ারম্যান হয়ে ওতেমন খুশি হয় নি সেই জন্যেই মুখ বেঁকিয়েছে এবার।"

সুঙ্ মাই কিন্তু ওই প্রকৃতির মেয়ে ছিল না একেবারেই। সবকিছু ছাড়তে সে বাধ্য হয়েছিল শুধু এই কারণে যে সে তার মনের দুঃখ তার স্বামীকে বুঝিয়ে এই ভুল বোঝাবুঝির অবসান ঘটাবার বদলে শুধুই পুরোনো সুতোর

জটে নিজেকে জড়িয়ে ফেলছিল বলে। তার ভাবনাগুলো বৃত্তাকারে ঘুরেই মরছিল কেবল। কে বুঝবে তার মনের কথা?

কিন্তু সবকিছু বুঝতে পেরেছিল শুধু একজন সে হলো ভ্যাঙ্ আ ন্না, পার্টি কমিটির যিনি ছিলেন মুখ্যসচিব। একদিন নতুন জুতো পায়ে দিয়ে খুব হাসিখুশি সহজ সরল ভাব নিয়ে তিনি সুঙ্ মাই-এর বাড়ি গেলেন। ছোট্ট দুয়া প্যাঙ্কে কোলে তুলে নিয়ে তিনি বললেন—"কিরে, মা রাতদিন বাড়ি বসে আছে বলে খুব খুশি হয়েছিস তো তুই?"

আসলে প্রশ্ন করলেন তিনি ছেলেকে উদ্দেশ্য করে তার মাকেই। সুঙ্ মাই-এর যে শিশু জন্ম নিতে আসছে তার কোলে, তার জন্যে একটি টুপি বুনছিল। তার হাতের কাজটা সরিয়ে রেখে দু চোখ ভরা জল নিয়ে ভাঙ্ আ ন্না-কে প্রশ্ন করল—"কমরেড তুমি আমাকে বুঝতে পারছ তো?"

ভ্যাঙ্ আ ন্না বাচ্ছাকে কোল থেকে মেঝেতে নামিয়ে সুঙ্ মাই-এর একটু কাছে সরে এসে বললো—"তোমার সমস্ত ব্যথার কথা বুঝেছি আমি। একটা বাড়ির দুটো খুঁটি—তার একটা যদি শক্ত না হয় তাহলে অন্যটাও নড়বড়ে হয়ে যায়। তখন লোকের উচিত এই দুটোকেই শক্ত করা। বাইরে থেকে চাড়া দিলেও বনেদ শক্ত করতে হলে একটা খুঁটিকে অন্য খুঁটিটাকে সাহায্য করতে হবেই।"

সংকেত পেয়ে বিহ্বল সুঙ্ মাই বললো—"কিন্তু আমি তো বুঝতে পারছি না কি করে পারবো আমি এই সাহায্য দিতে... ।"

"একি বলছ? তুমি সমবায় সমিতির সভা সমিতিতে কত গুছিয়ে কথা বলতে পার, কত লোককে সবকিছু ভাল করে বোঝাতে পার, আর বাড়িতে যে লোকটির সংগে এক টেবিলে বসে খাচ্ছো, যার সংগে একই বিছানায় শুচ্ছো—তাকে এটা বোঝাতে পারবে না তুমি?"

সুঙ্ মাই কিছুক্ষণ অবাক হয়ে থেকে তর্জনী দিয়ে চোখের জল মুছে একটু হাসবার চেষ্টা করে বললো—"তবুও এটা আমার পক্ষে খুবই কঠিন কাজ... ।"

এটা কিন্তু খুব সত্যি যে এমন কতকগুলো সোজা যুক্তিযুক্ত কথা আছে যেগুলো অনেক সময় খুব কাছের মানুষটিকে সরল করে বুঝিয়ে বলা যায় না। আর যদি তার নাম দুয়া ফঙ্ হয় তো একেবারেই তা করা যাবে না। এ ধরনের মানুষদের কিছু বোঝাতে যাওয়া কঠিন।

এবারের শিশুটি ভূমিষ্ঠ হবার পর সুঙ্ মাই উপলব্ধি করল যে সে তার অভিষ্ট লক্ষ্যর অর্ধেক কাছাকাছি এসে পড়েছে। তার অভীষ্ট বস্তুকে সে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে, শুনতে পাচ্ছে তার আহ্বান—একে এড়িয়ে যাবার আর কোন পথ নেই।

সমবায়সমিতির লোকেরা রোজই দেখতে এসেছে তাকে, কেউ হাতে করে এনেছে এক ডজন ডিম, কেউ বা খানিকটা চিনি, তার বাড়ি সর্বদা লোকের আসা যাওয়ায় মুখর। সে ভাইস চেয়ারম্যান থাকা সত্ত্বেও তার এই কাজ না করার ব্যাপারে কোন কথা বলেনি একটি লোকও, কিন্তু তাদের প্রতিটি দৃষ্টি ও তাদের প্রতিটি মুখের হাসি তাকে যেন ইশারা করে তার পুরোনো কাজে ফেরাতে চাইছে।

শেষ পর্যন্ত যে শক্তি তাকে ঘরে আবদ্ধ করে রেখেছিল সেই শক্তিকে পরাস্ত করল জনগণের আহ্বান। শিশু জন্মাবার এক সপ্তাহ পরে সে নবজাতকটিকে পিঠে বেঁধে একটি জনসভায় গিয়ে হাজির হলো। ভ্যাঙ্ আ গ্রা হাতের ইশারা করে তাকে বললো—"না না, আরো বিশ্রাম দরকার তোমার।"

চোখের জলে ভেসে সুঙ্ মাই গাঢ় স্বরে উত্তর দিল—"অনেক বিশ্রাম করেছি আমি। জান না ঘোড়াদের বেশিদিন আস্তাবলে বেঁধে রাখলে বাত ধরে তাদের পায়ে।"

সুঙ্ মাইয়ের গতি এখন দুর্বার, আর তাকে রুখতে পারবে না কেউ।

নতুন শীত-বসন্তের মরসুম শুরু হলে প্রায় একমাস ধরে এক নাগাড়ে বৃষ্টি হতে লাগল সেবার। তারপর টেটের পর বেশ কয়েকদিন ধরে বরফ পড়ল। দুহাজার কিলোগ্রাম সয়ার বীজ পুরো পচে গেল চষা জমির ওপরেই। কিন্তু এই যে প্রাকৃতিক দুর্যোগ এগুলোর কিছু ভাল ফলও ফলে আগাছা আর কিছু কিছু লোকদের বদ স্বভাবের উপর। কোন কোন লোক গোপনে কিছু কিছু জমিনে আফিম গাছ লাগিয়েছিল। কেউ কেউ নিজস্ব মাছ চাষে ফিরে গিয়েছিল। এখানে ওখানে ছোট ছোট চোলাইয়ের কারখানা গড়ে উঠেছিল। পার্টির লোকেরা একত্রিত হয়ে এই অবস্থায় কি করা যায় সব কিছু ভেবেচিন্তে ঠিক করল যে জনসাধারণকে ডেকে তাদের সেকেলে অভ্যাস ছেড়ে সকলে একসঙ্গে আবার সয়াবীজের চাষ করতে হবে।

সুঙ্ মাই তার বাচ্ছাটিকে শিশুপালন প্রতিষ্ঠানে দিল কমরেডদের সঙ্গে ক্ষেতে কাজ করতে পারবে বলে। প্রতিদিন সন্ধ্যায় উৎপাদন শাখার সভায় গিয়ে সে সারা-দিনের কাজের বিবরণ শুনত আর পরের দিন কি কি করা হবে তার আলোচনা করত। শুধু খাবার সময় বাড়ি যেত সে কয়েক গ্রাস খাবার মুখে তুলতে।

এক বাদলা রাতে সুঙ্ মাই খেতে বসেছে তার বাড়িতে এমন সময় গ্রামের নিরাপত্তাবাহিনীর একটি লোক ডাকতে এলো তাকে। সে বললো—"সুঙ্ মাই, বুড়ো লিনকে মদচোলাই করবার সময় একেবারে হাতে-নাতে ধরেছি আমরা। আমাদের সঙ্গে এস নিজে চোখে সব দেখে সই করবে।"

বড় প্লেটের ওপর দুয়া ফঙের হাতের চপ্‌স্টিকগুলো থেমে গেল। রুক্ষ চোখে চেয়ে সে বললো—"তোমাদের চেয়ারম্যান কি করছেন, তাঁকে কেন ডাকছ না তোমরা? সব সময় একেই ডাক কেন?"

সুঙ্‌ মাই কিন্তু ততক্ষণে উঠে পড়েছে। ছোট্ট বাচ্ছাটাকে পিঠে বেঁধে নিয়ে ছাতার দিকে হাত বাড়িয়ে সে বললো—"আমি যাব"।

বিরক্ত আর হতাশা মেশানো স্বরে দুয়া ফঙ্‌ বললো—"না তুমি যেতে পারবে না"।

"আমাকে বাধা দেওয়া উচিত নয় তোমার।"

"তা যদি হয়, যদি আমার কথা না শোন তা হলে দুয়া প্যাঙ্‌কেও নিয়ে যাও।"

একটা বাচ্ছা পিঠে আবার অন্য বাচ্ছাটাকেও হাত ধরে নিয়ে যেতে হবে। কিন্তু নিরাপত্তাবাহিনীর লোকটি চট করে দুয়া প্যাঙ্‌কে তার নিজের পিঠে তুলে নিয়ে দরজার দিকে পা বাড়াল। তার পেছনে পেছনে সুঙ্‌ মাইও বেরিয়ে গেল।

দুয়া ফঙ্‌ একা পড়ে রইল। তাড়াতাড়ি করে খাওয়া শেষ করে ভুট্টার বাটি আর নুন টেবিলের ওপর ফেলে রেখে মাটিতে মাদুর বিছিয়ে শুয়ে পড়ল সে। তার মাথায় কি ঢুকল? সে নিশ্চয়ই রাগে কাণ্ডজ্ঞান হারিয়ে ফেলেছে। কিন্তু শুধু রেগে গিয়ে যা খুশি করলেই চলবে মানুষের? কৈ স্ত্রী ও সন্তানদের ওপর ভালবাসা তো শুকিয়ে যায় নি তার। এক এক সময় তার মনে হয় বটে যে তার বুকে শুকিয়ে গেছে সব ভালবাসা, আর ঠিক সেই মুহূর্তেই রেগে সব কিছু লণ্ডভণ্ড করে ফেলতে যায় সে। কিন্তু সম্বিৎ ফিরে এলে সে নিজের অন্তরেই অনুভব করে স্বাদী হৃদয়ের মধুর সজীব ভালবাসা। তখন অনুতাপ আর অনুশোচনায় ভরে ওঠে তার মন আর এই অবস্থাটা স্থায়ী হয়ে থাকে তার মনে যতক্ষণ না আবার রাগের বশীভূত হয়ে পড়ে সে।

চিৎ হয়ে শুয়ে সে খোড়ো চালে বৃষ্টির ফোঁপানি শোনে। সে ভাবে এই বৃষ্টির মধ্যে রাস্তার পাথরে পা হড়কে হড়কে পিঠে বাচ্ছা বেঁধে সুঙ মাই এগিয়ে চলেছে কি কষ্টে। জলে ভেজা সুতোর মতো নরম কোমলতা তাকে কাঁপিয়ে তোলে। অপ্রতিরোধ্য আলোড়নে বেদনা আর আত্মশ্লাঘা নিংড়ে গড়িয়ে পড়ে তার মনে। ভালোবাসা—যার মহিমা অনন্যসাধারণ, গভীর অনুশোচনার পর আবার সে নবজন্ম লাভ করে দুয়া ফঙ্‌-এর বুকে।

দুয়া ফঙ্‌ লাফিয়ে উঠে কাঁধে একটা সাধারণ গোছের জামা চাপিয়ে দরজা খুলে বৃষ্টির মধ্যে পথে নেমে পড়ে। তার ছুটন্ত পা থেকে ছিটকে পড়ে কাদায় মাখা জল। "সুঙ মাই তুমি কোথায়? মা আর ছেলে একটু দাঁড়াও!" "সুঙ্‌ মাই দাঁড়াও" বলে সে গলা ফাটিয়ে চিৎকার করে চলে।

রাত ন'টা নাগাদ সব ঝামেলা মিটিয়ে সুঙ্ মাই বাড়ি ফিরে এলো। দরজা হাট করে খোলা। নিরাপত্তাবাহিনীর লোকের কোল থেকে দুয়া প্যাঙ্‌কে নিয়ে সে বাড়ি ঢুকে তাকে বিছানায় শুইয়ে দিল। তারপর পিঠের বাচ্ছাটার গায়ে জড়ানো চাদরটা খুলে তাকে কোলে নিয়ে বুকের দুধ খাওয়াতে লাগল।

ঘরের অপরপ্রান্তে তাঁতটার ঠিক সামনে গম্ভীর নিস্তব্ধ হয়ে বসে আছে দুয়া ফঙ্। তার একহাতে ধরা বাঁশের পাইপের পেতলের খোলটা থেকে বেরোনো সরু সুতোর মতো ধোঁয়ার রেখাটা দেখা যাচ্ছে। চাপা আলোয় ঘরের দেওয়ালে পড়েছে দুয়া ফঙ্-এর ছায়া।

সুঙ্ মাই বাড়ি ফিরে যে অশান্তির মুখোমুখি হবে সেটা কিভাবে এড়ানো যায় তাই চিন্তা করে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললো। একটা ঝগড়ার পর আবার সব ঝেড়ে ফেলে সহজভাবে কথা বলতে এগিয়ে যাওয়া যে কি কষ্টকর তা বলা যায় না। বিশেষত এটা যখন একটা ছোট ঝগড়ার পর কিছুতেই মিটমাট হয়ে যাবার মতো নয়। নাঃ, নিষ্ক্রিয় হয়ে বসে থাকলে চলবে না মোটেই সেটা বুঝতে পেরেছে সুঙ্ মাই। যে সুখের ঘর তারা গড়ে তুলেছিল এতদিন তিল তিল করে, আজ সেই ঘর ভেঙে চুরমার হতে চলেছে। এটা তাদের নিজস্ব সমস্যা বিশেষ করে তারই সমস্যা এটাকে আবার আগের মতো সুন্দর করে গড়ে তুলতেই হবে।

বাচ্ছাটা ঘুমিয়ে পড়তেই সে মিষ্টি নরম গলায় ডাকল—"ওগো শুনছ, শোন না।"

দুয়া ফঙ্ একটু নড়ল কিন্তু পাইপের বাটিটার ওপরেই মাথা ঝুঁকিয়ে বসে রইল। সুঙ্ মাই অবাক হয়ে স্টোভটার কাছে এগিয়ে গেল, মাটিতে স্বামীর দিকে পিছন ফিরে বসে আগুনটা খুঁচিয়ে দিল। আগুনের শিখাগুলো বেড়ে যেতেই ভূষির পাত্রটায় আবার বড় বড় বুদ্বুদ দেখা দিল আর পাত্রের ঢাকাটা ভালোভাবে বন্ধ না থাকাতে তার ভেতর থেকে ভূষি আর কলার গন্ধ মেশানো খানিকটা টোকো ধোঁয়া ছড়িয়ে পড়ল ঘরে। আগুন থেকে সৃষ্টি হলো এক মধুর উষ্ণতা। সুঙ্ মাই খুশি মনে দুয়া ফঙের কাছে সরে এসে বললো—"শোন লক্ষ্মীটি অন্য সব সংসারে স্বামী-স্ত্রীরা পরস্পরকে বালিশের পালখের মতো উষ্ণতা নিয়ে জড়িয়ে আছে একে অন্যকে। আমাদের সম্পর্কটাই শুধু আলমারিতে রাখা কাঁচের পাত্রের মতো সারাদিন ঠোকাঠুকি লাগছে। আমি যদি কোন ভুল করে থাকি তো বল আমাকে কি সে ভুল তাহলেও না হয় আমি বুঝতে পারি···।"

দুয়া ফঙের বহুকালের পরিচিত সুঙ্ মাই-এর এই মধুর ভালোবাসায় ভরা গলার স্বর শুনে তার বুকটা ভেঙে খানখান হয়ে গেল। মাথাটা একটু

তুললো সে। না, তার স্ত্রীর কোন পরিবর্তনই হয় নি, আজও সে তেমনি করেই ভালোবাসে তাকে। খালি বেচারা অনেক রোগা হয়ে গেছে আর তার চোখের কোণে কালি পড়েছে। সে শুধু তোতলামি করে বলতে পারল "আমার সুঙ্ মাই"।

স্বামীর আবেগ অন্তরে অনুভব করে সুঙ্ মাই বুকের ভেতর এতদিনের চেপে রাখা সব বেদনা ধুয়ে মুছে বার করে দিল অঝোর অশ্রুধারায়। "হে ভগবান, আমার দুটি সন্তান হওয়ার পরও আমার ওপর অবিশ্বাস তোমার! স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে, কমরেডদের মধ্যে যে সব কথা অসমীচীন সেই সব কথা কেন তুমি বলছ আমাকে? ভ্যাঙ্ আ গ্রা-কে কি করে সন্দেহ করতে পারলে তুমি? আমি আমার আদর্শ মতো যে পথ বেছে নিয়েছি কেন তুমি আমাকে সে পথে এগোতে বাধা দাও?"

দুয়া ফঙ্-এর বুকে মোচড় লাগল। সুঙ্ মাই-এর ভৎর্সনা তো তার বেদনাহত বুকের আর্তনাদ। ব্যথাভরা কান্নায় ভেঙে পড়ে সে বললো—"সুঙ্ মাই! আমার সুঙ্ মাই—আমিও তো লেখাপড়া করেছি, কাজের দায়িত্ব নিয়েছি পার্টির কাছ থেকে—তবু কি করে আমি তোমার সংগে এরকম ব্যবহার করতে পারলুম তুমিই বল! আমি একটা দুষ্টু ঘোড়া—যে শুধু রাতদিন চেঁচায় আর চারপায়ে লাথি ছোড়ে! এই দুষ্টু ঘোড়াটাই তোমার নরম বুকটাকে মাড়িয়ে গুঁড়িয়ে দিয়েছে। ওঃ আমার সুঙ্ মাই...।"

সুঙ্ মাই তার স্বামীর হাতদুটো ধরে নাড়া দিয়ে তার আবেগের অভি-ব্যক্তিগুলোকে থামিয়ে দিতে চাইল। কাঁপা গলায় সে বললো—"না না দুয়া ফঙ্ তোমার নিজের সম্বন্ধে যা বলছ তুমি—তা মোটেই সত্যি নয়।"

তাদের দুজনের চোখের জল ঝরে পড়তে লাগল নিঃশব্দে। ঠিক সেই মুহূর্তে পথে কোন শীতার্ত প্রেমিক বাঁশিতে ঘরের এই দম্পতির অপরিচিত সুরটির মূর্চ্ছনা তুললো—

"শৈল চূড়ায় ফুটে আছে দেখ
পাহাড়ী গোলাপগুলি—
মধুর মিলনে সুখে থাকি আমি
বিদায়ের কাল ভুলি......"

অতীতের মধুর ভালোবাসা আবার জাগিয়ে দিল তাদের দুটি হৃদয়কে—যে হৃদয় দুটি তখন বলতে চাইছিল বিবাহিত জীবনের ভালোবাসাকে চিরস্থায়ী করতে সক্ষম হও তোমরা। সৌন্দর্যভরা পার্বত্য গোলাপ ফোটে অনেক উঁচুতে। তাকে পেতে হলে অনেকটা পথ চড়াইয়ে উঠতে হবে তোমাকে।

দূর পাল্লার পথে

জুয়ান ত্রিন্

আমাদের দু'জনের কারুরই ঘড়ি ছিল না। কিন্তু পথের ধারের শিশির-কণায় মুক্তোর মতো সাজানো গাছের সারির গাঢ় ছায়াগুলো দেখে আমাদের মনে হলো মধ্যরাত্রি অতিক্রান্ত হয়ে গেছে।

গাড়ির চালক আমার দিকে ফিরে জিজ্ঞাসা করল—"কমরেড আমাকে একটা সিগারেট জ্বালিয়ে দেবে কি তুমি ?"

আমি তাড়াতাড়ি তার সিগারেট ধরিয়ে দিলাম। আমার খুব ভাল লাগল তার জন্যে একটু কিছু কাজ করতে পেরে। গাড়িতে তোলার পর থেকে সে এই প্রথম কথা বললো আমার সংগে।

আমরা এগিয়ে চলেছি চতুর্থ জোনের দিকে—যেখানে মার্কিনী বোমারুরা ক্রমাগত আক্রমণ চালিয়ে যাচ্ছে। এতক্ষণ পর্যন্ত আমি তার সংগে বৃথাই আলাপ শুরু করার চেষ্টা করেছি। সে শুধু দু'একটি কথায় উত্তর দিয়েছে আমার প্রশ্নের।

সে সামনে দৃষ্টি রেখে আমার দিকে দৃক্‌পাতমাত্র না করে এগিয়ে চলেছে। আপন মনে কখনও মুচকি হেসেছে অথবা ভ্রূকুটি করেছে।

তার নাম "দাই", সে বিবাহিত, তার একটি বাচ্চা আছে। তাকে প্রশ্ন করে শুধু এইটুকুই জানতে পেরেছি আমি। সে একজন দক্ষ ড্রাইভার কিন্তু অসাধারণ কিছু নয়। তার গায়ের কলারওয়ালা তুলোর জামার পিছন দিকটায় খানিকটা খানিকটা রঙ উঠে গেলেও সেটি বেশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। স্টিয়ারিংটা বেশ শক্তহাতে ধরে আছে সে। তার ভারি ট্রাকটা যখনই কোন গর্ত বা নিচু খাড়াই রাস্তার দিকে এগোচ্ছে তখনই সে তার গাড়ির গতি কমিয়ে দিচ্ছে আর তার মনযোগ দ্বিগুণ বাড়িয়ে দিচ্ছে। পঁচাত্তর হাজার কিলোমিটার পথ পরিক্রমার পরও বোধ হয় এই কারণে তার আট সিলিণ্ডার "জাইল"-এর আস্তরণে একটা আঁচড়ও পড়ে নি। যাত্রা শেষ হলে সে নিশ্চয়ই তার ওই আস্তরণগুলো তেলা কাপড় দিয়ে মুছে আবার চকচকে করে নেবে।

ট্রাকটা এগিয়ে চলেছে একাই।

আমার চালক সবসময়েই আমাদের গাড়ি আর সামনের রাস্তা দিয়ে যাওয়া আগের সারবন্দী গাড়িগুলোর মধ্যে বেশ দূরত্ব বজায় রেখে চলেছে। কারণ

এই গাড়িতে বোধহয় অগ্নিদাহ্য কোন জিনিস নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। পেছন দিক থেকে যখনই কোন ট্রাকের আলোর সংকেত দেখা যাচ্ছে তখনই সে ডানদিকে ভালো করে সরে গিয়ে হাত নেড়ে তাকে পেরিয়ে যাবার নির্দেশ দিচ্ছে।

তার এতটা সংযত ভাব মাঝে মাঝে আমার মনে বিরক্তি জোগাচ্ছে। আমি সব থেকে উত্যক্ত হচ্ছি তখনই, সে যখন ছোট "মলোটোভা" গাড়ির একটা ছোকরা ড্রাইভারকে তার এতবড় শক্তিশালী ট্যাংকার ট্রাকটার দিকে একটা তাচ্ছিল্যের হাসি ছুঁড়ে দিয়ে পেরিয়ে যেতে দিচ্ছে।

তার সিগারেটটা ধরিয়ে দিয়ে আমি তাকে কথা বলাবার চেষ্টা করলাম "কমরেড দাই, আমার কাছে ভালো সুগন্ধি চা আছে, তুমি যদি চাও একটু...।"

খুশির হাসি হেসে সে বললো, "ধন্যবাদ, এখন রেখে দাও ওটা। রাত্রির শেষ প্রহরে ওটা আমাদের কাজে লাগবে।"

সে আমার দিকে অনেকক্ষণ চেয়ে থেকে আমাকে ঠিকমতো বুঝতে পেরেছে ভেবে বললো—"ঘুম পাচ্ছে।"

"আমি তোমার সঙ্গে জেগে থাকতে পারলে খুশি হব।"

দাই এক্‌সিলেটারে চাপ দিল। ফুটপাথগুলো ঘন কুয়াশায় আরো গাঢ় কালো দেখাচ্ছিল। বোমার আঘাত থেকে রেহাই পাওয়া ওই বিরল মসৃণ রাস্তার অংশটুকু আমরা বেশ আরামে পার হয়ে চললাম। শিশিরভেজা হাওয়ায় ভরে গেল গাড়ির ভেতরটা। আমাদের মুখগুলো ঠাণ্ডা বরফ হয়ে গেল।

হঠাৎ দাই বললো—"রাস্তা থেকে যাত্রী তোলা আমি বিশেষ পছন্দ করি না।"

তার রূঢ় স্পষ্ট কথায় আমি প্রায় লাফিয়ে উঠলাম। "কি বললে?—আমি ভেবেছিলাম বোমাবিধ্বস্ত এই ধরনের রাস্তায় তুমি সঙ্গীসাথী পেলে খুশিই হবে।"

"তুমি ঠিকই বলেছ। কিন্তু আমি এতদিন যত লোককে তুলেছি তারা যাচ্ছেতাই। গাড়িতে চড়ার সঙ্গে সঙ্গে তারা ঘুমিয়ে পড়বে আর সব সময় আমারই কাঁধের ওপর হেলান দিয়ে ঘুমোবে।"

"আমার মনে হয় গাড়ি চলার একঘেয়ে আওয়াজে ওদের ঘুম এসে যায়। অবশ্য ওটা খুবই খারাপ অভ্যাস।"

"দেখ, এই ধরনেয় বদ অভ্যাসওয়ালা লোকেদের ঠিক অপছন্দ করি না আমি। আমার অপছন্দ তাদেরই যারা ট্রাকটাকে একটা বিপজ্জনক জায়গা দিয়ে নিয়ে যাবার সময় ইচ্ছে করে ঘুমিয়ে পড়ে।"

"তারা সত্যি সত্যি এরকম করে নাকি!"

"আমি মিথ্যে বলছি না। বিপজ্জনক জায়গাটা পেরোনোর সঙ্গে সঙ্গেই চোখ খোলে তারা।"

আমি এখন বুঝতে পারলাম কিছুক্ষণ আগে সে আমাকে ওভাবে নিরীক্ষণ করছিল কেন ?

একবার মুখ খোলার সংগে সংগেই পরস্পরের বন্ধু হয়ে গেলাম আমরা।

দুবছর হলো ড্রাইভারের লাইসেন্স পেয়েছে সে। আগে সেনাদলের লোক ছিল দাই। একবার সেনাদল থেকে ছাড়া পাবার পরই জ্বালানী পরিবহন শাখার একজন ড্রাইভারের সহকারী হিসাবে সে কাজে যোগ দেয়। তার নিয়োগ-কর্তা খুব সাবধানী ও বিচক্ষণ লোক ছিলেন। তিনি কেবলমাত্র নিরাপদ জায়গাগুলোতেই তাকে গাড়ি চালাতে দিতেন। একদিন এক অবিশ্রান্ত বৃষ্টির দিনে সেই ভদ্রলোকই এক বিমান আক্রমণে তার ফুসফুসে ছর্‌রা বোমার আঘাত পান। ভীষণ যন্ত্রণা হচ্ছিল তাঁর। এক্ষুণি ওই অভিশপ্ত জায়গা থেকে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব গাড়ি চালিয়ে তাঁকে একটা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার বিশেষ প্রয়োজন ছিল।

দাই তাকে গাড়িতে বসিয়ে স্টিয়ারিং ধরল। নিচুগলায় তিনি যে সব নির্দেশ দিতে লাগলেন সেইগুলো মেনে গভীর কর্দমাক্ত ও বোমাবিধ্বস্ত খাড়াইগুলো অতিক্রম করে সে এগিয়ে চললো। এতটুকু ভুল হলেই ট্রাকটি নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে গভীর খাদে। দীর্ঘ দুটি দিন ও রাত্রির প্রাণান্ত পরিশ্রমের পর জঙ্গলের ভেতর দিয়ে ১৫০ কিলোমিটার পথ অতিক্রম করে দাই ভদ্রলোকটিকে ডাক্তারের হাতে তুলে দিতে পেরেছিল আর তার জ্বালানীগুলো নির্দিষ্ট জায়গায় পৌঁছে দিয়েছিল।

এই কঠিন পরীক্ষার পর সে অনায়াসেই তার লাইসেন্স পেয়ে গেল। এই-ভাবে সে পেয়েছিল তার "জাইলটি" যেটি এখন ভিন্ আর হ্যানয়ের মধ্যে যাতায়াত করছে। আর এই রাস্তাই তাকে দেখিয়েছে সুখের মুখ।

"এটাকে একটা অঘটন বলতে পার।" সে তার গোপন কথাটি জানাল আমাকে।

"ন্যাশনাল্ রুট নম্বর এক-এ প্রায় ছয় থেকে সাত কিলোমিটার রাস্তা বোমার আঘাতে বিধ্বস্ত হয়ে গিয়েছিল। একরাতে মাত্র দু'তিনটি ফেরী নদী পার হতে পারত। কিন্তু যে কোন উপায়েই হোক ফ্রণ্টে গ্যাসোলিন্ পৌঁছে দিতেই হবে। হ্যানয় থেকে গ্যাসোলিন আনবার জন্যে আদেশ দেওয়া হলো আমাদের শাখাকে।"

সে তার কাহিনী বলে যেতে লাগল।

"হ্যানয় যাওয়ার পথে বিশেষ কোন ঝামেলা হলো না। কিন্তু ফেরার পথে ট্রাঙ-এর সেতুর ওপর আমরা আক্রান্ত হলাম অবিশ্রাম বোমাবর্ষণে। তিনটে ট্রাক আগে পেরিয়ে গেছে, আমার 'জাইল'-টা ছিল চার নম্বর, সেটা ভেঙে গেল

বোমার আঘাতে। ওটা আটকে গেল ওখানেই—ভাঙা "সক এ্যাবসর্বার" নিয়ে হেলে পড়ল রাস্তায়। অন্য কমরেডরা তাদের ট্রাকগুলো নিরাপদ জায়গায় রেখে পায়ে হেঁটে আমাকে সাহায্য করতে এগিয়ে এলো। "সক্ এ্যাব্সর্বার" বদলাতে হলে গাড়িকে জ্যাক্ দিয়ে উঁচু করতে হবে। সেই নিকষ কালো আঁধার রাতে এটা করা একেবারেই অসম্ভব। কারণ একটি বাতিও জ্বালাতে পারব না। একটি বাতি জ্বালা মানেই আমরা শত্রু বিমানের একটি নিশানা হয়ে পড়ব। তাই আমি আমার কমরেডদের অনেক বুঝিয়ে সুঝিয়ে আমাকে বাদ দিয়েই তাদের চলে যেতে রাজি করলাম।

সারা রাত ধরে আমি সেতুর কাছে ছোট্ট গ্রামটির চারিদিকে ঘুরে ঘুরে প্রত্যেকের বাড়িতে গিয়ে গিয়ে বালতি আর বয়াম ধার করতে লাগলাম। এই বালতি আর বয়ামগুলোতে গ্যাসোলিন্ ভরে রেখে জ্যাকে তোলার আগে আমি ট্রাক্টাকে একটু হালকা করতে চাইছিলাম। এতো চেষ্টা চালিয়েও আমি স্থির নিশ্চিত হতে পারছিলাম না যে এইভাবে আমার কার্যসিদ্ধ হবে কি না।

গ্রামে একটি বাড়িতে একজন বৃদ্ধ ও তাঁর নাতনী আমার সংগে খুব ভাল ব্যবহার করেছিল। যদিও তারা সেতু পর্যন্ত যেতে সাহস পাচ্ছিল না তবু গ্যাসোলিনগুলো আরো নিরাপদ জায়গায় রাখতে তারা আমাকে সাহায্য করেছিল।

শত্রুবিমানগুলো আবার ভোরবেলায় হানা দিল। কিন্তু সৌভাগ্যবশতঃ তাদের বোমাগুলো সেতু বা ট্রাকটাকে স্পর্শ করতে পারল না। আমি যখন "সক্ এ্যাব্সর্বার" বদলাতে শুরু করলাম বৃদ্ধটি সেই সময়ে আমাকে নিরস্ত করবার অনেক চেষ্টা করলেন। তাঁর নাতনীও অনেক অনুনয় করে বললো এভাবে প্রকাশ্য জায়গায় দাঁড়িয়ে আমি যেন কাজ না করি। সে বলেছিল শত্রুবিমান-গুলো দিনে দু'তিনবার করে আসে আর কোন মানুষের দেখা পেলেই তাকে গুলি করে। এই জায়গাটায় কোন আচ্ছাদন নেই, রাস্তার ধারে ধান কাটার পর যে দুচারগাছা পরিত্যক্ত শস্য অবশিষ্ট থাকে সেগুলোও কেটে ফেলা হয়েছে। শত্রুবিমান এলে ধারে কাছে কোথাও আশ্রয় নেবারও জায়গা নেই।

"কিন্তু আমি বা কি করে আমার এই ট্রাকটাকে বোমার দয়ার উপর ছেড়ে দিই? তোমাদের মতো লোকেদের সাধারণত গাড়ির ওপরই দরদ বেশি। কিন্তু তোমরা যদি ট্রাক ড্রাইভার হতে তাহলে বুঝতে কতটা ভালোবাসা যায় এই ট্রাককে। এর কোনো একটি যন্ত্রের সামান্যতম অস্বাভাবিক আওয়াজেই আমরা কত দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে পড়ি।

"আমি বৃদ্ধটির কাছ থেকে খানিকটা খড় চেয়ে নিয়ে সেতুর দিকে রওনা হলাম। দিনের আলো তখনও ফোটে নি ভাল করে কিন্তু 'ঘেপ্' ফেরির কাছে

তখনই বোমা ফেটেছে। আমি খড় দিয়ে ট্রাকটাকে এমনভাবে ঢাকা দিলাম যে দেখে মনে হচ্ছিল এটা যেন রাস্তার ধারের তৈরি করা একটা আস্তানা।

"ভোর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে খুব চিন্তাগ্রস্ত হয়ে সেই বৃদ্ধ একপাত্র চা নিয়ে আমার কাছে এলেন আর আমারই জন্যে গর্ত খুঁড়ে একটা আশ্রয় তৈরি করতে লাগলেন। তাঁর কাজ শেষ হয়ে যাবার পরও আমার শত অনুনয় সত্ত্বেও তিনি আমার কাছে থেকে গেলেন। তিনি বললেন তোমার মতন একজন যোয়ান ছেলে মৃত্যুর পরোয়ানা করছে না তাহলে এই বুড়ো বয়সে আমি কেন মরতে ভয় পাব? তাঁর এই অমূল্য সাহায্য না পেলে কি করে আমি আমার কাজে সফল হতাম জানি না।

"মেয়েটি কিন্তু ঠিকই বলেছিল। প্রায় দশটার সময় দুটো "এফ্ ১০৫" যাদের আমরা বোকা বানাতে পারলাম না—তারা দু'একবার আসা-যাওয়া করেই একেবারে ঝাঁপিয়ে পড়ল আমাদের ওপর। "একটা রকেট"—এইটুকু বলেই আমি কোনমতে রাস্তার ওপর শুয়ে পড়তে পেরেছিলাম! সৌভাগ্যক্রমে একটা মেসিনগান আমাদের পিছন দিক থেকে তাদের ওপর আক্রমণ চালালো। দস্যু-গুলো আর নিচে নেমে তাদের রকেটগুলো ঠিক নিশানায় ফেলতে পারল না। সেগুলো জলে ভরা ধান ক্ষেতে গেঁথে গেল। আমাদের ওপর আছড়ে পড়ল জল আর কাদা।

"বিমানগুলো ফিরে গেল। আমরা একটি পরিচিত স্বর শুনতে পেলাম। সে প্রশ্ন করছে আমরা কোথায়। যেখান থেকে মেসিনগানগুলো গোলা বর্ষণ করছিল আওয়াজটা এলো সেখান থেকেই। আমি আমার চোখ দুটো মুছে নিয়ে গ্রামের মিলিসিয়া মহিলাদের মধ্যে বৃদ্ধার নাতনীকে দেখতে পেলাম। আমার সব ভীতি ভেসে গেল চোখের জলের বন্যায়।

"বিকেল বেলায় আমার 'সক্ এ্যাবসর্বার' বদলানো শেষ হলো। গাড়িটাকে চালিয়ে আমি নদীর অপর পারে গেলাম। তারপর আমার আশ্রয়দাতার কাছে ফিরে গেলাম একটু বিশ্রাম করতে—কারণ সন্ধেবেলাতে আমি আবার যাত্রা শুরু করব।

"তখন থেকে প্রতিবার যাতায়াতের পথে তাঁর বাড়িটা আমার একটা বিশ্রাম-স্থল হয়ে উঠল। এখানে একটু থামার সুযোগ আমি পারতপক্ষে নষ্ট করতে চাইতাম না। পথে যত ঝামেলাতেই পড়ি না কেন তবু আমি সব সময়েই এখানে একটু থামতাম।

"মেয়েটির গল্প শুনতে খুব ভালবাসতো আর আমাকে প্রতিটি যাতায়াতের কাহিনী শোনাতে অনুরোধ করত। কখনও আমি তাকে 'কণ্ড' পাহাড়ের কাহিনী শোনাতাম। আমাদের ট্রাকগুলো বাঁচাতে কিভাবে আমরা ফস্ফরাস্

বোমায় তৈরি আগুনের চক্র কত সুকৌশলে পার হয়েছিলাম সেই সব কথা বলতাম। শত্রু বিমানগুলোকে কি করে আমরা বোকা বানাই সেইসব গল্প করতাম। নদীর বুকে অজস্র মাইন পাতা থাকলেও কি করে আমরা নিরাপদে পারঘাটায় পেঁছিতাম সেসব কথাও বলতাম, আর সে বড় বড় চোখ মেলে আমার গল্প শুনত।

"একদিন সে হঠাৎ জিজ্ঞাসা করল—'তুমি কেন সংসার পাত নি? তোমার বয়স তো নেহাৎ কম হয় নি।' আমি আন্তরিকতার সংগে বললাম—'আমার একজন ভাই আছে। আসছে বছর সে দশম শ্রেণীর পড়া শেষ করবে। আমাদের বাবা মা অনেক ছেলেবেলায় মারা গিয়েছেন সেইজন্যে আমি নিজে কাজ করে আমার ভাইয়ের পড়াশুনা চালিয়ে যাবার জন্যে তাকে সাহায্য করতে চাই।'

"সে সাশ্রুনয়নে বললো—'তোমরা পুরুষরা কি ভাব মেয়েরা স্বামীর সংসারে শুধু বোঝা?'

"আমি ঠিক কি বলতে চাইছি—সেটা ভাল করে ব্যাখ্যা করে বোঝাতে হলো তাকে।

"তারপর থেকে মেয়েটির সংগে দেখা হলেই আমি আগের মতো সহজ হতে পারতাম না। কেননা একটা অদ্ভুত অনুভূতির আলোড়ন শুরু হতো আমার মনে। আগের মতো সহজভাবে কথা বলতেও পারতাম না তার সংগে। আমার বেশ মনে পড়ে যখন আমার আঠারো বছর বয়স তখন আমার কাকা বিয়ের জন্যে আমাকে একজনদের বাড়ি নিয়ে গিয়েছিলেন অবশ্য শেষ পর্যন্ত সে বিয়ে ঘটে ওঠে নি কিন্তু সেখানে গিয়েও আমার মনে এ ধরনের কোনো অনুভূতি জাগে নি।

"সত্যি বলতে কি মেয়েটি যেদিন আমার জীবন রক্ষা করে সেই বিশেষ দিনটি থেকেই আমি ভালবেসে ফেলেছিলাম তাকে। কিন্তু আমাদের দুজনের বয়সের পার্থক্যের জন্যে আমাকে নিজের মনের সংগেই অনেক বোঝাপড়া করতে হচ্ছিল। আমার বয়স চৌত্রিশ আর সে তখনও কুড়িই পেরোয় নি। আর তাছাড়া আমার মনে একটা সন্দেহও ছিল যে আমার প্রতি তার সহানুভূতিটা ঠিক ভালবাসা নাও হতে পারে। কত লোকই তো সামান্য সহানুভূতিকে ভালবাসা ভেবে ভুল করে জীবনে কত না অশান্তি ডেকে আনে।

"যাই হোক এত সব ভাবনাচিন্তাগুলোও কিন্তু আমাকে নিরস্ত করতে পারে নি প্রতিবার তাদের বাড়ি থামা ও তাকে দেখে একটু আনন্দ পাওয়া থেকে। কোনোবার যদি মেয়েটির সংগে কোনো কারণে দেখা না হতো তো আমার ভীষণ খারাপ লাগত। আমার ওপর তার মনোযোগ ও আমার জন্যে

তার চিন্তা এগুলোকে যদিও সে খুব বিচক্ষণতার সংগে ঢেকে রাখত তবুও আমার কাছে সেগুলো চাপা থাকত না। সে আমার জামা-কাপড় কেচে দিত। রাস্তায় খাবার জন্যে ভাত দিয়ে দিত। আমার ভাই স্কুলে ভাল করে পড়াশুনা করছে কি না জানতে চাইত। আমি এটাও ভাল করে লক্ষ্য করতাম যে আমার সংগে তার ব্যবহার আগের মতো স্বচ্ছন্দ ছিল না।

"একবার সে ট্রাক পর্যন্ত আমার সংগে এল। সেটা ছিল এক বাসন্তী সন্ধ্যা। কুয়াশা নামছে তাড়াতাড়ি। আধো অন্ধকারে আমি খুব সাহসী হয়ে উঠলাম। তাকে বলে ফেললাম—'আমি তোমায় ভালবাসি।' দরজা হাট করে খোলা ট্রাকটা দাঁড়িয়ে আছে রাস্তার ওপর। আমি ভাবলাম যদি আমি প্রত্যাখ্যাত হই তো গাড়িতে লাফিয়ে উঠে যত তাড়াতাড়ি পারি এখান থেকে চলে যাব—আর কখনও ফিরে আসব না।

"আমার কথার উত্তর দিল না মেয়েটি। একটি ফিলাও গাছের গায়ে তার হাতটি হেলানো ছিল। সেই হাত দিয়ে সে বিচলিতভাবে গাছের বাকল ছিঁড়তে লাগল। আমি কম্পিতপায়ে এগিয়ে গেলাম তার দিকে। হঠাৎ সে ভেঙে পড়ল কান্নায়?

"কি করতে হবে বুঝতে না পেরে আমি তাকে বললাম—'কেঁদো না,' তোৎলাতে তোৎলাতে বললাম—'কেউ যদি দেখে তো কি ভাববে?'

"তারপর সে কান্না থামিয়ে তার চোখদুটি আমার চোখের ওপর রেখে বললো—'তুমি কবে ফিরে আসবে?'

"আনন্দে উজ্জ্বল সুরে আমি বললাম—'কবে ঠিক বলতে পারছি না, তবে আমি আসব আবার।'

"এরপরে আমাকে আরো দক্ষিণে একটা অঞ্চলে কাজে পাঠাল। তখন আমাদের দু'জনের সম্পর্ক শুধু চিঠিপত্রের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রইল। ওই চিঠিগুলোও নিয়ে আসত আমাদের দলের কমরেডরা।

"মেয়েটির নাম ছিল হুয়োঙ্, ও আমাকে পাগলের মতো ভালবাসত। সে আমাকে বলেছিল তার বাড়ির লোকেরা আর সেই সংগে তার দাদুও তার পছন্দে সায় দেয় নি কারণ তার থেকে বয়সে আমি অনেক বড় বলে। সে তাই খুব অশান্তিতে আছে।

"সে আমাকে বিয়ে করতে মনস্থির করল কি না সেটা জানবার জন্যে আমি যখন অধৈর্য হয়ে উঠেছি ঠিক সেই সময়ে সে চিঠিতে জানাল যে অবশেষে সে তার দাদুকে বোঝাতে পেরেছে আমি গিয়ে যেন বিয়ের ব্যবস্থা করি।

"কিন্তু ঠিক তখনই আমি ছুটির আবেদন করতে পারলাম না কারণ তখন আমাদের শাখায় প্রচণ্ড কাজের চাপ চলছিল। শত্রুবিমানগুলো আমাদের

জ্বালানীর গুদামগুলোর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তে শুরু করেছে তাই জ্বালানীর সরবরাহ অটুট রাখার জন্যে আমাদের গুদামগুলোকে বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে দিতে হচ্ছিল।

"কিছু দিন পরে সুযোগ মিললো। ওরা একটা নতুন ট্রাক কিনতে আমাকে "হ্যানয়" পাঠাতে চাইল সেই সময় আমি হুয়োঙ-এর বাড়িতে গিয়ে তাকে বিয়ে করার অনুমতি পেলাম। কমরেডরা আমাকে উপহারে উপহারে ভরিয়ে দিল। একজন তার জামাকাপড়ের রেশন কার্ডটি দিল আমাকে। অন্য একজন দুটো মুরগী দিল। অপর একজন তার মাস মাইনের অর্ধেক টাকা আমায় উপহার দিল। কিন্তু তাদের মধ্যে কেউই তখন আমার বিয়ের অনুষ্ঠানে যোগ দেবার জন্য যেতে পারবে না।

"তারা আমার যাওয়ার জন্যে জায়গার ব্যবস্থা করে দিল ভিন্ন শাখার একটি ট্রাকে। দুর্ভাগ্যবশত রাস্তায় মেসিনগানের গুলিতে ট্রাকটাতে আগুন লেগে গেল। আমি পায়ে হেঁটে যাত্রা শুরু করলাম আর শেষ পর্যন্ত শূন্য হাতে আমার ভাবী স্ত্রীর কাছে গিয়ে পেঁছিলাম।

"হুয়োঙ্ কিন্তু হতাশার কোনো চিহ্নমাত্র দেখাল না। আমার বাড়ি থেকে কোনো লোক এই বিয়েতে থাকতে পারল না বলে আমারই দুঃখ হতে লাগল। আমিই হাঁটতে হাঁটতে 'কঙ' পাহাড়ের পাশের গ্রামে গেলাম সেই পুড়ে যাওয়া ট্রাকের ড্রাইভার আর সহকারীকে খুঁজতে। তারাই আমার বিয়ের বরযাত্রী হতে রাজি হলো।

"আমাদের বিয়ের উৎসব হলো খুবই সাধারণ কিন্তু আন্তরিকতাপূর্ণ। আমার অবস্থা দেখে সকলেরই করুণা হলো তাই তারা আর এই বিয়ের কোন সমালোচনা করল না।

"আমাদের একটি বাচ্ছা হয়েছে।"

ড্রাইভার নীরব হলো। আমি প্রশ্ন করি—"ছেলে না মেয়ে?"

"মেয়ে। আমি এখনও কিন্তু জানিই না তাকে কেমন দেখতে হয়েছে। হুয়োঙ্-কে আমি ছ'মাস দেখি নি। আমি অন্য একটা রাস্তা ধরে তখন তাড়াতাড়ি পেঁছিতে চাইছিলাম কিন্ত সে রাস্তায় একটা সেতু ভেঙে গেছে তাই আমাকে এই রাস্তা ধরতে হলো।"

আমি মনে মনে প্রার্থনা করতে লাগলাম এখন থেকে ভোর পর্যন্ত কোন বিমান আক্রমণ যেন না-হয়, তাহলে আমার বন্ধুর তার স্ত্রী-কন্যার সঙ্গে তাড়াতাড়ি মিলন হবে আর আমিও তাদের দেখতে পাব তাড়াতাড়ি।

খুব অল্পক্ষণের মধ্যে আমরা অনেকগুলো ট্রাক দেখতে পেলাম তার মধ্যে "মলোটোভা"টি একটা সরাইখানার সামনে দাঁড়াল। আমরা ক্ষিদেয় কাতর

হয়ে পড়েছিলাম। পেঁয়াজ রসুন ভাজার গন্ধে আমাদের জিভে জল আসছিল। তবুও আমরা মনস্থির করলাম যে রাস্তায় আমরা আর থামব না।

নদীটা নিরাপদেই পার হলাম আমরা। কিন্তু পরের মুহূর্তেই দেখলাম আমাদের সামনের রাস্তা বন্ধ। যুব "সক্ ব্রিগেডের" লোকেরা আমাদের কাছে ছুটে এসে সাবধান করল। তারা বললো এখানে একটা যে কোনো সময়ে ফাটবার মতো বোমা রাখা আছে।

রাস্তাটা খুব সরু তাই আমরা অন্যদিকেও ঘুরতে পারব না। বোমাটা যদি ফাটে আর রাস্তাটা যদি ভাঙে তাহলে আমাদের এখানেই অপেক্ষা করতে হবে কতক্ষণ তা কে জানে?

দাই তার অধৈর্য ভাব লুকোতে পারছে না। গাড়ির পেছনের সীটে কিছুক্ষণ হেলান দিয়ে একটু ভেবে সে প্রশ্ন করল—"রাস্তাটায় এখনও গাড়ি চালানো যায়?"

একটি মেয়ে উত্তর দিল—"তা যায়, কিন্তু বোমাটা খুব কাছেই আছে, ওই যেখানটায় আমরা লালপতাকা নিশানা করে দিয়েছি—ওইখানেই আছে।"

দাই আমার সংগে ইঙ্গিতময় দৃষ্টি বিনিময় করে গাড়িতে স্টার্ট দিল। রাস্তার খানিকটা খানিকটা বোমার আঘাতে ছিটানো কাদার আস্তরণে ভরে আছে। মাঝে মাঝে পিছলে যাচ্ছিল ট্রাকটা, কোথাও বা কেঁপে বসে যাচ্ছিল। গাড়ি থেকে নেমে বারকতক আমাদের বড় বড় পাথরের চাঙড় সরাতে হচ্ছিল। এগুলো যে কোথা থেকে এলো কে জানে? কি অপূর্ব দক্ষতায় দাই বোমার তৈরি গর্তগুলো—যেগুলো আধখানা রাস্তাকে চোঙার মতো করে দিয়েছে—সেগুলো পেরিয়ে এলো। অবিরাম সংগ্রামে তার মুখের পেশীগুলো শক্ত হয়ে উঠছিল।

হঠাৎ আমি ঠিক আমাদের পিছনে একটা আলোর নিশানা দেখতে পেলাম। এটা নিশ্চয়ই সেই পাজি মলোটোভার ড্রাইভারের কাজ। তারও এই রাস্তাতে এক্ষুণি যাবার মরণদশা ধরেছে।

আমি লক্ষ্য করলাম দাই প্রচণ্ড রাগ সামলালো। তার ঘামঝরা মুখখানা কঠিন হয়ে উঠেছে। ট্রাকের আলোগুলো আমাদের সামনের দিকে একটার পর একটা বোমায় সৃষ্ট যেসব গর্তগুলো আছে তার অনুসন্ধান করে চলেছে। লাল পতাকার দিকে এগোবার সময় আমার স্নায়ুগুলো কঠিন হয়ে উঠল। এবার দাই কিছুতেই মলোটোভার অনবরত চেষ্টা সত্ত্বেও তাকে আগে পার হতে দিল না।

বোমাটা মাটির মধ্যে গেঁথে গেছে অর্ধেকটা। দেখা যাচ্ছে শুধু তার নোংরা নাকটা আর সাদা লেখাগুলো সমেত ডানাটা। আমরা এটা পেরিয়ে এলাম। আমার তখন গলদঘর্ম অবস্থা।

বোমাটা যখন পেছনে বেশ খানিকটা দূরে ছাড়িয়ে এগিয়ে এলাম—তখন আমি এলিয়ে পড়লাম। প্রচন্ড তৃষ্ণায় আমার গলাটা শুকিয়ে যাচ্ছিল। মুখের মধ্যে একটা বিশ্রী তেতো স্বাদ পাচ্ছিলাম। দাই একটা গাছতলায় থামল। সে গাড়ি থেকে নেমে ঘাসের ওপর লম্বা হয়ে শুয়ে পড়ল। সে আমাকে চায়ের পাত্রটা দিতে ইশারা করল আর এক সঙ্গে অনেকটা চা খেল। আমরা দুজনে তখন একটা কথাও কইতে পারছি না।

হঠাৎ আমাদের পেছনে একটা ইঞ্জিনের অস্বাভাবিক আওয়াজ আর বিকট হর্ণ শোনা গেল। দাই উঠে বসল। "ওটা কাদায় পিছলে যাচ্ছে"—চিৎকার করে উঠল দাই।

আসলে মলোটোভাটা বোমাটার খুব কাছেই কাদায় আটকে গেছে। চাকাগুলো কাদার মধ্যে প্রচন্ড ঘুরছে কিন্তু গাড়িটা এক ইঞ্চিও এগোচ্ছে না। দরজা খুলে ড্রাইভারটা আমাদের দিকেই ছুটে আসছে। হোঁচট খাচ্ছে, পড়ে যাচ্ছে আবার উঠেই দৌড়াচ্ছে। গাড়িটা গর্জন করেই চলেছে, তার সামনের আলোদুটো অন্ধকারে আলো ছড়াচ্ছে।

নিমেষে দাই একটা দড়ি নিল। সে আমাকে একটা ছোট্ট নির্দেশ করল —"বেরিয়ে এস কমরেড"।

"আমাকে তোমার সংগে যেতে দাও।"

"তোমাকে সংগে নেওয়া অনর্থক। শোনো, এর উল্টো দিকের গ্রামে আমার বাড়ি। ওখানে গিয়ে হুয়োঙের বাড়ির সন্ধান কোরো, ছোট্ট গ্রাম 'ভো'-তে...।"

দাই ট্রাকটা পিছু হটাল। যে কোন মুহূর্তেই বোমাটা ফাটবে মনে করে আমি সেদিকে তাকাতেই পারলাম না।

প্রায় পনের মিনিট পরে সে মলোটোভাটাকে টেনে নিয়ে আমাদের দিকে এগিয়ে এল। অন্য ড্রাইভারটা তখন সযত্নে দড়িটা গুটোচ্ছে দাই-কে ফেরৎ দেবার জন্যে। আমি তার দিকে ভালো করে চাইলাম।

খুব ছেলে মানুষ—শান্ত। সহানুভূতিশীল একেবারেই উদ্ধত নয়। সে বিড় বিড় করে কথা বলছিল সেগুলো কোনোরকমে বুঝতে পারছিলাম। দাই তাকে থামিয়ে বললো—"আর কথা নয়। আমাদের আগে আগে চলে যাও আর রাস্তায় কোনদিনও অন্য গাড়িকে ছাড়িয়ে যাবার জন্যে লোককে বিরক্ত কর না।" সে নিজের ট্রাকটাকে একধারে সরিয়ে দিয়ে মলোটোভাটাকে যাবার রাস্তা করে দিল।

প্রথম উষার আলোয় আকাশ যখন রাঙিয়ে উঠেছে তখন আমরা দাই-এর বাড়ি পেঁৗছলাম। গ্রামের শেষ প্রান্তে লুকোনো খড়ে-ছাওয়া একটা বাড়ি। দাই আঙিনায় প্রবেশ করে ডাকাডাকি শুরু করল। ভেতর থেকে কাঁপা স্বরে

উত্তর এলো। এই গলার স্বর এমনই যাতে মাখানো আছে দীর্ঘ প্রতীক্ষা আর সেই সংগে প্রতীক্ষা সফল হওয়ার মধুর সুর।

কর্কশ শব্দে তালাটা খুলে গেল। দুটি সুঠাম বাহু জড়িয়ে ধরল দাই-এর চওড়া কাঁধ দুটো। দাই চুপি চুপি বললো—"আমার সংগে অতিথি আছে।"

মাটিতে কাঠের খড়মের শব্দ শুনলাম। কেরোসিনের আলো জ্বালানো হলো। ছোট্ট ঘরের উষ্ণতা আমাদের পথের শীতলতা ও ক্লান্তির কথা ভুলিয়ে দিল।

আসার পথে দাই-এর কাছে গল্প শুনতে শুনতে আমি তার স্ত্রীর যে ছবি মনে মনে এঁকেছিলাম তার সংগে মিল নেই তার। সে উইলো গাছের মতো কৃশকায়া, বড় বড় চোখ দুটিতে ঘন পল্লব। খুব ছেলেমানুষ—তাকে মা বলে মনেই হয় না।

কিন্তু কি মমতায় সে তার শিশুর মশারীটা সরাচ্ছে, আলোর বিপরীত দিকে যাতে তার শিশুটির গায়ে আলোটি ঠিকমতো পড়বে আর তার স্বামী দেখবে সেই শিশুকে। গোলগাল তিন মাসের বাচ্ছা একটা। বাবার একটা সেনাদের পুরানো কম্বল জড়িয়ে সে গভীর ঘুমে তলিয়ে গেছে। শিশুর দিক থেকে উজ্জ্বল চোখদুটি সরিয়ে সে তার স্বামীর দিকে চাইল।

দাই বাচ্ছাটাকে কোলে তুলে নিয়ে আস্তে আস্তে দোলাতে লাগল। তার মনের ইচ্ছে—বাচ্ছাটা একবার জেগে উঠুক।

সে তার স্ত্রীর কাছে রাস্তার ঐ বোমাটার কথা বলছিল আর তার স্ত্রী গভীর মনোযোগের সংগে শুনছিল। দাই-এর কথা শুনতে তার স্ত্রীর যে গভীর আগ্রহের কথা দাই আমাকে পথে আসতে আসতে বলেছিল—ঠিক সেই আগ্রহই মূর্ত হয়ে উঠল আমার চোখে। বোমার কাছে মলোটোভাটা কাদায় আটকে বসে যাওয়ার কথা শুনতে শুনতে আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞাসা করল—"ওকে কেউ উদ্ধার করতে গেল না"?

"হ্যাঁ গিয়েছিল"—বললাম আমি।

কি হয়েছিল সবটা যখন সে শুনল তখন তার চোখদুটি উজ্জ্বল হয়ে উঠল। সে তার স্বামীর হাত দুটো চেপে ধরল। অথচ দাই তাদের দুজনের বয়সের পার্থক্য নিয়ে কত দুশ্চিন্তাই না করেছিল!

উপত্যকায় ঝড়

দো চু

দা নাঙ্ থেকে হুন্ গাই-এ থু-কে ফিরিয়ে নিয়ে এলো সেই একই কালো রঙ করা পুরোনো যাত্রীবাহী স্টিমারটি। মসৃণ রেলিঙে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে থু স্টিমারের বাঁশি আর প্রপেলার ঘোরানোর ঘর্ঘর আওয়াজ শুনছিল। মনের অস্থিরতা কিছুতেই চেপে রাখতে পারছিল না সে।

স্টিমারের পেছনে ঢেউয়ের মাথার ওপর সাদা ডানাওয়ালা সী-গাল্‌গুলো ঘুরপাক খাচ্ছিল। থু-এর সামনেই মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে বাই থো পাহাড় যার নামের অর্থ কবিতা! ওই পাহাড়ের পেছনেই তাদের আপন শহর। স্টীমারটা ভীষণ ধীরে এগোচ্ছিল। ইঞ্জিনের আওয়াজ ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হয়ে একেবারে থেমে গেল। নোঙর ফেলার আওয়াজ শোনা গেল। এক থোকা হঙ বি ফল হাতে নিয়ে যাত্রীদের অনুসরণ করল থু। স্টিমার থেকে নামবার পথের অসংখ্য জনস্রোত যেন গ্রাস করে নিল তাকে। অগণিত নাবিকের বিস্মিত দৃষ্টির মাঝে সে স্টিমারের পাশে একটি ছোট ডিঙিতে লাফিয়ে পড়ে অন্য যাত্রীদের ছাড়িয়ে এগিয়ে গেল।

তারপর সে ধীরে ধীরে এগিয়ে যেতে লাগল বাঁধানো অল্প-ঢালু একটি রাস্তা ধরে। পথের ঢালের ওপর দাঁড়িয়ে থাকা কিছু ছেলেমেয়ে তাকে বিশেষভাবে নিরীক্ষণ করছিল। তারা হয়তো তার সৈনিক ডাক্তারের পোশাক দেখে আকৃষ্ট হয়েছিল আর তা না হলে তার হাতেই ওই হঙ্ বি-এর গুচ্ছ থু-এর ওপর তাদের আকর্ষণ বাড়িয়ে তুলেছিল। ছেলেমেয়েদের দলের মধ্যে সবচেয়ে ছোট একটি বাচ্চার হাতে কয়েকটি ফল দিয়ে সে আরো জোরে হাঁটতে লাগল। ছোট্ট শহরটি বদলায় নি একেবারেই। ওখানকার ছাইরঙা টালিছাওয়া সমুদ্রের দিকে মুখ ফেরানো ছোট ছোট বাড়িগুলোকে এলোমেলোভাবে বুকে নিয়ে পথ আজও পাহাড়ের কোল পর্যন্ত বিস্তৃত হয়ে রয়েছে।

সরু পাঁচের রাস্তা ঝক্‌ঝক্ করছে। তার দুপাশের ফুটপাথগুলো থু চলে যাবার আগেই সবুজ পাথর দিয়ে বাঁধানো হয়েছিল। কিন্তু কোন গাছ ছিল না পথের দুধারে। বনবিভাগ সম্প্রতি কিছু ঝাউ গাছ লাগিয়েছে কিন্তু সেগুলো এখনও নেহাৎই শিশু। এ গাছ বড় হতে অনেক সময় লাগে। সেই অতীতের হাওয়া বইছে এখনো এই শহরে। রাস্তার দুধারে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে

আছে উঁচু একটি সেতু। থু দেখল তার মাথার ওপর দিয়ে স্টীলের টুপিপরা খনি শ্রমিকরা তাড়াতাড়ি এগিয়ে যাচ্ছে সেতু বেয়ে। পার্কের এক কোণে চা খাচ্ছে, সিগারেট কিনছে নাবিকেরা। থু যখন তাদের সামনে দিয়ে চলে এলো তখন তারা নিজেদের মধ্যে কথোপকথন থামিয়ে ফিরে চাইল তার দিকে। তাদের সেই চাহনিতে কোন পুরোনো বন্ধুর সঙ্গে নতুন করে দেখা হওয়ার আভাস ফুটে উঠল। কিছু কিছু লোক স্থানীয় কিন্তু এতদিন আগে তারা এখান থেকে চলে গেছে যে থু কিম্বা তারা কেউই পরস্পরকে চিনতে পারল না। পার্কটা পেরিয়ে সে একটা সিমেন্ট বাঁধানো রাস্তায় পড়ল—যে রাস্তাটা ঘুরে ঘুরে সমুদ্রের কিনারা দিয়ে চলে গেছে অনেক দূরে। সমুদ্রের জলের লবণ কণায় ক্ষতবিক্ষত হয়ে গেছে রাস্তার ধারের বেঞ্চিগুলো। কিছু মরচেধরা তার পড়ে আছে এখানে-ওখানে। সমুদ্রবেলাকে ধীরে ছুঁয়ে যাওয়া স্বচ্ছনীল জলে রঙিন 'ডোরাডে' মাছের ঝাঁক পরস্পরকে তাড়া করে ছুটে বেড়াচ্ছে। ওখানে মেহগিনি গাছের ধরনের এক রকমের গাছের একটা ঝোপ ছিল আর সেই ঝোপের পিছনেই ছিল মিউনিসিপ্যাল লাইব্রেরী। আগে বিশেষ করে সেই সব দিনগুলোতে যখনই থু-কে তার স্কুলের কোন রচনা লিখতে হতো সে প্রায়ই এই লাইব্রেরীতে আসত। তার মনে পড়ে নাম্‌কায়ো-এর লেখা একটি উপন্যাসের কথা। বইটিতে লেখকের একটি ছবি ছিল—কাঁধে স্ট্র্যাপ্‌ওলা সার্ট পরা এক বিষণ্ণ মুখ, কপালের ওপর পড়ে থাকা একগুচ্ছ চুল। "সৈনিকদের সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক মাসিক পত্রিকা"র গোছা পড়ে থাকত লাইব্রেরীর টেবিলের ওপর। থু অনেক ছোট গল্পও পড়েছে আর ভেবেছে লেখকদের অন্তর্দৃষ্টি কত গভীর।

লাইব্রেরীর ছাদটি ভেঙে গেছে বোমার আঘাতে। ছাদের টালিগুলো ছড়িয়ে পড়ে আছে এখানে-সেখানে। পুরোনো দিনের কারিগররাই আবার নতুন টালি দিয়ে সাজাচ্ছে ছাদটিকে। টালিগুলো তারা যখন একে অন্যের হাতে ছুঁড়ে দিচ্ছে তখন তাজা লাল রঙের ঝিলিক ছড়াচ্ছে। থু ভেবেছিল এত দীর্ঘদিন ধরে মার্কিনী বোমার আঘাতে বিধ্বস্ত তার পুরোনো শহরটাকে সে হয়তো আর চিনতেই পারবে না। কিন্তু এই শান্ত শহরের পরিবেশ আর পরিপূর্ণতা, এখানকার মানুষগুলো কিছুই বদলে যায় নি।

ছ'বছর আগে এক সুন্দর বিকেলে সে স্টিমারে উঠেছিল হ্যানয় গিয়ে বিশ্ব-বিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষা দেবার জন্যে। সেদিনও সে আজকের মতোই দানাঙ-এর মন্থর গতিতে অধৈর্য হয়ে উঠেছিল। ভারী স্টিমারটা পিছনে ধোঁয়ার কুণ্ডলী ছাড়ছিল। এর বেশ কিছুদিন পরে তার মা ও ভাই দেশ ছেড়ে সরে এসেছিল হোয়ান্ বোন্তে। তখন তাদের দেখতে যাবার জন্যে উয়োঙ্‌-বি

এর রাস্তা ধরেছিল থ্‌। তাই সেই পুরোনো স্টিমার চড়ার বা তাদের শহরের ধুলোয়ভরা রাস্তা দিয়ে হাঁটার কোন সুযোগই পায় নি সে। কিন্তু সে জানত যে সেই পুরোনো স্টিমারটি অবিরল বোমাবর্ষণের মধ্যেও হা লঙ্‌-এর উপকূল ধরে এক ক্লান্তিহীন পারাপার চালিয়ে যাচ্ছে। তার এই পারাপারে তখন ঘটেছিল শুধু সময়ের কিছু পরিবর্তন। তাকে যাত্রা শুরু করতে হতো রাতের অন্ধকারে আরো ধীরে কিন্তু সর্বদাই সে ভিড়ত গিয়ে বন্দরে। হন্‌ গাই-এর শ্রমিকরাও তাদের কাজ করে চলেছিল একই ভাবে, কয়লার গাড়িগুলো কয়লা বোঝাই হয়ে পৌঁছত বন্দরে আর রাত্রে সমুদ্রের দিকে চেয়ে চোখ পিট্‌পিট্‌ করত আলোগুলো। এই শহরটা কয়লা শ্রমিকদের আর সেই কথা মনে করেই বেশ গর্ববোধ করত থ্‌। স্টিমার তার কাছে শুধুমাত্র স্টিমার নয় এর ওপর এক মধুর মমত্ববোধ ছিল তার মনে। বেশ কয়েক বছর ধরে ডাক্তারী পড়তে সে যখন অনেক দূরে চলে গিয়েছিল এই মমতা আরো বেড়ে উঠেছে তখন তার মনে। সে এখন সেনাবাহিনীর ডাক্তার। ফ্রণ্টে যাওয়ার আগে বাড়ির লোকদের সংগে দেখা করতে এসেছে সে।

পাহাড়ের মাঝামাঝি দাঁড়িয়ে থাকা তার নিজের বাড়িতে পৌঁছবার আগে একটা কয়লার গুদাম পার হতে হলো থ্‌-কে। ওখানেই গড়ে ওঠা অন্য সব বাড়িগুলোর মতো তাদের বাড়িও রাস্তার দিকে মুখ করা পাথরের দেওয়াল আর খড়ের চাল। অন্য বাড়িগুলোর মতো একটি ছোট্ট বাঁধানো উঠোনও আছে এ বাড়িতে যার বুকে গাঁথা আছে অজস্র বোমার টুকরো। ঐ সারা চত্বরে খনির দিকে মুখ ফিরিয়ে কেবলমাত্র দাঁড়িয়ে আছে গীর্জাটি। বোমার আঘাতে ভেঙে গেছে তার বড় গম্বুজটা।

থ্‌ বাড়িতে এসে পৌঁছল যখন বাড়ির লোকেরা তখন সবে খেতে বসেছে। একটা বড় ট্রের সামনে বসে তার মা নিপুণ হাতে ভাত বাড়ছেন। মার হাত-দুটিতে কোন আবরণ নেই ট্রে থেকে উঠে আসা গরম ধোঁয়ায় মুখখান তাঁর রক্তিম। ট্রের একপাশে রাখা ভাতের বাটিতে একরাশ সাদা তুলোর মতো ভাত। ভাতের সুন্দর গন্ধে থ্‌ অনুভব করল একটা আগ্রাসী ক্ষুধা। ট্রেতে ছিল চিংড়ি মাছের ঝোল, শাকের তরকারী। পারিবারিক পরিবেশ তার ক্ষিদেকে আরো বাড়িয়ে দিল। তার ছোট ভাই ট্রের ওপরই নিজের ভাতের বাটিটা বসিয়ে হাওয়া করে জুড়িয়ে নিচ্ছে ভাতটা। ঘামে ভিজে উঠেছে তার কপাল। স্থির উদ্বিগ্নদৃষ্টিতে সে দেখল থ্‌-কে। তার সপ্রশ্ন এই দৃষ্টিটি দেখলে মাঝে মাঝে মনে হয় সে যেন বেশ একজন বয়স্ক লোক হয়ে উঠেছে।

সে বললো—"আমি যা অনুমান করেছিলাম তার অনেক আগেই পৌঁছে গেছ তুমি। এই কয়েকদিন আগেই আমি চিঠিটা পেয়েছি। ছুটির পর

তুমি কি সেনাবাহিনীতে কাজ করতে যাচ্ছ, না হ্যানয়ে থেকে আরো পড়াশুনো করবে এখন ?"

"আমি খুব তাড়াতাড়ি চলে যাব।"

মা প্রশ্ন করলেন—"আমাদের সংগে ক'দিন থাকবে তুমি" ?

"পরশুই আমাকে চলে যেতে হবে মা। হ্যানয়ে থাকতে হবে একদিন তারপরই যে জায়গা থেকে আমাদের নির্দিষ্ট কাজের জায়গায় পাঠাবে সেখানে চলে যেতে হবে।"

"হ্যানয়ে থাকবে মাত্র একদিন ? কেন, এত তাড়া কিসের ?" টিপ্পনি কেটে প্রশ্ন করলো ভাই।

"হ্যাঁ, কিন্তু হাসছ কেন ?"

"হাসির কারণ হলো তুমি ফিরে আসাতে খুব খুশি হয়েছি আমি। আর দ্বিতীয় কারণটা হলো, এই খনি অঞ্চলের চেয়ে হ্যানয় বোধহয় তোমার কাছে বেশি প্রিয়।"

"তুমি কি সত্যিই তাই মনে কর ? বলতে গেলে হ্যানয়ে তো পড়াশুনা করবার জন্যেই আমি কাটিয়েছি কয়েকটা বছর। তার আগে তো যুদ্ধের জন্যে আমাদের স্কুলটাকে নিয়ে গিয়েছিল অরণ্যের রাজ্যে।"

"থাক, সবই জানি আমি। মা বলেছে আমাকে যে এবারে তুমি তোমার সব কিছু বোঝাপড়া শেষ করে নেবে।"

মা চেঁচিয়ে উঠলেন—"আমি আবার একথা কখন বললাম ? তোমার দিদি নিজের দায়িত্ব নিজে নেবার মতো যথেষ্ট বড় হয়েছে।"

মেয়ের দৃষ্টি এড়াবার জন্যে মা ঝোল পরিবেশনে মন দিলেন। টেবিল থেকে প্রথমেই উঠে পড়ল থু।

মা ছেলেকে বললেন—"তোমার দিদি এসেছে বলে আজ রাতটা তুমি বাড়ি থাক।"

"কিন্তু তা হয় না মা—আমাকে খনিতে যেতেই হবে। আমাদের সুড়ঙ্গের মধ্যে কাজকরা কি দেখতে চাও থু ?"

"না, আমি বাড়িতে মার কাছেই থাকি।"

"আমার ফিরতে রাত হবে। একটু বেশি করে ভাত আমার জন্যে বাঁচিয়ে রাখতে ভুলো না কিন্তু।"

"ঠিক আছে। তোমার যদি কোন মেয়ে-বন্ধু থাকে তো নেমন্তন্ন করে এনো।"

"ওহো। মেয়েরা তো শুধু খনির ওপরে কাজ করে। খনির ভেতরে কাজ করে তো শুধু শক্ত সমর্থ পুরুষ।"

তরুণটি খনি শ্রমিকদের বিশেষ ধরনের আলোটি তুলে নিয়ে বেরিয়ে পড়ল। তার বাদামী রঙের প্ল্যাস্টিকের টুপিতে ঝকঝক্ করছে একটা স্লোগান—"মাতৃভূমির জন্যে আরো কয়লা তোল"। তার ভাইয়ের গড়ন আর হাঁটাচলা ঠিক তার বাবার মতো। চওড়া কাঁধের পেশীগুলো তার জামার ভেতর দিয়েও ফুটে উঠেছে। সে মাথা নিচু করে হেঁটে যাচ্ছে—তার কালো ঘাড়টি দেখতে পাচ্ছে থু।

সেদিন অনেক রাত পর্যন্ত মার সংগে গল্প করল সে। শরতের হাওয়ায় তাদের কাছে বয়ে নিয়ে এলো সমুদ্রের লবণ গন্ধ। মশাগুলো বিশ্রাম নিতে বসলো আলোর ওপর। মা ও মেয়ের কথোপকথনটা ছিল খুব ধীর গম্ভীর আর গুরুত্বপূর্ণ; কিন্তু মা আর মেয়ের মধ্যে আলোচনার ভঙ্গিটা এমন কেন? মা কি প্রথম দর্শনেই বুঝেছিলেন যে তাঁর কন্যাটি এখন এক পরিণত যুবতী হয়ে উঠেছে? এটা দেখে মার মন আনন্দে ভরে উঠেছিল কিন্তু তবুও সে আনন্দের মধ্যেও মিশেছিল তাঁর মনের একটি ছোট্ট ব্যথা। একটি সত্তা, এতদিন যা শুধু পরিপূর্ণভাবে মাকে নির্ভর করে বেঁচেছিল, আজ সেই হয়ে উঠেছে এক স্বনির্ভর স্বাধীন সত্তা। মেয়ের গায়ের রঙ তার মায়ের মতোই শ্যামলা। কিন্তু মার জীবনের ছোট বয়েসের আনন্দের ও দুঃখের অনুভূতি-গুলোর সংগে তাঁর এই মেয়ের এখনকার অনুভূতিগুলো সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতির।

মা হঠাৎ জিজ্ঞেস করলেন—"হা, কেন আমাকে দু'ছত্র চিঠি লেখ না? আমি কি তোমার মা নই?"

থু উত্তর দিল—"ও আমাকে যা যা চিঠি লেখে প্রত্যেকটাতেই তোমাদের কথা লেখে। আমি সেগুলো তামাকে দেখাতে একটু ইতস্তত করছি।"

"আমি ভেবেছিলাম তুমি তোয়ানকেই বিয়ে করবে। ভাল কথা, সে এখন কোথায় আছে?"

একটা জোর আওয়াজ ভেসে এলো দূর থেকে। সমুদ্র কি এগিয়ে আসছে—না আকাশ তো পরিষ্কার। দূরে পাহাড়ের কোল ঘেঁসে ঐ যে গাড়ির সারি যাচ্ছে এ তারই আওয়াজ। রাত গভীর পরিব্যাপ্ত। বহুদিন আগের এক ঝড়ের কাহিনী মনে পড়ল থু-এর। সেটা জুলাই মাস—এ সময় সমুদ্র প্রায়ই উত্তাল হয়ে ওঠে উঁচু ঢেউয়ের মালা বুকে নিয়ে। এ সময়ে যেদিন যেদিন ঝড় প্রবল হয়ে ওঠে স্টিমারগুলো তখন কেবিনের ঢাকা নামিয়ে দিয়ে ছুটে যায় বন্দরের দিকে। ফেনায় সাদা হয়ে যায় সমুদ্র মোহনা, ঢেউগুলো উঁচু হতে হতে আছড়ে পড়ে পথের ওপর। সেইরকম একটি দিনে তোয়ান তাকে গলদা চিংড়ি ধরবার জন্যে বাই ছে-তে নিয়ে গিয়েছিল। তারা সবেমাত্র দুটি

কাঁকড়া ধরেছে আর সঙ্গে সঙ্গে নামল প্রচণ্ড ঝড়বৃষ্টি। তারা দুজনেই একেবারে ভিজে সপ্‌সপে হয়ে গেল। তোয়ান তাকে নিয়ে ছুটে একটা কাফেতে আশ্রয় নিল। সেখানে কয়েকজন খনিশ্রমিক বৃষ্টির ছাটে ভেজা জামাকাপড় পরে কফি খেতে খেতে দেও নাই-এর ধারের রাস্তায় সদ্য ঘটে যাওয়া দুর্ঘটনার বিষয়ে আলোচনা করছিল। তাদের বলতে থাকা কাহিনী থেকে থু এটুকু জানতে পারল যে সেদিন সকালে খাড়ায়ের মুখে ওঠবার সময় একটি ট্রাক রাস্তা থেকে গড়িয়ে খাদের মধ্যে পড়ে গেছে। ঘন কুয়াশার জন্যে ট্রাক চালক রাস্তার ধারের নিশানাগুলো দেখতে পায় নি। আলোচনা যারা করছিল, সব ব্যাপারটা সঠিকভাবে জানে না, তারাও কিছুটা অনুমান করে নিচ্ছে। থু কিন্তু দারুণ বিপদের আশঙ্কা বুকে নিয়ে বৃষ্টির মধ্যেই তার মাকে খুঁজতে ছুটেছিল। ঠিক তার আগের দিনই তার বাবা ট্রাক নিয়ে বাড়ি এসেছিলেন আর আজই খুব ভোরে বাড়ির সকলে যখন ঘুমোচ্ছে তখন বেরিয়ে পড়েছিলেন দেও নাই-এর দিকে।

তোয়ান তার সঙ্গে আসছিল ছিপ আর কাঁকড়া দুটো হাতে ঝুলিয়ে। ছুটন্ত থু-এর গায়ে ছিটকে পড়ছিল গর্তে জমে থাকা জলগুলো। মাথার ওপর ভেঙে পড়ছিল বাজ আর বিদ্যুৎ। বয়স্ক লোকেরা ঝড়ের সময় রেল লাইন দিয়ে রাস্তা পার হতে বারণ করেন সব সময়ে, কিন্তু থু-এর বাড়ি পৌঁছবার এটাই যে সব চেয়ে কাছের রাস্তা। সে যে বাবার জন্যে ভীষণ চিন্তিত। বাড়ি পৌঁছে সে দেখল তার মা ছোট ভাইয়ের কাঁধে মাথা রেখে চৌকাঠের সামনে বসে আছেন। সে তাঁর কোলের ওপর আছড়ে পড়ল। এক জার জলের ভেতর কাঁকড়া দুটোকে রেখে দিয়ে থু-কে কিছু না বলে চলে গেলো তোয়ান।

সেবারের ছুটির পর স্কুলে ফিরে গিয়ে থু প্রথম সারিতে বসত। তোয়ান-এর কাছ থেকে সে প্রায়ই ছোট ছোট চার ভাঁজওয়ালা কাগজের টুকরো পেত। এগুলো বেঞ্চের তলা দিয়ে গলিয়ে তার হাতে এসে পৌঁছত। এই কাগজগুলোতে বিশ্রী হাতের অক্ষরে লেখা থাকত "ক্লাশের ছুটির পর আমাদের বাড়ি এস, তোমার সঙ্গে কথা আছে আমার মার" অথবা-"আজ রাতে গুগ্‌লীর ঝোল খেতে এসো।" সবে তখন তারা নবম শ্রেণীতে পড়ে, ভবিষ্যতের কথা ভাবতে শুরু করে নি। পরের বছর তোয়ান সাহিত্যে ও অঙ্কে পাশ করতে পারল না। থু আরো পড়াশুনা করবার জন্য হ্যানয় গেল যে বছর তোয়ান সেই বছরেই খনির শ্রমিক হলো। হ্যানয় যাওয়ার আগে তারা দুজনে ধীরে ধীরে পাশাপাশি হাঁটছিল। থু-এর হৃদয় বিদায় ব্যথায় ভারাক্রান্ত আর তোয়ান-এর হৃদয়ে প্রবল উচ্ছ্বাস। "একজন খনির শ্রমিক-

বাব্বাঃ। এটা একটা দারুণ সম্মানের কাজ তাই না?" এই সব বলে সে ঠাট্টা করতে লাগল সারাক্ষণ।

যখন তারা পরস্পর বিচ্ছিন্ন হলো তোয়ান তখন লাফিয়ে একটা গাড়িতে উঠল আর থু বন্দরের পথ ধরল। পিছন ফিরে তোয়ান-কে হাত নেড়ে তাকে বিদায় জানাতে দেখে তার চোখে জল এসে গেল। এর কয়েক সপ্তাহ পরেই শত্রুপক্ষ খনিতে বোমা ফেললো। থু খবর পেল তোয়ান সেনাদলে যোগ দিয়েছে। এর প্রায় চার বছর হ্যানয়ে থু হাসপাতালে কাজে ব্যস্ত ছিল। সেই সময়ে তার সংগে দেখা করতে এসেছিল তোয়ান। সে সবেমাত্র গোলন্দাজবাহিনীর অফিসার হয়েছে এবং তক্ষুণি তাকে বাড়ির আত্মীয়স্বজনদের সংগে দেখা না করেই ফ্রন্টে চলে যেতে হচ্ছে। সাদা গাউনপরা অবস্থায় থু-এর কাজের ঘরেই তোয়ান-কে অভ্যর্থনা জানিয়েছিল সে। সেদিন ভীষণ চুপচাপ লাগছিল তোয়ান-কে আর যখনি সে কথা বলতে যাচ্ছিল তার আগে মুখে হাত চাপা দিয়ে একটু কেশে নিচ্ছিলো। থু-এর দিকে আয়ত স্বচ্ছ চোখে চেয়েছিল তোয়ান। একটা ফড়িং এসে বসল তার ইস্পাতের হেলমেটের ওপর। তোয়ান কিন্তু নির্বিকার। সেটাকে একবারও তাড়াতে চেষ্টা করল না সে। থু মনে করেছিল কিছুক্ষণ তার কাছে থাকবে তোয়ান। কিন্তু ফড়িংটা যেই লাফিয়ে উঠে দেওয়ালের ওপর বসল সংগে সংগেই উঠে পড়ল তোয়ান। থু-এর সংগে নিস্পৃহভাবে করমর্দন করে বললো সে—"আমি এখন চলি"। সে নত চোখে মৃদুস্বরে প্রশ্ন করল—"আবার আসবে তো তুমি"?

তোয়ান বললো—"যদি কখনও সুযোগ হয় তো আসব। অবশ্য তার সম্ভাবনা খুবই কম।"

সেই রাতেই ট্রামে ধাক্কা লেগে আহত একটি লোককে এ্যাম্বুলেন্সে করে হাসপাতালে নিয়ে এল। তার অস্ত্রোপচারে সহযোগিতা করবার জন্যে নিযুক্ত করা হলো থু-কে। কিন্তু তখন সে তোয়ান-এর এই ক্ষণিক আগমনের ঘটনায় অত্যন্ত বিচলিত হয়েছিল। ইস্পাতের টুপিতে বসা ফড়িং-এর ছবিটা বারবার ভেসে উঠেছে তার মনে। নিজের মনের সংগে অনেক যুদ্ধ করে তবে সে তাকে নিজের বশে আনতে পেরেছিল। সে বহুকষ্টে অস্ত্রোপচারের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত মনঃসংযোগ করতে পেরেছিল। আহত লোকটিকে প্লাস্টার করার পরে সার্জেন তাকে একান্তে ডেকে বলেছিলেন—"থু আজ তোমাকে বড্ড অন্যমনস্ক মনে হচ্ছে। আমি সাঁড়াশি চাইতে কাঁচি এগিয়ে দিচ্ছিলে কেন তুমি? কেবলমাত্র প্রথম বর্ষের ছাত্রছাত্রীরাই জানত এর কারণ। সার্জেনটি যুবক। এক বিভাগীয় প্রধানের পুত্র সে। থু-এর থেকে মাত্র

পাঁচ-ছ' বছরের বড়। কিন্তু তার মাথার চুলের রঙ ধূসর আর বয়েসের চেয়ে অনেক বড় দেখায় তাকে।

মায়ের পাশে বসে নিজেকে ধিক্কার দিয়ে হাসল থু। কারণ যতবারই তার মনে কোনো স্মৃতির আলোড়ন জাগছে ততোবারই সেই একমাথা ধূসর চুলেভরা সার্জেনের ছবিটা ভেসে উঠছে। থু যেদিন উপলব্ধি করল যে সে ভালোবেসে ফেলেছে তাকে সেও ঠিক তখনই আরোগ্যনিষ্ঠ হয়ে এলো তারই কাছে।

সার্জেনের সঙ্গে পরিচয়ের আগে এই ভালবাসার অনুভূতি আর কখনও জাগে নি থু-এর মনে।

তার মা প্রশ্ন করলেন—"তুমি ফিরে গেলে খুব সম্ভব তার সঙ্গে দেখা হবে তোমার।"

"কার সঙ্গে মা? তোয়ান্-এর সঙ্গে না হা-র সঙ্গে?"

"তোয়ান্-এর সঙ্গে।"

"আমি ওদের দুজনের সঙ্গেই দেখা করতে চাই। কিন্তু দেখা হওয়া খুবই মুশকিল। আমরা আজ পরস্পরের থেকে এত দূরে আছি যে…।"

"আমি এখন বেশ বুঝতে পারছি তুমি ভালোবেসেছ হা-কেই।"

"তোয়ান্-এর ওপর আমার অসীম শ্রদ্ধা আছে কিন্তু হা-কে ভালোবাসি আমি।"

সেই রাতে মা'র পাশে শুয়ে সে স্বপ্ন দেখল হা-কে। স্বপ্নগুলো একই ধরনের হয় প্রায়ই। থু লুকিয়ে রেখেছে হা-এর চশমা। সেই চশমার খোঁজে তার কাছে এগিয়ে আসছে হা। থু তার অবাধ্য চুলগুলোতে হাত বুলোবার জন্যে তাকে আরো এগিয়ে আসতে দিচ্ছে, তারপর ফিরিয়ে দিচ্ছে হা-এর চশমা। এরপর হা কঠিনস্বরে বলবে—"তুমি একটা ছোট যাদুকরী"। এটা শুনলেই ক্ষেপে উঠবে থু। ঘুম ভেঙে গেলেই অনুশোচনায় ভরে যায় থু-এর মন। কেন হা-এর সঙ্গে সে আরো আরো অনেক কথা বলে নি তখন।

পরের দিন সকাল বেলা সে তার মার সঙ্গে বাচ্ছাদের স্কুল দেখতে গেল। আগে এখানে কাজ করত সে। ঝাউ গাছের জঙ্গলের মধ্যে টালি ছাওয়া তিন খুপরীওয়ালা কাঠের বাড়ি একটা।

থু তার চারপাশে ঘেঁসে আসা বাচ্ছাদের স্বাস্থ্যোজ্জ্বল দুষ্টুমিভরা মুখগুলো দেখতে লাগল। বছর পাঁচেকের একটি ছোট মেয়ে ভয়ে ভয়ে তার হাতটা একটু ধরেই হঠাৎ ছেড়ে দিল। থু ফিরে চাইতেই সে তার হাত দুটি দিয়ে চোখে চাপা দিল। গোলাপী পদ্মকলির মতো আঙুলের ফাঁক দিয়ে সবুজের আভা মেশানো তার নীল চোখ দুটি দেখতে পেল থু। তাকে

কোলে তুলে তার পুরন্ত গালে চুমু খেল সে। চকিতে মনে জাগল ঠিক এমনই একটি মেয়ের মা হওয়ার বাসনা। থু জিজ্ঞেস করল "তোমার নাম কি মামণি" ?

"আমি আমার মায়ের ছোট্ট মেই।"

ডানায় চাকাচাকা দাগওয়ালা একঝাঁক শ্যামাপাখি বসে আছে ঝাউগাছ-গুলোর ওপর। ছোট মেয়েটির হাত ধরে আস্তে আস্তে হাঁটতে লাগল থু। একরাশ শুকনো ঝরাপাতার ওপর পা দিয়ে একটু ভয় পেল ছোট মেয়েটি। মৃদু হাওয়ায় ভেসে এলো সরস কাঠের গন্ধ, ঝাউয়ের মর্মর শব্দ, পাখির গান আর শিশুর কলকাকলি।

নিচে দেখা যাচ্ছে শহরটি, বাড়িগুলোর লালের আভা, কয়লাগুদোমের কালোর ছোপ আর এলোমেলো দাঁড়িয়ে থাকা গাছের সবুজ শোভা। অনেক দূরে ঐ যে দিগন্ত বিস্তৃত ঘন নীল যার লক্ষ্য অসীমতা—সেই সমুদ্রকেও দেখা যাচ্ছে। দা নাঙ জাহাজটি বন্দর ছেড়ে যাত্রা শুরু করছে। তার বাঁশীর আওয়াজ গভীরস্বরে ঘুরে ঘুরে যেন শেষ বিদায় জানাচ্ছে মাটিকে। ডকের ওপর ক্রেনগুলো যেন হাত তুলে তাকে সেলাম জানাচ্ছে শেষবারের মতো।

ঠিক সেই ক্ষণেই অধ্যাপক তার বাড়িতে দাঁড়িয়েছিলেন একটি আঁকা ছবির দিকে বিষন্নদৃষ্টিতে চেয়ে। তার ছেলে হা-এর আঁকা একটি নিসর্গচিত্র এটি। এতে আঁকা আছে বিকেলবেলার এক শান্ত পথের ছবি। পথের দুধারে ছড়িয়ে আছে শুকনো কলার পাতা, পথের শেষের সীমানা, দ্বিধা বিভক্ত একটি চৌকি-দারের থানা। একটি ছোট রেস্তোঁরার সামনে জাতীয় প্রতিরক্ষা বাহিনীর সেনা হাতকাটা সুতীর জামা পরে লাফিয়ে ঘোড়ায় চড়ছে তার পেছনে একদল কৌতুহলী শিশু। ছবির এককোণে লেখা—"বিন্‌কা-র জেটি।"

ছবিটা অধ্যাপকের কাছে এক অন্য জগতের স্মৃতির গবাক্ষ। প্রথম প্রতিরোধের সময়কার পুরোনো সেই দিনগুলো একটুও মুছে যায় নি তাঁর মন থেকে এখনও। তাঁর মনে পড়ে যায় এই রাস্তার পেছনে তখন ছিল বাঁশবন। যুদ্ধের সময় হ্যানয় থেকে হাসপাতালটাকে সরিয়ে আনা হয়েছিল ওখানেই। বনের ধারে একটি ছোট কুটিরে ছিল তাঁর সাজানো সংসার। রোজ সকালে দুপুরে খাবার ভাত একটা কাপড়ের থলিতে ভরে নিয়ে হাসপাতালে যেতেন তিনি। বাড়ির দায়িত্ব ছিল তাঁর স্ত্রীর ওপর। আশপাশের গ্রাম থেকে তিনি অনেক শাকশব্জীর গাছ নিয়ে আসতেন, তাঁর স্ত্রী সারাদিন ধরে সেগুলোর পরিচর্যা করতেন। হা গ্রামের অন্য ছেলেদের সংগে জংগলে ছুটোছুটি করত। শুকনো পাতা স্তূপাকার করে তাতে আগুন ধরাতো।

আঁকার একটা প্রশিক্ষণের কাজে প্রতিরোধবাহিনীর সাহিত্য ও

কলা-বিভাগের একদল চিত্রকর সেই সময়ে ওখানে এসেছিলেন। তাদের দক্ষ বাক্‌পটু ছাত্রের দল অধ্যাপকের কাছেও এসেছিল কয়েকদিন হাসপাতালের ছবি আঁকার অনুমতি নিতে। তারা কথা দিয়েছিল এরজন্যে হাসপাতালের ভেতরে কোনো গোলমাল বা ঝামেলা হবে না। হাসপাতাল থেকে বাড়ি ফিরে অধ্যাপক একদিন দেখলেন তাঁর স্ত্রী ও ছেলে বাইরে বেরোবার পোশাক পরছে।

স্ত্রীকে জিজ্ঞেস করলেন—"ছেলেকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছ?"

"তোমার ছেলে আঁকার স্টুডিওটা একবার দেখতে চায়। ওখানে এখন কিছু প্রচারমূলক ছবির একটা প্রদর্শনী হচ্ছে। আর আমিও একটু যাচ্ছি ওখানকার কোনো কাজে আমি কিছু সাহায্য করতে পারি কিনা দেখতে।"

"খুব ভাল কথা। আঁকার মাধ্যমেও প্রতিরোধের কাজ খুব ভালোই এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যায়।"

অধ্যাপক প্রথমে ভেবেছিলেন স্ত্রী বোধ হয় এই জঙ্গলে বাস করার একঘেয়েমি কাটারার জন্যে স্টুডিও দেখতে যাচ্ছেন। কিন্তু কিছুদিন পরেই তিনি দেখলেন কি অপরিসীম উদ্যমে তাঁর স্ত্রী কাজ করে চলেছেন স্টুডিওতে। তিনি খড়কুটো লেগে থাকা নতুন ভারী ভারী কাগজের গোছা বয়ে নিয়ে আসতেন বাড়িতে। হা আর তিনি দুজনে মিলে তারপর সেগুলোকে আঠা দিয়ে জুড়ে এমন রকমারী মজার ঢঙে সেগুলোকে খাড়া করে দাঁড় করাতেন যাতে আঁকিয়েদের সেগুলো দিয়ে ব্যাঙ্গাত্মক প্রাচীরপত্র আঁকার খুব সুবিধে হতো। পরের বার আবার প্রদর্শনীর সময় তিনি তাঁর স্বামী আর ছেলে দুজনকেই প্রদর্শনী দেখাতে নিয়ে গিয়েছিলেন।

কিছুদিন পরে এই স্টুডিওটিকে একটি ভ্রাম্যমান স্টুডিওতে রূপান্তরিত করে এটিকে লো নদীর অপরপারে একটি প্রদর্শনীর আয়োজন করার বিষয়ে প্রস্তাব নেওয়া হলো। অধ্যাপকের স্ত্রীও সেই সময় ওদের সংগে যেতে চাইলেন। তাঁর স্ত্রী বললেন—"আমি সব নেতাদের সংগে কথা বলেছি। তাঁরা বললেন এ ব্যাপারে তোমার অনুমতির দরকার। ওখানে করবার মতো কাজ আছে প্রচুর আর আমি হা-কেও সংগে নিয়ে যাব ভাবছি।"

"তুমি কিছুদিনের জন্যে নিশ্চয়ই যেতে পার তবে আমার মনে হয় হা আমার সংগে থাকুক। আমি ওকে খানিকটা পড়াতে পারব।"

একথা শোনা মাত্র তাঁর স্ত্রীর চোখ দুটো উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল। স্বতঃস্ফূর্ত আনন্দে ভরে উঠেছিল তাঁর মুখ। খুব শান্ত আর মধুর স্বভাবের মেয়ে ছিলেন তিনি। খুব খুশি হয়েছিলেন অধ্যাপক নিজেও কেননা সাংসারিক ব্যাপারেও এখন বেশ স্বাচ্ছন্দ্য অনুভব করলেন তিনি এই

ভেবে যে তার স্ত্রীও প্রতিরোধ শাখায় এতদিনে নিজের স্থান করে নিতে পারলেন।

এরই এক মাস পরে খবর পেলেন ফরাসী বিমান আক্রমণে মারা গেছেন তাঁর স্ত্রী এবং সেই সংগে আরো কয়েকজন চিত্রকর। তাঁদের আঁকা সব ছবিগুলো পুড়ে ছাই হয়ে গেছে লেলিহান অগ্নিশিখায়।

বিভাগীয় প্রধানের সম্মান পেলেন অধ্যাপক। হা-ও বৃত্তি পেয়ে চীনের কুইলিন্-এ পড়তে গেল।

হ্যানয়ে শান্তি ফিরে আসার পর আবার বাবার সংগে দেখা হলো ছেলের। ততদিনে হা এক প্রাণবন্ত যুবক হয়ে উঠেছে। বাবা আর ছেলে হা ভবিষ্যতে পেশার বিষয় নিয়ে পরস্পর পরস্পরের সংগে তর্ক করত। বাবার আশা তার ছেলে ভবিষ্যতে হবে খুব বড় ডাক্তার আর চিকিৎসাবিজ্ঞানের একজন দামী মানুষ। সারাজীবন তিনি যে চিকিৎসাশাস্ত্র নিয়ে কাটালেন তার বিষয়ে বোঝাতে চাইতেন ছেলেকে। তাঁর ধারণা চিকিৎসাশাস্ত্রে এখনও অনেক অনাবিষ্কৃত রত্ন লুকোনো আছে আগামী দিনের ডাক্তারদের জন্যে। হৃৎপিণ্ড, মস্তিষ্ক, মানুষের দীর্ঘজীবন লাভের বিষয়ে অনেক কিছুই এখনও অজানা রয়ে গেছে। তাঁর মতে জ্ঞানীব্যক্তিদের সব থেকে বড় আদর্শ হলো মানব কল্যাণের জন্য অবিরাম অনুসন্ধান করে যাওয়া আর নতুনতর সৃষ্টির প্রচেষ্টা চালানো।

ছেলে তাঁর সব কথা খুব মন দিয়ে শুনত কিন্তু তাতে তার নিজের মতের কোনো পরিবর্তন হতো না। সে বলত—"আমি যে কোনো বিষয় নিয়ে পড়তে পারি—ইচ্ছে করলে তোমার মতো ডাক্তারীও পড়তে পারি।"

বাবার মুখ শুকিয়ে যেত, সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে চাইতেন ছেলের দিকে। "তুমি বলতে চাও বিশেষ বিষয় নিয়ে পড়বার কোন ঝোঁকই নেই তোমার?"

হা শান্তস্বরে বলত—"বাবা, কলাবিভাগে পড়তে চাই আমি। অবশ্য আমি জানি যে তার জন্যে চাই দীর্ঘসময় আর অসীম ধৈর্য। কিন্তু আমি জানি এই বিভাগে আমি এক সত্যিকারের প্রয়োজনীয় ব্যক্তি হয়ে উঠতে পারব।"

"ও কলাবিভাগ!" অধ্যাপক এমনস্বরে বলেছিলেন যে তিনি যেন তাঁর ছেলের মনের দুর্বলতম স্থানটি আবিষ্কার করে ফেলেছেন। "হ্যাঁ, সত্যি এটাও বিজ্ঞানের মতোই দামী কাজ। কিন্তু সত্যি কথা বলতে কি এ মানুষকে বড় ঠকায়। অনেক লোক এর আরাধনায় নিজেদের প্রাণশক্তির অযথা অপচয় করেছে। এই বিষয়ে অনেকেই চেষ্টাটাকে প্রতিভার সংগে গোলমাল করে ফেলে। প্রতিভা হলো খুব বিরল বস্তু। তোমার যদি প্রতিভা না থাকে তাহলে তোমার চেষ্টা একেবারেই ব্যর্থ হবে আর তখন তুমি বুঝতে পারবে যে জীবনে তুমি ভুল পথ বেছেছ।"

"যদি তাই সত্যি হয় তাহলে এটা তোমাকেও স্বীকার করতে হবে যে চিকিৎসাবিজ্ঞান নিয়ে পড়লেও আমি ভাল ডাক্তার নাও হতে পারি।"

যুক্তি দিয়ে কিছুতেই তাঁর ছেলেকে বুঝিয়ে উঠতে পারতেন না অধ্যাপক। হা শেষ পর্যন্ত চিকিৎসা শাস্ত্র নিয়েই পড়তে গেল। কিন্তু এ ব্যাপারে তার মধ্যে যতটা আগ্রহ দেখতে পেলে তার বাবা খুশি হতেন ঠিক ততখানি আগ্রহ নিয়ে গেল না সে। তার ছাত্রাবাসের ঘরে ডাক্তারী বইগুলোর পাশেই সাজানো থাকত কলাবিষয়ক অভিধান। আঁকার তুলিগুলোর পাশেই থাকত স্টেথিস্কোপ। প্যাভ্‌লভ-এর ছবির পাশেই ছিল পিকাসো আর রেপাইন্‌। ঘরের মধ্যে এক-নজর দেখলেই বোঝা যেত হা তার কর্মশক্তি খরচ করে চলেছে রকমারী বিষয়ে। তবু তার বুদ্ধি আর ইচ্ছাশক্তির জোরে ডাক্তারী পরীক্ষায় বেশ ভালভাবেই উত্তীর্ণ হলো সে। উচ্চস্থান অধিকার করে সে বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতার কাজে যোগ দিল। কিন্তু তবুও চারুকলার ওপর তার সুতীব্র ভালবাসা এতটুকু কমল না বরং বেড়ে উঠল আরো। সে তার প্রথম মাসের মাইনের টাকাটা খরচ করল কাগজ আর রং কিনে। অসীম আকুলতায় অনেক কিছু আঁকতো সে। এখন সে যে তার জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত তার স্থিরতার কোনো লক্ষণই দেখা গেল না তার মধ্যে। অধ্যাপক জানতেন যে ছেলের হৃদয়ের এই আকুলতা তার জীবনকে এক প্রতিকূলতার দিকে ঠেলে দিচ্ছে। তবু অধ্যাপক যেদিন কাগজে দেখলেন যে যেসব ডাক্তাররা স্বেচ্ছায় ফ্রণ্টে যোগ দিতে যাচ্ছে তাদের দলে তাঁর ছেলেরও নাম রয়েছে তখন তিনি একটুও অবাক হলেন না। কারণ মনে মনে একমাত্র তিনিই জানতেন যে এই নিষ্ঠাবান ডাক্তারটির হৃদয় হলো এক কলাকারের হৃদয়। আর তার হৃদয়ের এই অনুভূতি থেকেই জ্বলে উঠেছে এই পবিত্র অগ্নিশিখা।

ফ্রণ্টে যোগ দেওয়ার আগে বিন্‌কা-তে এসে মায়ের পবিত্র সমাধিটি আর একবার দেখবার আর বাবার সঙ্গে দেখা করবার জন্যে ছুটি পেল্ হা। বাঁশের জঙ্গল সাফ করবার জন্যে লোকেরা এসেছে বদ্বীপ থেকে। পুরোনো আঁকার স্টুডিওর ভিত্তির আঙিনার ধারে একটি নতুন খাল কাটা হয়েছে। আর এর খুব কাছেই একটা পাম্পিং স্টেশন গড়ে তোলার কাজ সবেমাত্র শেষ হয়েছে। দারিদ্র্য নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে দেশ থেকে। স্টিমারঘাটা পর্যন্ত সারা রাস্তায় গাছের সারি। বাড়িতে ফেরার পর সে তার ইজেলের সামনে ঘণ্টার পর ঘণ্টা দাঁড়িয়ে অতীতের দেখা সেই পুরোনো রাস্তাটিকে কল্পনা আর আবেগের রঙে রাঙিয়ে ফুটিয়ে তুলত ছবিতে। ছেলের সঙ্গে বাবার রুচির পার্থক্য থাকলেও এই ছবিটি বিচলিত করে তুলত ওঁকে।

কয়েকদিন পরে কাঠকয়লা দিয়ে আঁকা একটি মেয়ের ছবি তার বাবার দৃষ্টি আকর্ষণ করল। তিনি অনেকক্ষণ ধরে ছেলের ঘরে দাঁড়িয়ে দেখতে লাগলেন

ছবিটা। মেয়েটি খুব সুন্দরী না হলেও অত্যন্ত বুদ্ধিদীপ্ত, আর গভীরতাময় তার মুখ। ছবিটি খুব ভাল লাগল তাঁর আর সেই সঙ্গে মনে মনে তাঁর ছেলের সৌন্দর্যবোধের তারিফ না করে থাকতে পারলেন না। কেন না এই সৌন্দর্য সাধারণের দৃষ্টিবোধ্য সৌন্দর্য নয়।

পরে একদিন তাঁর বিভাগ থেকে অন্যত্র সরিয়ে নিয়ে যাওয়া কিছু লোকের সঙ্গে তিনি যখন দেখা করতে গিয়েছিলেন সেখানে একটি মেয়ের মুখ দেখে তাঁর এতো পরিচিত মনে হলো যে তিনি ভাবলেন একে যেন কোথায় দেখেছি আগে। তিনি তাকে প্রশ্ন করলেন—"কোন অঞ্চলের মেয়ে তুমি?"

"আমি কয়লাখনি অঞ্চলের মেয়ে।" তাকে অপ্রস্তুতিতে না ফেলে তার সঙ্গে করমর্দন করে সরে গেলেন অধ্যাপক। কারণ এখনি তার মনে পড়ল এই মেয়েটিরই ছবি এঁকে নিজের ঘরে টাঙিয়ে রেখেছে তাঁর ছেলে। তিনি এখন বুঝতে পারলেন কেন মেয়েটির ছবি আঁকবার সময় কাঠকয়লার ব্যবহার করেছে হা।

হা চলে যাবার সময় তার জিনিসপত্রের সঙ্গে মেয়েটির ছবিটি নিয়ে গেছে। কিন্তু মায়ের সমাধি দেখে ফেরার পর সে যে পুরোনো রাস্তার ছবিটি এঁকেছিল সেটা সে টাঙিয়ে রেখে গেছে তার বাবার ঘরে। যাবার আগে হা তাঁকে বলেছিল—"বাবা তুমি যদি অনুমতি দাও তো কাল আমি থু-কে আনব তোমার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেবার জন্যে। আমার আশা তাকে তুমি তোমার নিজের মেয়ে বলেই মনে করবে।"

আবেগ আর উদ্বেগে ভরা ছিল অধ্যাপকের পরদিনের প্রতীক্ষা। ছেলে তাঁর ফ্রণ্টে চলে যাচ্ছে আবার একটি সংসারও গড়ে তুলতে চলেছে। তাঁর এই ছোট্ট সংসারে আর একটি নতুন মেয়ে এসে নিজেকে জড়িত করে এটিকে আরো বড় আর উজ্জ্বল করে তুলবে। নিজেকে প্রশ্ন করলেন তিনি, ছেলে যদি তাঁর প্রতিভাবান কলাকারই হতো তাহলে কি হ'তো তিনি জানেন না। কিন্তু হা-এর উন্মেষিত জীবন, তার স্বপ্ন, তার অনুভূতি—এগুলো কি এখনই তার হৃদয়ের মহত্ত্বের আর তার নির্দিষ্ট পথের নিশ্চয়তার পরিচয় জানাচ্ছে না? ঘরের এধার থেকে ওধার পায়চারী করছিলেন বাবা। দরজাটা খুলে গেল—তাঁর ছেলের পেছনে একটি মেয়েকে দেখতে পেলেন তিনি। দরজার কাছে এগিয়ে আবেগমথিত ভগ্নস্বরে তিনি বললেন—"ঘরে এসো মা।"

হ্যাঙ্‌কো স্টেশনের প্ল্যাটফর্মটাকে মনে হচ্ছিল বড্ড ছোট। সরু লাইনের ওপর রেলগাড়ির ইঞ্জিনগুলো হাঁপিয়ে হাঁপিয়ে ধোঁয়া ছাড়ছিল। একসঙ্গে বাজছে ট্রেনের বাঁশীগুলো। ইস্পাতে ইস্পাতে ঠোকর লেগে কানে প্রায় তালা ধরিয়ে দিচ্ছে। তবুও সমবেত জনতা আরো মুখর, তারা একে অপরের সঙ্গে

কথা বলছে, জানাচ্ছে বিদায় সম্ভাষণ। গাড়ির কামরাগুলো আর পর্বতপ্রমাণ মাল নিয়ে দুটি ট্রেন—একটি দক্ষিণে আর অন্যটি উত্তরে যাওয়ার জন্যে প্রস্তুত হয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

দক্ষিণে যাবার ট্রেনের শেষ কামরায় জানলার ধারে বসে আছে থু। অন্য কামরাগুলোর মতো এটাও সৈন্য বোঝাই। সবুজ ক্যানভাসের পোশাক পরে গাদাগাদি হয়ে বসবার আসনগুলোতে বসে আছে তারা। প্রবেশ পথের মুখেও দাঁড়িয়ে আছে অনেকে আর সকলেই ঝুঁকে পড়ে চেয়ে আছে বাইরের দিকে। টুপি নাড়িয়ে মুখে হাত ঠেকিয়ে তারা সকলেই বিদায় সম্ভাষণ জানাচ্ছে। অন্য ট্রেনটির জানলা দিয়ে উঁকি দিচ্ছে কিছু তরুণ মুখ। দেখা যাচ্ছে কিছু সুঠাম বাহু। এক ট্রেন থেকে অন্য ট্রেনের দিকে ফুলের তোড়া ছোঁড়া-ছুঁড়ি চলছে। ওরা সব ছাত্র, বিদেশে চলেছে পড়তে। দুটি ট্রেনের মাঝখানে ঠাসাঠাসি করে দাঁড়িয়ে আছে জনতা। এদের মধ্যে কেউ কেউ হয়তো দু'চার দিনের মধ্যেই আবার বিদেশে চলে যাবে, তবু তারা এসেছে আজ যারা চলে যাচ্ছে তাদের বিদায় জানাতে। দক্ষিণের যাত্রী আর উত্তরের যাত্রীদলের বাবা-মা আর বন্ধু-বান্ধবদের মধ্যে কে যে কার এখন আর তা আলাদা করে বোঝবার উপায় নেই। আবেগের সঙ্গে করমর্দন করছে সবাই। সকলের মুখেই বিজ্ঞ হাসি, সবাই প্রায় একই উপদেশ দিচ্ছে। তাদের সকলেরই চোখেমুখে ফুটে আছে সৌহাদ্র্য আর বিশ্বাস। এ যেন একটি বৃহৎ পরিবারের বিদায় নেওয়া। আর এই বৃহৎ পরিবারের ভেতর দিয়ে যেন গোটা একটি দেশ যে দেশের কাজ বহুধা বিভক্ত কিছু কিছু তাৎক্ষণিক আবার কিছু ভবিষ্যতের জন্যে সঞ্চিত হয়ে আছে, তারই এক সামগ্রিক রূপ ফুটে উঠেছে এখানে।

থু ঝুঁকে পড়ে প্রথম দিকের কামরাগুলো দেখতে চেষ্টা করছে। তার মানসিক অধৈর্যতা ক্রমশঃ উদ্বিগ্নতায় পরিণত হতে চলেছে। অধ্যাপক যদি আরো দেরি করে আসেন তাহলে কি হবে? তিনি তাকে লিখেছিলেন—"একটি বিভাগীয় সভায় যেতে হবে আমাকে। এটা শেষ হলেই আমি তোমাকে বিদায় জানাতে স্টেশনে যাব।"

আগের দিন রাতে থু-এর জন্যে তিনি যে লেখা কাগজটি রেখেছিলেন সেটিকে হাতে নিয়ে সে শুয়েছিল অনেকক্ষণ। তার মন ছিল অশান্ত। হাইফঙ্ থেকে অনেক দেরিতে এসেছে সে সেদিনই রাতে। বন্যার সময় তখন, তাই তার এত দেরি। ট্রেনটা প্রত্যেক সেতু খুব ধীরে ধীরে পার হচ্ছিল। অধ্যাপক তার জন্যে সারাদিন অপেক্ষা করেছিলেন। রাত্রেও অনেকক্ষণ জেগে বসেছিলেন তারই সঙ্গে কথা বলবার জন্যে। দীর্ঘপথ যাত্রার ক্লান্তিতে থু-এর ঘুম এলো না, উঠে পড়ল সে। তার জন্যে রেখে দেওয়া অধ্যাপকের লেখাটা আবার

পড়ল। হঠাৎ খুব ভয় পেল সে। হয়তো তাঁকে বিদায় সম্ভাষণ না জানিয়েই চলে যেতে হবে থু-কে। সে তাঁর শোবার ঘরে ঢুকে আয়নার ভেতর দিয়ে তাঁর অযত্ন-রক্ষিত এলোমেলো-চুলে-ঢাকা ঘুমন্ত মুখখানি দেখল। ঘরের দেওয়ালে টাঙানো সেই ছবিটিতেও সে দেখল আঁকা রয়েছে সরু জনশূন্য রাস্তার ওপর সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসছে। কিন্তু ঠিক তখন বাইরে এক সম্পূর্ণ আলাদা ছবি। প্রাতঃসূর্যের রশ্মি ছড়িয়ে পড়েছে তখন চারিদিকে। গাছের ডালে লাফাচ্ছে একটা পাখি। বারান্দার নিচে নিজেদের মধ্যে কলকল করছে শিশুরা। থু-কে এখনি চলে যেতে হবে এ বাড়ি ছেড়ে। পিঠের বোঁচকাটা নিয়ে স্টেশনের দিকে এগিয়ে চলা জনস্রোতের সংগে, কমরেডদের সংগে হাত মিলিয়ে এগোতে হবে তাকে। আর তারপরই শুরু হবে এক দীর্ঘ যাত্রা... ।

"কমরেড"। চিন্তায় ছেদ পড়ল তার। "তুমি যাঁকে খুঁজছিলে ওই বৃদ্ধ ভদ্রলোকটিই কি তিনি? তারই সামনে এতক্ষণ নীরব হয়ে বসে থাকা একটি বলিষ্ঠ সেনা দূরে তাড়াতাড়ি করে এগিয়ে আসা একটি মূর্তির দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করল তার। হ্যাঁ, অধ্যাপকই আসছেন।

থু বললো—"বাবা, আমি এখানে।"

অধ্যাপক বললেন—"তাড়াতাড়িতে স্টেশনে ঢোকবার গেটের টিকিটটা কিনতে পারি নি বলে আমাকে গেটের কাছে আটকেছিল ওরা।"

"হন্ গাই-এ আমার মাকে লেখা একটা চিঠি আপনার ডেস্কে রেখে এসেছি আমি। আমার হয়ে ওটা পাঠাতে ভুলে যাবেন না কিন্তু।"

"ঠিক আছে আজকেই আমি আমার চিঠির সংগে ওটা পাঠিয়ে দেব।"

"বাবা আসি, আপনি খুব সাবধানে থাকবেন।"

ঝাঁকুনি দিল ট্রেনটা। নিচে দাঁড়িয়ে থাকা লোকদের সংগে করমর্দন করবার জন্যে যুবা-বৃদ্ধা সকলেরই সবল বাহুগুলো প্রসারিত হলো। মনে হলো কোন ইঞ্জিন নয় যেন প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে থাকা জনসমুদ্রই এগিয়ে নিয়ে চলেছে ট্রেনটিকে।

ভুলে নেই

লী খুব বিচলিত হয়ে পড়ল। এইমাত্র তার পালিত পুত্রকে দেখতে যাবার ছাড়পত্র পেয়েছে সে। তাদের গ্রামীণ সামরিক স্বেচ্ছাবাহিনী কেন্দ্রে প্রতিটি কমরেডের কাছেও খবরটি পেঁাছে গেছে। তারা সবাই লী-এর চার-পাশে কলরবমুখর! সবাই তাকে ভরিয়ে দিচ্ছে নানান উপহারে। সকলে চায় শিশুটিকে কিছু দিতে। কেউ দিচ্ছে তার দৈনিক বরাদ্দ দুধের অংশ —সে মনে করে ওই দুধের প্রয়োজন তার থেকে শিশুটিরই বেশি। আবার কেউবা দিচ্ছে জ্বলন্ত রকেট থেকে পাওয়া প্যারাসুটের টুকরো—শিশুর বাসস্থানের ছাতটুকু আরো ভালো করে ঢেকে দেবার জন্যে, কেননা আবহাওয়া বড় দুর্যোগপূর্ণ, শিশুকে রক্ষা করতে হবে তো!

অভিভূত লী কৃতজ্ঞতার ভাষা হারিয়ে মুখখানি ভরিয়ে তোলে মধুর হাসিতে। পাছে ভুল করে উপহারের একটি কণাও সে ফেলে যায় সেই ভয়ে সে তাড়াতাড়ি সেগুলিকে গুছিয়ে নিল তার ঝুলিতে। বন্ধুদের বিদায় জানিয়ে অটোমেটিক্‌টি সঙ্গে নিয়ে সে ধীরে নেমে গেল সংযোজনী পথে! যাত্রা শুরু করল সেই ছোট্ট গ্রামের দিকে যেখানে শিশুকে রেখে এসেছে সে নিরাপত্তার জন্যে।

সামনের বিস্তীর্ণ গ্রামপ্রান্তর জনশূন্য, পরিত্যক্ত। বি-৫২ বিমানগুলির এলোমেলো বোমাবর্ষণে ঝাঁঝরা হয়ে গেছে উত্তরের সামরিক সীমারেখা। সেখানে এখন নেই আর কোন পথের নিশানা, গ্রামের চিহ্ন, শস্যের শ্যামলিমা। পায়ে চলা পথগুলো, ছোট ছোট ঝোপঝাড়ও নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে! বিস্তীর্ণ নরম মাটির বুকে ফুটে উঠেছে বোমার আঘাতে সৃষ্ট অজস্র চোঙাকৃতি গহ্বরে। কোমল মাটি রূপান্তরিত হয়েছে শুকনো ধূলিকণায়, যার রঙ রক্তের মতো লাল। মাঝে কয়েকটি ধোঁয়ারকুণ্ডলী সদ্য নিভে যাওয়া আগুনও বিস্ফো-রণের ইঙ্গিত জানাচ্ছে।

পথে একটিও লোক নেই। বহুদিন আগেই জীবনের সব চিহ্নই মিলিয়ে গেছে মাটির অতলে। শত্রুবিমান ধ্বংস করতে বা ক্ষেতখামারে কাজ করে সোনালী ফসল তুলতে আজ আর কেউই বাইরে আসে না তার মাটির নীচের নিরাপদ আশ্রয় ছেড়ে। দিনের আলোয় এতো দূরপথে যাত্রা শুরু করার

আগেই লী উপলব্ধি করছে তার বিপদের ঝুঁকি তবুও তার অদম্য মাতৃস্নেহের কাছে এতবড় ঝুঁকিকেও মনে হয়েছে অতি তুচ্ছ। তাকে কাতর করে তুলেছে তার পুত্রের অদর্শন। এ সেই সন্তান যাকে সে রক্ষা করেছে নিজের প্রাণ বিপন্ন করে।

এই শিশুকেই শান্ত করতে সে সকলের সামনে ত্যাগ করেছে অষ্টাদশী কুমারী জীবনের শ্রেষ্ঠ আভরণ তার মধুর লজ্জা। লী-এর কোনদিন কোন পুরুষ বন্ধুর সংগেই ঘনিষ্ঠতা ছিল না। সে ছিল আনাঘ্রাতা ফুলের মতোই পবিত্র। এই অশান্ত শিশুটিকেই শান্ত করতে সে তার ক্ষুদ্র অধরে তুলে দিয়েছিল আপন স্তনাগ্রভাগ। তবুও কি সে জয়ী হবে না তার মাতৃত্বের পরীক্ষায়।

তার সংগ্রামী বন্ধুরাও তাকে চেনে জননীরূপেই। প্রতিবার ছেলেকে দেখে ফেরার পর সবাই তার কাছে আসে ছেলের গল্প শুনতে। তাকেও আবার অনেকের কাছে গিয়ে তার ছেলের হাসির, আধফোটা কাকলীর, এলোমেলো পা ফেলে হাঁটার নিখুঁত বর্ণনা দিতে হয়। শুধু একবার তার ছেলের কথা বলতে গিয়ে একটু বেশি উচ্ছ্বসিত হয়ে লী বলে ফেলেছিল তার ছেলে ঠিক তারই মতো দেখতে হয়েছে। সেবারে বেচারাকে বহুদিন ধরে তার কমরেডদের হাসিঠাট্টা সহ্য করতে হয়েছিল। তারা বলেছিল—"তুমিই শিশুটির জন্ম দিয়েছ মনে হচ্ছে। ওটা বোধহয় তোমার হাতের তলা থেকে বেরিয়েছে।"

ঘটনাটি সেই সময়কার—মার্কিনীরা যখন দক্ষিণাংশে ঘেরাও অভিযান চালাচ্ছিল। এই অভিযান তাদের ভাষায় ছিল "অসামরিক দক্ষিণাঞ্চলের শুদ্ধিকরণ"। তারা এটিই উত্তরাঞ্চল আক্রমণের প্রস্তুতিপর্ব বলেই ধরে নিয়েছিল। খুব ভোরে বুলডোজার ও প্রচুর অস্ত্রসহ তাদের হেলিকপ্টারে নামিয়ে দেওয়া হয়েছিল সেখানে। তারা গ্রামের লোকগুলোকে তাড়িয়ে নিয়ে গিয়েছিল হেলিকপ্টারে। ভেঙে গুঁড়িয়ে দিয়েছিল সবকিছু। ক্ষেত খামার, বাড়িঘর, ফুলের বাগান কিছুই বাদ দেয় নি। যে হতভাগ্যেরা সামান্য বাধা দিতে গিয়েছিল তারা নিঃশেষিত হয়েছিল অটোমেটিকের গুলিতে।

গ্রামের বেশীকিছু লোক উত্তরে পালিয়ে আসতে পেরেছিল তবুও। বেন হাই নদীর ধারে তারা জমা হয়েছিল। নৌকায় করে, সাঁতার কেটে, জলে ভেসে থাকা কাঠকুটো আঁকড়ে ধরে কিম্বা পায়ে হেঁটে যে ভাবেই হোক তারা চেষ্টা করেছিল নদীটা পার হতে। এদের রুখতে মার্কিনীরা কিন্তু শুধু স্থলপথেই সৈন্যবাহিনী পাঠিয়ে নিশ্চিন্ত হয় নি। তাদের বোমারু বিমানবাহিনী, সমুদ্র থেকে সপ্তম নৌবহর ও বিখ্যাত "ম্যাক্‌নামারা লাইন"-এর ধারে নানান অগ্নেয়াস্ত্রে সুসজ্জিত সেনাবাহিনী নিয়ে একাজে হাত লাগিয়েছিল।

এদের ওপর প্রচণ্ড শব্দে বর্ষিত হলো একই সঙ্গে শত্রুর মেসিনগান থেকে সহস্র গুলি আর ওপর থেকে অজস্র বোমা! আগ্রাসী অগ্নিপ্রবাহ গ্রাস করে নিল হতভাগ্য বাস্তুহারাদের। মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ল অনেকেই।

সেদিন নদীর উত্তরতীর পাহারা দিচ্ছিল লী। সে চিৎকার করে উঠল —"মার্কিনীরা আমাদের দেশবাসীদের মেরে ফেলেছে! এস, আমরা তাদের রক্ষা করি।"

তখনি আদেশ দেওয়া হলো—"বাস্তুহারাদের পিছনে সরিয়ে নিয়ে যাও, আর যে যার জায়গায় দাঁড়িয়ে গুলি চালাও।"

সঙ্গে সঙ্গে তারা সমস্ত মেসিনগানের আধার ও অ্যান্টি-এয়ারক্রাফটের অংশগুলোর আচ্ছাদন সরিয়ে সেগুলোকে সম্পূর্ণ উন্মুক্ত করে দিয়েছিল। শত্রুদের নিক্ষিপ্ত বোমা, রকেট আর গোলাগুলো যাতে বর্ষিত হয় ওই অস্ত্রগুলোরই ওপর! শুরু হলো প্রচণ্ড অগ্নিবর্ষণ, আর এই কৌশলই তাদের সুযোগ এনে দিল উদ্বাস্তুদের কাছে পেঁাছে ওদের সাহায্য করতে।

লী যখন নদীর উত্তরতীর অবধি এগিয়ে গিয়েছিল তখন তার কানে ভেসে এলো একটি ছোট্ট শিশুর কান্না। সে নীচু হয়ে দেখল একটি মাস পাঁচেকের বাচ্ছা তার সাংঘাতিকভাবে আহত মায়ের পাশে পড়ে কাঁদছে। লী ক্ষিপ্রহাতে বাচ্ছাটাকে তুলে নিয়ে কাছেই একটা পরিত্যক্ত আশ্রয়শিবিরে তাকে রেখে তাড়াতাড়ি চলে আসছিল। বাচ্ছাটা ভীষণ কাঁদতে শুরু করল। লী-কে বাধ্য হয়ে আবার ফিরে আসতে হলো তার কাছে। বাচ্চাটাকে একটি "কামোফ্লাজ" কাপড়ের টুকরাতে জড়িয়ে পিঠে তুলে তার কোমরবন্ধনী দিয়ে ভালো করে বেঁধে নিয়ে লী ফিরে এলো আবার যুদ্ধক্ষেত্রে।

দু'ঘণ্টা ধরে চললো সেই প্রচণ্ড যুদ্ধ। সমস্তক্ষণ শিশুটি রইল লী-এর পিঠে। একটা রকেটের টুকেরো এসে লাগল লী-এর—কাঁধে রক্তধারা ছড়িয়ে পড়ল শিশুর গায়ে। তবু শিশুকে অক্ষত দেখে লী নিজেকে ভাগ্যবতী মনে করল।

বাচ্ছাটা অনেকক্ষণ ধরে কেঁদে ক্লান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে। জীবনে প্রথম ছোট্ট শিশুর নরম উষ্ণ স্পর্শ লী-কে এনে দিল এক অবর্ণনীয় মাতৃত্বের অনুভূতি। নিজের জীবন বিপন্ন করে আপন সন্তানের প্রাণ রক্ষা করে যে —লী সেই চিরন্তনী মা!

যুদ্ধ থেমে যাবার পর একটা অস্ত্রের আধারে শিশুটিকে বন্ধন মুক্ত করে শুইয়ে দিল লী। হঠাৎ জেগে ওঠে শিশু আহত পশুর মতো আর্তনাদ করে উঠল!

ভীত লী তাকে আস্তে করে দোল দিতে লাগল। "বাবা আমার চুপ কর—"অন্তত তোমার মায়ের মুখ চেয়ে চুপ কর।"

ধুলো আর বারুদের ছাইমাখা কমরেডদের মুখগুলি থেকে বেরিয়ে এলো অট্টহাসি। "লী নিজের ছেলে পেয়েছে" বললো একজন। "ওকে পুষ্যি নিয়ে নাও"—বলেছিল অপর একজন।

তাদের হঠাৎ খেয়াল হলো বাচ্ছাটাকে সারাদিন কিছুই খাওয়ানো হয় নি! হুড়োহুড়ি পড়ে গেল শিবিরে। সবাই ছুটলো দুধের খোঁজে। তাদের মনে হলো—এটা খুবই অন্যায় যেসব মায়েদের বুকে দুধ ছিল নিরাপদ আশ্রয়ে তাদের সকলকেই সরিয়ে দেওয়া হয়েছে।

তারা বললো "লী তুমিই এর মা—তাই তোমাকেই ওকে শান্ত করতে হবে।" এক তরুণ যুবকের মুখে শোনা গেল স্তন্যপানের সংকেত। আরক্তিম হয়ে উঠল লী-এর মুখ। বিমূঢ় অসহায় লী দেওয়ালের দিকে ফিরে উন্মুক্ত করল তার বুকের আবরণ, শিশুর মুখে তুলে দিল আপন স্তন। শিশু সাগ্রহে মুখে নিল তার স্তনাগ্রভাগ। কিন্তু তবুও মাতৃহৃদয়ের সহস্র রক্তক্ষরণেও কুমারীবক্ষে বইল না সেই অমৃত বন্যা! শিশু আবার উঠল কেঁদে!

সবাই পরস্পরের মুখের দিকে চেয়ে রইল একরাশ হতাশা নিয়ে। তাদের রান্নাঘর ভেঙে গেছে বোমার ঘায়ে। চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে আছে রান্নার সরঞ্জামগুলো। তারা কি করবে এখন? একজন মহিলা কমরেড ঠিক সেই সময়েই ফিরে এলো। সে পাশের সৈন্য শিবির থেকে সংগ্রহ করে এনেছে কিছু গুঁড়ো দুধ আর দুধ গোলবার একটা পাত্র।

আহার পরিতৃপ্ত শিশু শান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়ল আশ্রয়দাত্রী মায়ের বুকে। নরম গালে ফুটে উঠল অপূর্ব লালিমা। সবাই তার দিকে চেয়ে রইল পরম মমতায়। কলরব গেল থেমে, নিস্তব্ধতা নেমে এলো শিবিরে। ঘামে মেশা দুধের গন্ধ ভাসতে লাগল বাতাসে।

আশ্রয়কেন্দ্রের প্রবেশ পথে ঠিক তখনই এসে দাঁড়ালেন সামরিক শাখারই দলনেতা। তিনি অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলেন—"এতো জটলা কিসের? তোমরা কি জান না বি-৫২ গুলো আমাদের ওপর বোমা ফেলেছে?"

লী-এর কোলে ছোট বাচ্ছাটাকে দেখে গলাটা একটু ঝেড়ে নিয়ে তিনি ভেতরে এলেন। তাঁর অসাড় হয়ে যাওয়া হাত দুটো জামায় ঘসে তিনি বাচ্ছাটার দিকে এগিয়ে তার নরম হাতদুটো তুলে নিজের রুক্ষ মুখের ওপর একবার আলতো করে বুলিয়ে নিলেন।

লী চাইতে পারল না তার নেতার চোখের দিকে। বহু রাত জাগার ফলে কোটরাগত চোখের কোলে ফুটে উঠেছে অজস্র কালির আঁচড়। যে শিশুকে লী কোলে নিয়ে বসে আছে ঠিক তারই বয়সী সন্তানকে সদ্যোমাত্র

হারিয়েছেন তাদের নেতা। শিশুটি তার মা আর দিদির সংগে যে কুটীরে থাকতে এখন সেখানে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে বোমার আঘাতে সৃষ্ট শুধুমাত্র চোঙাকৃতি গহ্বর। কয়েকদিন পরে পিতা ফিরে এসে বসেছে তারই কিনারায়, যা একদিন ছিল তার আপন সুখগৃহ। বুকভরা তৃপ্তি নিয়ে এখানেই সে এসে বসত ক্ষেতের কাজ শেষ করে। নদীর ঠাণ্ডা হাওয়া জুড়িয়ে দিত তার ক্লান্ত দেহ, মুখে থাকত তার জ্বলন্ত সিগারেট। আবার এইখানেই সপ্তাহখানেক পরে মাত্র চারটে কারবাইন্ বুলেট দিয়ে সেই নামিয়ে এনেছিল মার্কিনী জংগীবিমান। বড় রকমের যুদ্ধের সূচনা এটাই। কেননা গ্রাম্য মিলিসিয়ায় দস্যু বিমানগুলো নামাতে ওরা ব্যবহার করত শুধু রাইফেল্।

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে নেতা বললেন—"কি গোলগাল বাচ্ছাটা! লী একে এখুনি দূরে সরিয়ে নিয়ে যাও। শত্রুদের বোমা বর্ষণ প্রবল হয়ে উঠছে। হিয়েন তোমার সংগে যাবে। বাচ্ছাটার যত্ন নিও ভাল করে।"

সেই রাতেই লী আর হিয়েন একটি সম্পূর্ণ অপরিচিত পরিবারের কাছে গিয়ে রেখে এসেছিল শিশুটিকে। প্রচণ্ড বোমাবর্ষণ সত্ত্বেও যে ক'টি পরিবার ডিন্-নি্ গ্রামটিকে ছেড়ে যায় নি তারা সকলে একত্রিত হয়ে বাস করত সেখানে। তাদের নিজেদের মধ্যে কোন আত্মীয়তা না থাকলেও যুদ্ধের সময়ে ক্ষেতের কাজে, শত্রুর মোকাবিলায় তারা মিলেমিশে পরস্পরকে সাহায্য করত।

মেয়েদুটি সেখানে পেঁছে দেখল ফেটে যাওয়া বোমার টুকরো দিয়ে তৈরি একটা তেপায়ার ওপর অনুরূপ একটি রান্নার পাত্র বসিয়ে এক বৃদ্ধা শুয়োরদের খাবার তৈরি করছে। বৃদ্ধা জিজ্ঞাসা করলো, "বাচ্ছাটাকে নিয়ে তোমরা কোথায় যাবে? হায় ভগবান! তোমাদের দেখে মনে হচ্ছে তোমরা বেনহাই নদীর ধার থেকে আসছ, তাই না?"

শিশুটি যে লী-এর আপন সন্তান নয়, সেটা বুঝতে না দিয়ে সে শুধু উত্তর দিল—"হ্যাঁ।" হিয়েন কিন্তু বললো—"আমরা এই শিশুকে তোমার কাছে রেখে যেতে চাই। দক্ষিণ দিক থেকে এসেছে বাচ্ছাটি। এর মা মারা গেছে নদীর ধারেই।"

বৃদ্ধা চিৎকার করে উঠল "কি বললে?" তৎক্ষণাৎ সে বিছানার ওপর একটি অল্প-পোড়া মাদুর বিছিয়ে দিল। একজন যুবকের দিকে ফিরে বললো, "সো দরজাটা বন্ধ করে দাও আর একটা আলো দাও আমাদের।" যুবকটি শিবিরের শেষ প্রান্তে কিছু বই খুঁজছিল। বৃদ্ধা আবার বললো, "তোমার পাহারা দেওয়ার কাজ থেকে এত তাড়াতাড়ি ফিরেছ কেন? আগুনে বোমার খোলটাতে তোমার ভাত রাখা আছে।"

আলোটা ছিল আধজ্বলা বোমার টুকরোর। এই আলোতেই বৃদ্ধা বাচ্ছাটিকে কোলে তুলে নিল। বড়মাপের পোশাকে জড়ানো ক্ষুদ্র শিশু তার ছোট্ট হাত দিয়ে দিদিমার শুভ্রকেশগুচ্ছ নিজের মুঠিতে জড়িয়ে ধরল।

বৃদ্ধা বললো, "সোনা আমার, আমার কাছেই থাক। এর জামাকাপড় কোথায়? এত কম জামাকাপড় তোমরা কেন পরিয়েছ একে?"

লী উত্তর দিল, "ওর জামা এত ছেঁড়া ছিল যে সেগুলো ফেলে দিয়েছি।"

বৃদ্ধাটি কি যেন খুঁজতে খুঁজতে শিবিরের কোণ থেকে চলে গেল আরো নীচের আশ্রয়ে নামার পথের মুখ পর্যন্ত। সেখানে গিয়ে ডাকল—"মিঃ খা, মিঃ খা!"

একটি লোককে দেখা গেল প্রবেশপথের মুখে—খালি গা, হাতে একটা বড় ছোরা।

"বাচ্ছাদের ফেলে-যাওয়া জামাকাপড় থেকে আমাকে কিছু জামাকাপড় দাও। এই বাচ্ছাটি এসেছে নদীর দক্ষিণতীর থেকে।"

কথাগুলো শুনে লোকটি কুঞ্চিত দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ শিশুটির দিকে চেয়ে একটি দীর্ঘশ্বাস ফেললো। তারপর নেমে গেল মাটির নীচে, নীরবে। লী-রা মোষগুলোর জাবরকাটার শব্দ শুনতে পাচ্ছিল। প্রবেশ পথের বাঁশের দরজার ভেতর দিয়ে হঠাৎ এক ঝলক আগুন দেখা গেল। একটা জেট্ বিমান ঘুরপাক খাচ্ছে আকাশে। দিদিমা নিজের শক্ত শরীর দিয়ে বাচ্ছাকে আড়াল করে নেমে গেল আরো নীচের নিরাপদ আশ্রয়ে। আলোর শিখা দুলে উঠল। পায়ের তলার মাটি উঠল কেঁপে। প্রচন্ড বিস্ফোরণের শব্দ শোনা গেল খুব কাছেই।

লী উঠে দাঁড়িয়ে বললে—"আমাদের এক্ষুণি চলে যেতে হবে। কমরেডরা আমাদের জন্যে অপেক্ষা করছে। বাচ্ছার খাবারের জন্যে কিছু টাকা রইলো।"

বৃদ্ধা রুষ্টস্বরে উত্তর দিল—"বাছা, টাকাটা তুমিই রেখে দাও। এ আমার নাতি, আমিই খাওয়াব একে।"

এই ভাবেই ওই ছোট্ট শিশু নতুন পরিবারের সংগে মিশে গেল। কয়েক-দিনের মধ্যেই সে হলো সকলের প্রিয়। সামান্য বিপদ সংকেত পাওয়া মাত্র যাতে তার দোলনাটা খুব তাড়াতাড়ি নীচের নিরাপদ আশ্রয়ে নামানো যায় তার জন্যে একটি কপিকল তৈরি হলো, আগ্নেয়াস্ত্রের আধার দিয়ে তৈরি করা হলো দুটি বাক্স। একটিতে থাকবে তার জামাকাপড়, অন্যটিতে থাকবে তার খাবার। ভীষণ স্বল্পভাষী বৃদ্ধ খা-এর চোখ দুটোও শিশুটিকে দেখলে উজ্জ্বল হয়ে উঠত। অদ্ভুত মানুষ ছিল এই খা। সে কখনও কোন আলোচনায় যোগ দিত না। প্রচন্ড বোমা বর্ষণের সময় সে চলে যেত খোলা জায়গায়। আর রাতেও ঘুমত তার প্রিয় মোষের পাশে শুয়ে। মোষটাও ছিল তার প্রভুর

থেকেও অদ্ভুত ! একটা মাত্র শিশু ছিল তার। অন্যটা সে হারিয়েছিল রকেটের ঘায়ে। সেই অল্পভাষী থাও বাচ্ছার জন্যে প্রত্যহ কিছু না কিছু নিয়ে আসত শিশুর হাসি ও হাত নাড়া দেখে খুশি হবার লোভে। সে কোনদিন আনত একটা ফড়িং, কখনও বুনোফুল, ছোট পোকা, আর কিছু না পেলে বোমার একটা ছোট টুকরো।

লী পালিত পুত্রকে দেখতে আসত মাসে একবার কি দু'বার। নতুন পরিবেশে শিশু কেমন সুন্দর মিশে গেছে—দেখে সে খুব খুশি হতো। ওই পরিবারের রকমারি লোক ছেলেটিকে ডাকত রকমারি নামে। কেউ উত্তরাংশের প্রচলিত ব্যাক নামে ডাকত, আবার কেউ কেউ ডাকত "নাম্" বলে—ওটা ছিল দক্ষিণাংশের প্রচলিত নাম। কেউ কেউ আবার ডাকত "চিয়ান থাংগ" বলে—যার অর্থ হলো বিজয়। পরিবারের কমবয়সী ছেলেমেয়েদের, আর লী-এর এই শেষের নামটিই ছিল বেশি পছন্দ।

এক রাখাল থাকত গাঁয়ের অন্য দিকে। তার মেয়ে রোজ এই বাচ্ছাটির সংগে খেলত। "চিয়ান থাংগ এস", বলত মেয়েটা। আর সেই ডাক শুনে বাচ্ছাটা এমন মুখ করত যে তা' দেখে পরিবারের সকলেই ভীষণ খুশি হতো।

শিবিরটা ক্রমে ক্রমে কাজ সেরে ফেরা গ্রাম্য মেয়েদের একটা বিশ্রামের জায়গা হয়ে উঠেছিল। তারা আসত নানান দিক থেকে মাটির তলার নানান সংযোজনী সুড়ংগ বেয়ে—শুধু চিয়েন থাঙ এর দোলনার পাশে শুয়ে ঘুমোবার জন্যে। দিদিমা তাদের প্রায় তাড়িয়েই দিত। "যাও সব এখান থেকে, চলে যাও। এতো ভীড়ে বাচ্ছার গরম হবে—এখানে এমনিতেই হাওয়া বড় গরম। তাছাড়া বিপদ সংকেত দিলে দল বেঁধে থাকাটাওতো নিষিদ্ধ।" কিন্তু সবই বৃথা। প্রতি রাত্রেই আস্তানাটা জমে উঠত হাসি আনন্দে।

পার্টি কমিটি অনেকবারই দিদিমাকে বলেছিল শিশুকে অন্য প্রদেশে পাঠিয়ে দিতে। দিদিমা কিন্তু ওসব কথায় কর্ণপাতও করে নি। বলেছিল—"আমি যখন বেঁচে আছি তখন আমার নাতিও বেঁচে থাকবে। মার্কিনীরা আমাদের কি করবে?"

পার্টি কমিটি জেলা শাসন পরিষদের অধিকর্ত্রীকেও বলেছিল এ ব্যাপারে কিছু ব্যবস্থা নিতে। বৃদ্ধা অধিকর্ত্রীর কথাতেও কান দেয় নি। মেয়েটি ছিল বৃদ্ধারই নাতনী। তার বাবা ফরাসী সাম্রাজ্যবাদীদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ যুদ্ধে বীরের মতো প্রাণ দিয়েছিল। বৃদ্ধা নাতনীকে কথাই বলতে দেয় নি। "তুমি কি আমাকে এতই অক্ষম ভাব যে, শিশুটিকে আমি রক্ষা করতে পারব না? তুমি যখন ছোট্ট মেয়ে ছিলে তখন থেকেই আমি প্রতিরোধ বাহিনীতে

আছি। তুমি তোমার দুর্ভাবনাগুলো তুলে রাখ তোমার সেনাবাহিনীতে রয়েছে যে কাকা আর ভাই—তাদের জন্যে।

বৃদ্ধা কিন্তু কেন যে শিশুকে অন্যত্র সরিয়ে দেবে না তার কোনো কারণ কাউকে জানায় নি। কারণটা কিন্তু ছিল খুবই যুক্তিসঙ্গত। প্রথমতঃ কি করে সে ছেড়ে থাকবে এই বাচ্ছাটাকে যে তাকে কোথাও যেতে দেখলেই কাঁদতে শুরু করে, আর তার একটু কাশি শুনতে পেলেই হেসে ওঠে? তাছাড়া শিশুকে অন্য প্রদেশে পৌঁছে দিতে হলে বৃদ্ধাকে এলোমেলো বোমাবর্ষণের আশঙ্কা বুকে নিয়ে দু'দিন ধরে পায়ে হেঁটে অতিক্রম করতে হবে রৌদ্রদগ্ধ গ্রামপ্রান্তর। আর সে নিজে চলে গেলে এই উৎপাদকবাহিনীর লোকগুলির রান্নাই বা করবে কে? যারা স্বেচ্ছাবাহিনীতে যোগ দিয়েছে তাদের রেখে-যাওয়া শুয়োরগুলোকে যত্নই বা করবে কে? আর সো, যাকে পরিবারের সকলে বেঞ্জামিন বলে ডাকে—ওকেই বা দেখবে কে? সে তো সারাদিনই ব্যস্ত আছে শত্রুর জাহাজ কিংবা বিমানের সন্ধানেই। ওর বাবা আর বোন কাজ করে ওই গ্রামের খুব কাছেই সৈন্যদলে। তাদের সঙ্গেই ও দেখা করতে পারে নি আজ তিন বছর। তার ওপর খা-র তো কিছুই খেয়াল থাকে না। ওর মোষটিকে খাইয়ে ও নিজেই খেতে ভুলে যায়। আর এই মিলিসিয়ার লোকগুলো? ওদেরতো জোটে শুধু ঠাণ্ডা ভাত। এদের সব ছেড়ে বৃদ্ধা কোথায় যাবে? কোথাও না।

সমস্তক্ষণ লী-এর মন জুড়ে ছিল তার ছেলে। পায়ে হেঁটে সে অতিক্রম করল কত পাহাড় আর উপত্যকা। একটু পরেই সে তার ছেলেকে কোলে তুলে নেবে। ছোট্ট দুটি নরম হাতে তার গলা জড়িয়ে তাকে একটি নালমাখানো চুমো দেবে শিশুটি। এতেই জুড়িয়ে যাবে পথের ক্লান্তি। তারপর সারা রাত ধরে সে নিরীক্ষণ করবে শিশুর আবাসের প্রতিটি কাঠের গুঁড়ি—প্রচণ্ড বোমাবর্ষণে সেগুলো টিকে থাকবে তো।

বেনহাই নদীর তীর থেকে অনেক দূরে তার ছেলেকে রেখে যাওয়া সেই গ্রামটিতে পৌঁছাতে চিন্তামগ্ন লী সারা বিকেলটা ধরে মাইলের পর মাইল হাঁটল। তার আরো সময় লাগল গ্রামে ঢোকবার সুড়ঙ্গপথটি খুঁজতে। পথটি বোমার আঘাতে সৃষ্ট গহ্বর নয়, এটা ছিল "নাপামে" দগ্ধ একটা বাঁশঝাড়ের ধারে।

লী যখন আবাসে পৌঁছাল তখন সন্ধ্যা ঘনিয়ে এসেছে, শিবিরে দুলছে গ্রাম্য আলো। লী সানন্দে ডাকল—"চীয়েন থাঙ! চীয়েন থাঙ!" কোন উত্তর নেই। উনুনের ধারে বোমার টুকরো থেকে তৈরি পিঁড়িতে দিদিমা বসে

আছে স্তব্ধ হয়ে। দেওয়ালে হেলান দিয়ে দাঁড়ানো সো একবার শুধু মেয়েটির দিকে মুখ তুলে চাইল, তার পরেই সে চলে গেল অটোমেটিকের বুলেট্-গুলো গুণতে। প্রবেশদ্বারের দিকে পিছন ফিরে বৃদ্ধ খা দাড়ি পাকাচ্ছিল। সে ফিরেও দেখল না নবাগত লী-এর দিকে।

লী ভীষণ ভয় পেল, তার পিঠ বেয়ে নেমে গেল ঠাণ্ডা ঘামের স্রোত। বাচ্ছাটার নিশ্চয়ই কোন অমঙ্গল ঘটেছে। সে কাঁপা গলায় বললো, "মা, আর ছেলে কোথায় ?"

জামার সামনেটা দিয়ে চোখ মুছে দিদিমা উত্তর দিল "তাকে তার মা এসে নিয়ে গেছে।"

লী চেঁচিয়ে উঠলো—"কি বলছো ?" কোঁচকানো বিছানার ওপর অটো-মেটিক্‌টা রেখে বললো—"তার মা বেঁচে আছে!"

দিদিমা মাথা নাড়ল। চোখের জলে ভেজা মুখে তার ছড়িয়ে পড়লো মধুর হাসি।

বুলেট্‌গুলো বন্ধনীতে আটকে নিয়ে সো ধীরস্বরে বলল—"শিশুটির মা নদী পার হতে গিয়ে গুলির আঘাতে অজ্ঞান হয়ে পড়েছিলো, উদ্ধাররত কম্‌রেড্‌রা তাকে দেখতে পেয়ে সুস্থ করে তোলে। বিমানধ্বংসীদলে এখন সে রান্নার কাজ করে। ওই দলের লোকেরা আমাদের কাছে তাদের যে শুয়োর-গুলো রেখে গিয়েছিল, ওর মা একদিন সেগুলো নিতে এসেছিল। বাচ্ছাটাকে দেখেই ও নিজের ছেলে বলে চিনতে পারে। ছেলেটাকেও যেই তার ওই মায়ের কাছে নিয়ে গেলুম তখন মা'কে পেয়ে সে আর আমাকে চিনতে পারল না।"

লী-এর জিভ আড়ষ্ট হয়ে গেলো। তার সব স্বপ্ন নিমেষে ভেঙে চুরমার হয়ে গেল। ছেলে বড়ো না হওয়া পর্যন্ত তাকে কোলে নিয়ে বুকে জড়িয়ে ধরার সেই অপূর্ব অনুভূতি থেকে সে চিরতরে হলো বঞ্চিত!

শহিদ-দেশ ভিন লিন-এ কোনো মা যে আবার তার হারানো শিশুকে খুঁজে পায় এটা অভাবনীয়। তবু লী কি করে ভুলবে সেই ছোট্ট সুকুমার মুখখানি, নরম গালের মিষ্টি টোল, অপূর্ব সুন্দর লাল চুলগুলো আর সেই সুডোল মুখের আধফোটা "মা" "মা" ডাক!

ক্ষণিক হতাশার পর লী প্রশ্ন করে—"তার মা কোন্ দলে কাজ করে ?"

দিদিমা উত্তর দিলো "থুয়ান-এর দলে।"

ঠোঁট কামড়ে লী জিজ্ঞেস করল "এ কি সেই ভারী সশস্ত্রবাহিনীর দলের দাড়ি-ওয়ালা থুয়ান ?—আমি জানি এই দলকে। এরা সারাক্ষণই ঘুরে বেড়ায়—থামে শুধু সেইখানেই যেখানে জোর লড়াই চলে।"

উনুন খোঁচাবার একটা শিক নিয়ে এগিয়ে যেতে যেতে দিদিমা বললো—

"আমি বলেছিলাম, সো-ও বলেছিল মেয়েটিকে তুমি আসা পর্যন্ত অন্ততঃ অপেক্ষা করতে। কিন্তু মা কেবলই কাঁদতে লাগল। এ অবস্থায় আমরা কি বলব বল? আমরা শুধু ভীষণ খুশি হয়েছি যে এক মা তার হারানো সন্তানকে আবার ফিরে পেয়েছে।"

বৃদ্ধ খা তার দড়ির গোছা ফেলে নিমেষে চলে গেল বাইরে। অটোমেটিক ভর দিয়ে বাঁশের বেড়ার গায়ে চিত্রাপিতের মতো দাঁড়িয়ে রইলো সে। একটা ভৌতিক আলোর ঝলক দেখা দিয়ে মিলিয়ে গেল। শিবিরে শুধু শূন্যতা ও শ্বাসরোধকর স্তব্ধতা! লী শুনতে পাচ্ছিল পোকায় কাঠকাটার শব্দ। বাতাসে ভাসছিল ঠাণ্ডা ভেজা-মাটির গন্ধ।

লী ফিরে যাবার জন্যে তার ঝোলাটা আর অটোমেটিক্ তুলে নিল। তার কিছু কাজ এখনও বাকি আছে। তাকে আর একবার যেতে হবে শিশুকে দেখতে, তার নরম গালে শেষবারের মতো চুম্বন এঁকে দিতে। সেই সংগে সে তার মা'র হাতে তুলে দেবে ছেলের জন্যে পাঠানো তার কমরেড্‌দের উপহার-গুলো। শিশুর জননী যার প্রতি লী ঈর্ষান্বিতা তাকে সে অনুরোধ করবে যেন মাঝে মাঝে লীকে সে চিঠি দিয়ে তার পালিতপুত্রের কুশল জানায়।

দিদিমা তাড়াতাড়ি সুড়ংগ বেয়ে নীচে নেমে গেল, তারপর ফিরে এলো একছড়া কলা নিয়ে। সে লী কে বললো—"এগুলো বাচ্ছার জন্যে নিয়ে যাও। সো তোমার সংগে যাবে, ও থুয়ান-এর থেকেও রাস্তাটা বেশি ভাল জানে।

যুবক সো নিজের নির্দিষ্ট কোণে ফিরে গিয়ে তার টুপিটা পরে আটো-মেটিক্ সংগে নিয়ে লী-এর জন্যে অপেক্ষা করতে লাগল প্রবেশ পথের ধারে।

হঠাৎ একটা নতুন চিন্তার উদয় হলো লী-এর মনে। সে বললো "মা তুমি কি মেয়েটিকে জিজ্ঞেস করেছিলে কতো তারিখে সে কিন-লিন্-এ এসেছিল?"

"কি?" আশ্চর্য হয়ে প্রশ্ন করল বৃদ্ধা।

"তুমি কি জানো ঠিক কোন্ জায়গায় সে তার বাচ্ছাকে নিয়ে নৌকো থেকে নেমেছিল?"

"হ্যাঁ, সেটা তোমাদেরই গ্রামের কাছে।"

"একে তারিখটা বলে দাওতো সো" বললে বৃদ্ধা।

সো "মে মাসের সাত তারিখে যেদিন মার্কিনীরা তাদের সেনাবাহিনীকে তুলে নিয়েছিল আর সেই সংগে ওষুধ ছড়িয়ে বিষাক্ত করে দিয়েছিল নদীর জল। আমাদের সশস্ত্রবাহিনী সেইদিনই গোলাবর্ষণ শুরু করেছিল "কর্নাটিয়েন" ও "ভক মিয়েন-এ।"

"হায় ভগবান ! ও ভুল করেছে ! এ ছেলে ওর নয় !" রুদ্ধশ্বাসে বলে গেল লী।

দিদিমা বললো—"কেন ?"

বৃদ্ধ খা আর সো সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে চেয়েছিল লী-এর দিকে।

লী আবার বললো—"ও ভুল করেছে। চীয়েন থাওকে আমি পেয়েছিলাম পাঁচ তারিখে। যেদিন মার্কিনীরা তাদের "ঘেরাও—অভিযান" শুরু করেছিল দক্ষিণে—সেদিনই !"

বৃদ্ধ খা বিস্ফারিত নেত্রে জিজ্ঞাসা করল—"তুমি আমাদের যা বললে তা সত্যি ?"

"সম্পূর্ণ সত্যি !" বললো মেয়েটি।

বৃদ্ধ খা একলাফে ফিরে গেল আপন নির্দিষ্ট কোণে। আচ্ছাদন সরিয়ে সে বার করলো একটি পুরানো ফরাসী অটোমেটিক। চিৎকার করে বললো দিদিমাকে—"আমি বাচ্ছাটাকে ফিরিয়ে আনবো।—সো আমার সংগে এস।"

বৃদ্ধা লী-কে জড়িয়ে ধরে তীক্ষ্ণস্বরে বললো—"দাঁড়াও, কিছু কোর না !"

চারজনে একে-অপরের মুখের দিকে চেয়ে রইল।

দিদিমা বললো—"তোমরা সবাই আমাকে বুঝতে চেষ্টা কর। কোনো মা'কে দ্বিতীয়বার আর সন্তানহারা কোরো না ! ছেলেটা ওকেই দিয়ে দাও !"

বৃদ্ধার স্বর রুদ্ধ হয়ে গেল। বাইরে থেকে ভেসে এলো প্রচণ্ড বিস্ফোরণের শব্দ। সবাই নিস্তব্ধ।

লী শুধু অটোমেটিকটা বিছানায় রেখে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল।

বৃদ্ধ খা অস্ত্র রেখে আবার দড়ি পাকাতে বসল। বৃদ্ধা আনাজ কাটতে লাগল। সো অটোমেটিক কাঁধে ধীর পায়ে সিঁড়িগুলো অতিক্রম করে অদৃশ্য হয়ে গেল রকেটের বিবর্ণ আলোয়।

স্ফুলিঙ্গ

জুয়ান ক্যাঙ্

এই চরম ব্যর্থতার কথা কল্পনাই করতে পারে নি। ট্র্যাম্ দুসারি সাদা চন্দন গাছের মাঝখান দিয়ে হাঁটছিল সে, মাথার ওপর তারায় ভরা স্বচ্ছ আকাশ। তরুণ গাছের সারিতে মর্মরধ্বনি জাগানো স্নিগ্ধ বাতাস তার উত্তপ্ত মাথাটাকে একটুও শীতল করতে পারল না। দূরের অস্পষ্ট পাহাড়-গুলো নক্ষত্রের আলোয় ঝক্‌মক্ করছিল।

সেদিন দুপুরেই একগাল হাসি নিয়ে থাই যখন তার সংগে দেখা করতে এসে প্রশ্ন করল—"কমরেড ডিরেক্টার তোমার একক-সংগীত শিল্পীরা আজ রাতে কোথায় অনুষ্ঠান করছে ?" এই চরম ব্যর্থতার শুরু সেখানেই।

ট্র্যাম্ উত্তর দিয়েছিল—"ইয়ুথ হলে। তুমি কি আসবে ? তোমার কি মনে হয় না মাঝে মাঝে তোমারও একটু চিত্তবিনোদনের প্রয়োজন ?"

সৌহার্দে পরিপূর্ণ ছিল ট্র্যাম্। অনেকদিন ধরে সে এই তরুণ ইঞ্জি-নিয়ারটিকে কোনো গানবাজনার আসরে আসতে দেখে নি। দিনরাত সে ব্যস্ত হয়ে আছে তার বড় ইস্পাত চুল্লী নিয়ে আর নয়তো ডুবে আছে তার বইপত্রের মধ্যে। কোনো একটা বিশেষ ধরনের গোলমাল দেখা দিয়েছে ঐ ইস্পাত চুল্লীটাতে।

থাই বলেছিল—"আমি নিশ্চয়ই আসব কারণ আমি একটা বিশেষ গান শুনতে চাই। আসলে আমি শুধু গানটাই শুনতে চাই না, একটি বিশেষ ব্যক্তির কণ্ঠে শুনতে চাই এই গান।"

"সেই বিশেষ ব্যক্তিটি কে ?"

"তুমি"।

"সত্যি" ?

"হ্যাঁ, সারা বছর ধরে আমি তোমার গলায় 'ল্যাম্' নদীর কূলে গানটি শুনি নি। দয়া করে আজ তুমি আমায় গানটা শোনাবে ?"

অতীতে থাই-এর এক পুরানো বন্ধু ভিয়েন্-এর জন্য ট্র্যাম, বহুবার গেয়েছে এই গান। ভিয়েন্ তার গ্রামের মাঝিদের এই জীবন্ত উজ্জ্বল গানটি শুনতে বড় ভালবাসত। এই গান তাকে মনে করিয়ে দিত তার গাঁয়ের কথা, এক মধুর গর্ববোধ জাগত তার মনে। ট্র্যাম্ এই গানটা অবিকল

ভিয়েনের গাঁয়ের মেয়েদের মতো করে গাইত। তার গান শুনে মনে হতো সে যেন সত্যিই তার সারাটা জীবন আপন নৌকাটি নিয়ে নদী পারাপার করে চলেছে। ট্র্যাম ভালবাসত ভিয়েনকে গভীরভাবে।

মার্কিনী বৈমানিকরা কিন্তু একটি বোমার টুকরোয় ছেদ টেনে দিয়েছে তার এই অপরিসীম ভালোবাসায়। ইস্পাত কারখানার শ্রমিকদের আবাসগুলোর ওপর প্রথম বোমা বর্ষণের সময়েই মারা গেছে ভিয়েন্। সে তখন ওখানেই শ্রমিকদের সান্ধ্য শিক্ষণ কেন্দ্রে শিক্ষকতা করত। এটা আজ থেকে এক বছর আগের ঘটনা।

ট্র্যাম্ এখনও "সক্ওয়ারকার্স মিলিসিয়ার" সদস্যা, ত্রাণ শাখার প্রধান পরিচালিকা, যুব কমিটির সভ্যা আর যুব সংস্থার নেত্রী। তারা ওকে ক্যাপায় "ক্লাব ডিরেক্টর" বলে। সান্ধ্য আনন্দ অনুষ্ঠানের আয়োজন করে ট্র্যাম্। কিন্তু অনুষ্ঠান শুরু করার আগে কয়েকটি কথা বলেই সে অদৃশ্য হয়ে যায় সব সময়। আর তাকে নদীর গান গাইতে শোনে না কেউ। কিন্তু কেন তার এই নীরবতা সেকথা জানে না কেউ।

আজ বিকেলে সেই ট্র্যাম্ই নিশ্বিধায় থাইকে উত্তর দিয়েছিল। তরুণটির চোখের দিকে পরিপূর্ণ দৃষ্টিতে চেয়ে সে ফিরে পেয়েছিল তার আত্মবিশ্বাস। আবেগমথিত স্বরে সে বলেছিল—"আমি গাইব"।

অনেক আগ্রহ নিয়ে ক্লাবে গিয়েছিল সে সেদিন সন্ধ্যায়। কিন্তু উৎসুক শ্রোতাদের সম্মুখীন হতেই যেন তার সম্বিত ফিরে এলো। কয়েক মুহূর্তের জন্যে দাঁড়াল সে, হৃদস্পন্দন হলো দ্রুততর। গান শুরু করল সে। কিন্তু আশ্চর্য, তার নিজের গলাটাই যেন মনে হলো সম্পূর্ণ মেকী! হাসতে চেষ্টা করল সে। ক্ষমা চেয়ে আবার শুরু করল তার গান। কিন্তু বৃথা চেষ্টা, তার চোখ ঝাপসা হয়ে উঠল। স্থিরভাবে দাঁড়িয়ে থাকার প্রাণপণ চেষ্টায় নিজের ঠোঁট কামড়াতে লাগল সে। সারা ঘর সাগ্রহে স্তব্ধ হয়ে আছে স্থাণুর মতো মনে হয় সেটা যেন সীমাহীন। কিন্তু এ অবস্থায় গান গাওয়া অসম্ভব। আর একবার চেষ্টা করলেই সে যে ভেঙে পড়বে কান্নায়। চকিতের জন্যে থাই-এর সংগে চোখাচোখি হলো তার। এক অপূর্ব জ্যোতিতে উদ্ভাসিত থাই-এর চোখ। সেই চোখ চাইছে তাকে উৎসাহিত করতে। সেই চোখে লেখা আছে এক নিঃশব্দ মিনতি। তবু কিছুতেই কিছু হলো না। ট্র্যাম্ অতিকষ্টে নিজের পাদুটোকে ঠিক রেখে দাঁড়িয়ে রইল। ভগ্নকণ্ঠে কোন রকমে উচ্চারণ করল—"আমাকে ক্ষমা কর"। ছুটে চলে গেল মঞ্চের পেছনে।

এখন কনসার্ট শেষ হবার পর স্খলিত পায়ে হাঁটছিল সে। পায়ের তলার মাটি যেন সরে যাচ্ছিল তার। স্বচ্ছ রাত, তারায় ভরা আকাশ, মিষ্টি

হাওয়া, দ্সারি শ্বেত চন্দনের গাছ—এই পথের সব কিছুই ভিয়েনের বেদনা বিধুর স্মৃতিটাকে আরো জীবন্ত করে তুলেছিল।

পথে একটা ছায়া পড়ল। ট্র্যাম চিনতে পারল থাইকে। সে ওখানে অনেকক্ষণ ধরে দাঁড়িয়ে আছে ট্র্যামের জন্যে। থাই ডাকল—"ট্র্যাম"। সে কাছে এলো। থাই বললো—"আমি ক্ষমা চাইছি"।

নীচু গলায় বললো ট্র্যাম—"তোমার ক্ষমা চাইবার কোনো কারণ নেই। সব দোষ আমারই।" তারা দুজন হাঁটতে লাগল। থাই নীরবে মাপা দূরত্ব বজায় রেখে হাঁটছিল। হঠাৎ সে অনর্গল কথা বলতে শুরু করল—যেন সে তার এতদিনের সঞ্চিত ভাবনা আর অনুভূতির রাশি উজাড় করে ঢেলে দিতে চাইল ট্র্যামের অন্তরে।

"তোমার সংগে দেখা করতে আসি নি আমি অনেকদিন। ট্র্যাম্ তোমাকে সান্ত্বনা জানাবার ভাষা নেই আমার। তোমার ব্যথার ভাগ নেবারও ক্ষমতা আমার নেই। কিন্তু তুমি তো জান ভিয়েনকে আমি কতটা ভালোবাসতাম। সে চলে যাওয়াতে এক বিরাট গভীর শূণ্যতাবোধ জেগেছে আমার মনে। আগে যখনই নতুন কিছু আবিষ্কার করতাম ভিয়েন বলত তোমার মাথার ভেতর নিশ্চয়ই স্ফুলিংগ আছে! কিন্তু সে তো জানত না যে তারই ঐকান্তিক সাহায্যেই ছিটকে পড়ত—এই স্ফুলিংগগুলো। আমার সব থেকে বড় অনুশোচনা এটাই যে এই ক'মাসের অসহ্য দিনগুলোকে সহনীয় করে তুলতে আমি তোমাকে কোন সাহায্যই করতে পারলুম না।"

"নিজেকেই দোষী করেছি আমি"—বললো ট্র্যাম্। "আমি ভেবেছিলাম—" কথাটা শেষ করবার মতো সাহস পেল না সে। ট্র্যাম্ ভেবেছিল ভিয়েনের মৃত্যুতে একমাত্র কাতর সে নিজেই। আজ সে উপলব্ধি করল ভিয়েনের একজন বন্ধুও সমান কাতর তার শোকে। ব্যথার সমব্যথী পেয়ে দুঃখের ভার যেন হালকা হলো কিছুটা।

কয়েক মুহূর্তের নীরবতার পর থাই মৃদুস্বরে বলতে শুরু করল—"নানা অসুবিধের সম্মুখীন হয়ে আছি আমি আজ। ভিয়েন যখন ছিল তখন আমাদের এতো সমস্যা ছিল না। এখন ওর অভাব ভীষণভাবে অনুভব করছি আমি। ওখানে অবশ্য অনেক কমরেড আছেন। তবু ভিয়েনের মতো একজন বন্ধুর অভাব সর্বদা অনুভব করি আমি, যে বন্ধুর সংগে আমার ছিল একটা পারস্পরিক বোঝাপড়ার সম্পর্ক। একমাত্র তার সংগেই আমি আমার সব সমস্যার একদম খোলাখুলি আলোচনা করতে পারতুম, শুধু তার কাছেই আমি ব্যক্ত করতে পারতুম আমার মনের গভীরতম ভাবনা চিন্তাগুলো। ভিয়েন আর আমি পরস্পর দু'জনকে সাহায্য করতুম আর উৎসাহিত করতুম পরস্পরকে।"

ট্র্যাম্‌ জিজ্ঞাসা করল, "চুল্লীতে ঠিক কি গোলমাল হয়েছে বলতো" ?

"একটা বিশেষ ধরনের বিপদ দেখা দিয়েছে। চুল্লীর ভেতর দিকের দেওয়ালের গায়ে একটা বিরাট স্ফীতি দেখা দিয়েছে।"

"কি বললে ?"

"তুমি কি কিছুই শোন নি ? এটা তো তুমি জানো যে চুল্লীর ভেতর আমরা যে কয়লা আর খনিজ-পদার্থগুলো দিই সেগুলি ধীরে ধীরে নীচের দিকে নেমে যায়। খানিকটা দূর গিয়ে খনিজধাতুগুলো নরম হয়ে যায়। চুল্লীর উত্তাপ বাড়ার সংগে সংগে এগুলি অকসিজেনের সংগে মিশে একটা রাসায়নিক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। কিন্তু ধাতুগুলো যদি খুব নিম্নমানের হয়— যেমন তার ভেতর যদি বেশি পাথর থাকে তাহলে সেগুলো খুব তাড়াতাড়ি গলে যায় আর মাঝপথে চুল্লীর গায়ে আটকে গিয়ে চাপড়া বেঁধে যায়। এই চাপড়াগুলো আবার অন্যান্য নিম্নমানের জিনিসগুলোর নীচে নামার পথে একটা বাধা হয়ে দাঁড়ায়। এগুলোও গলে গিয়ে ওই চাপড়ার গায়ে আটকে সেটাকে আরো বড় করে তোলে। পরে এই স্ফীতিই কয়লা আর ধাতুর নীচে নামার পথে বাধা সৃষ্টি করে। চুল্লীর বায়ু চলাচলে বাধা ঘটায় আর চুল্লীর উত্তাপটাকে কমিয়ে দেয়। এই উত্তাপ কমে যাওয়ার ফলেই কাঁচা লোহা উৎপাদনের মাত্রাও অনেক কমে যায়। আমরা বেশ কয়েক সপ্তাহ ধরে অনুসন্ধান চালিয়েছি। কোথাও এই স্ফীতির লক্ষণ দেখা গেলেই যথেষ্ট সাবধান হয়েছি, প্রত্যেকটি স্তরে চুল্লীর উত্তাপ পরীক্ষা করেছি তার ফলেই এটা বোঝা গেছে। তারপর আমাদের চুল্লীর গায়ে ছেঁদা করে দেখতে হয়েছে এই স্ফীতির ঘনত্ব কতটা। এটা এখনই বেশ বিরাট হয়ে চুল্লীর প্রায় এক-তৃতীয়াংশ ঢেকে ফেলেছে।"

"এখন তোমরা কি করবে ?"

"এটার হাত থেকে আমাদের রেহাই পেতেই হবে। কিন্তু কিভাবে ? সেটাই আমার আসল সমস্যা। প্রায় ডজনখানেক পরিকল্পনা করেছি আমরা কিন্তু প্রায় তার সবগুলোই আবার বাতিল করেছি। খালি একটা পরিকল্পনা বিষয়ে আমরা একমত হয়েছি সেটা হলো চুল্লীর গায়ে যেখানে এই স্ফীতিটা হয়েছে তার ভেতর কতকগুলো গর্ত করে তার মধ্যে বিস্ফোরক বস্তু পুরে দেব।"

বিস্মিত ট্র্যাম্‌ প্রশ্ন করল—"চুল্লীর ভেতরেই বিস্ফোরণ ঘটাবে" ?

"হ্যাঁ, এটা খুবই বিপজ্জনক কাজ। এর ফলে চুল্লীর দেওয়ালগুলো নাড়া খাবে আর তার জন্যে হয়তো চুল্লীর পরমায়ুও যাবে কমে। ট্র্যাম্‌, তুমি তো জানো আমাদের কাছে মানুষের মতোই জীবন্ত এই চুল্লী। এ আমাদের বন্ধু। এই বিস্ফোরণের কথা ভেবেই আমি ভয়ে কেঁপে উঠছি। আমি আমার মাথা

খ‍ুঁজে অন্য কোন রকম কম পাশবিক উপায় খ‍ুঁজে বার করতে চেষ্টা করছি আর তার জন্যে যদি আরো কিছুদিন বেশি সময় লাগে তা লাগুক।”

“তুমি কি কিছু ভেবে পেয়েছ?”

“হ্যাঁ, আমি বুঝতে পেরেছি অন্য এক উপায়েও এই স্ফীতিটা কমানো যায়। আমরা যদি এতে খুব ভালো মানের কয়লা ব্যবহার করে খনিজ-পদার্থের মাত্রা কমিয়ে দিয়ে আরো অনেক বেশি উত্তাপ সঞ্চার করতে পারি। তবে এতে লাগবে আরো একমাস সময় আর প্রচুর যত্ন। আমাকে এখন শুধু দৃষ্টান্ত দিয়ে বোঝাতে হবে যে কি করে এইভাবে ওই ধরনের স্ফীতিটাকে মিলিয়ে দেওয়া যায়। একমাত্র তখনই আমি ওই বিস্ফোরক বস্তুগুলো ব্যবহারের হাত থেকে রেহাই পাব। আজ বিকেলেই আমি এই সমাধানটা আবিষ্কার করে খুবই উত্তেজিত হয়ে পড়েছিলাম। তখন আমি ভাবছিলাম শুধু ভিয়েনের কথাই। তাই আমি চলে এলাম তোমার কাছে। আমি জানতাম ক্লাবে আজ রাতে একটা অনুষ্ঠান হবার কথা আছে।”

তারা পথের দোমোহনার কাছে এসে পড়েছিল। তাই দাঁড়িয়ে পড়লো।

ট্র্যাম্ জিজ্ঞাসা করল—“তুমি কি এখন চুল্লীর দিকেই যাচ্ছ?”

“আমি এখন আমার গবেষণাটি ঠিকভাবে গুছিয়ে লিখতে যাচ্ছি। আগামীকাল এটা পেশ করব কমরেডদের কাছে।”

“কিন্তু তুমি এর মধ্যে বহু রাত ওই চুল্লীর কাছেই জেগে কাটিয়েছ না?”

“হ্যাঁ। আশ্চর্য, আমি নিজেই অবাক হয়ে ভাবি কি করে এত পরিশ্রম সহ্য করছি আমি? মাঝে মাঝে মনে হয় এবার বুঝি ভেঙে পড়ব আমি! কিন্তু আমার কি মনে হয় জানো? আমার স্নায়ুগুলো বোধহয় লোহার!”

থাইয়ের বুকের ভেতর আরো একটা কথা তোলপাড় করছিল তাই ট্র্যাম্‌কে ছেড়ে যেতে সে একটু ইতঃস্তত করছিল। ট্র্যাম্ সেটা অনুভব করতে পেরেছিল। অবশেষে আবেগমথিত স্বরে বললো থাই—“আমি তোমাকে শুধু তোমাকে এই কথাটা বলতে চাই, তুমি সাহস সঞ্চয় কর ট্র্যাম্। তুমি আবার শুরু কর তোমার গান। ভিয়েন আর ফিরে আসবে না। কিন্তু সে কখনই চাইত না যে তোমার গান থেমে যাক চিরতরে। বল? এটা চাইত কি সে?”

হঠাৎ ঘুরে দাঁড়িয়ে দ্রুত পায়ে সে হাঁটতে শুরু করল তার ইস্পাত চুল্লীর দিকে

সে রাতে দু'চোখের পাতা এক করতে পারল না ট্র্যাম্। তার চিন্তাগুলো পাক খেতে লাগল ওই যুবকটিকে ঘিরেই। সে বুঝতে পারছে

কেন থাই তাকে আবার গান গাইতে বলছে। সে তার কাছে চাইছে নব উদ্দীপনা কিন্তু ট্র্যাম্ তো সাড়া দিতে পারে নি তার ডাকে। তার নিজের ওপর রাগ ধরছিল। এই উদ্যমী তরুণ ইঞ্জিনিয়ারটি চাইছিল তার গান শুনে তার মাথায় একটা নতুন স্ফুলিঙ্গের স্পর্শ পেতে যেটা তার মহৎ অন্তঃকরণে আরো উজ্জ্বল করে তুলত তার হারানো বন্ধুর স্মৃতি আর চুল্লীর আসক্তিটাকে। এটা নিঃসন্দেহ যে ভিয়েনের স্মৃতির স্ফুলিঙ্গই থাইকে তার নতুন গবেষণায় জুগিয়েছে উদ্দীপনা। আর ট্র্যাম্? তার কাছে এই একই স্মৃতির স্ফুলিঙ্গ আরো প্রকট করে তুলছে তার আপন দুর্বলতাকে। ভিয়েনের স্মৃতি ভরিয়ে তুললো তার মন। সে ভাবতে লাগল আর একটি সন্ধ্যার কথা। এই একই চন্দনগাছের সারি। গাছগুলো তখন ট্র্যামের কাঁধের সমান উঁচু ছিল। ওই রাস্তা ধরেই বেড়াতে বেড়াতে ভিয়েন তার কাছে গল্প করেছিল থাইয়ের কথা।

ভিয়েন বলেছিল—"জানো ট্র্যাম্ আমার সব থেকে ঘনিষ্ট বন্ধু হলো থাই, খুব ছেলেবেলা থেকে পরিচিত আমরা দু'জনে। ছোটবেলায় আমরা যখন খেলাঘরের চুল্লী বানাতাম বালি, ইট আর লোহার টুকরো জড়ো করে সেই তখন থেকেই আমাদের বন্ধুত্ব। একজন সাজতাম ইঞ্জিনীয়ার আর অন্য জন হতো চুল্লীর কারিগর। এটা সেই প্রথম প্রতিরোধ যুদ্ধের সময়কার কথা। আমার বাবা পেতলের কারিগর ছিলেন আর ওর বাবা করতেন ঢালাইয়ের কাজ। ওঁরা দুজনে জংগলের ভেতর একই কারখানার কাজ করতেন। ওই কারখানায় তৈরি হতো সৈনিকদের অস্ত্রশস্ত্র। জংগলে যেটা সব থেকে বড় গাছ তার পাতা পর্যন্ত ছিল এঁদের চুল্লী। কিন্তু আমাদের এই দৈত্যাকার চুল্লীর কাছে সেটা একটা বেঁটে বামনের মতো। আমরা আমাদের বাবার সংগে জংগলে যেতাম, তাঁদের খাবার দিয়ে আসতাম। ওখানে ওই চুল্লীতে খনিজ ধাতুগুলো গলতে দেখে আমরা খুব উত্তেজিত হয়ে উঠতাম। গরম সাদা গলিত লোহাগুলো যে ছিদ্রটা দিয়ে বেরুত আমরা সেটার দিকে এক দৃষ্টে তাকিয়ে আমাদের দৃষ্টিশক্তির পরীক্ষা করতাম। থাই বেশ ভাব জমিয়ে নিয়েছিল ওখানকার শ্রমিকদের সংগে। আমাদের তারা টুলের ওপর চড়িয়ে চোখে কালো চশমা পরিয়ে ওই গলানো লোহা বেরুবার নলটাকে দেখতে দিত। ছোট ছোট কয়লা আর ধাতুর টুকরোগুলোকে পাগলের মতো নাচতে দেখতাম। তরল লোহা সৃষ্টি হতো আর এক জায়গায় জমা হয়ে সেটা একটা ফুটন্ত ফেনিল সমুদ্রের রূপ নিত। এটা একটা অদ্ভুত আকর্ষণীয় বস্তু বলে মনে হতো আমাদের। আগুনের উত্তাপে ঘামে ভিজে জবজব হয়ে গেলেও আমরা ওই টুলগুলো ছেড়ে উঠতে চাইতাম না। সেই ছোট বয়েস

থেকেই আমরা এই চুল্লীর ওপর একটা প্রবল আকর্ষণ অনুভব করতাম। আমাদের যখনই কেউ জিজ্ঞাসা করত বড়ো হয়ে তোমরা কি হবে? আমরা সংগে সংগেই উত্তর দিতাম মেটালারজিক্যাল ইঞ্জিনীয়ার হব। তৃতীয় দফা সাধারণ শিক্ষাক্রমের পর সার্থক হলো আমাদের স্বপ্ন। পলিটেকনিক্যাল স্কুলে আমরা মেটালার্জি বিভাগে ভর্তি হলাম।

"কিন্তু ইঞ্জিনীয়ার হতে গেলে শ্রমিক হিসাবে প্রথমে কিছুদিন শিক্ষানবিশী করতে হয়। এই ধারণাটা খুব নিপুণভাবে আমার মাথায় ঢুকিয়ে দিয়েছিলেন আমার বাবা। তিনি শিখিয়েছিলেন প্রত্যেকটি জিনিস এমন কী ভালো ধারণাগুলো পর্যন্ত যা কিছু আমাদের ভেতর আছে সবগুলোই আমরা অর্জন করেছি অন্য কর্মীদের কর্মধারার মধ্য থেকেই। তুমি কখনোও মনে কর না যে তোমরা ডিগ্রীর জোরে এই কর্মীদের তুমি নীচু চোখে দেখবে। পেতলের কাজ, ঢালাইয়ের কাজ, কামারের কাজ সবকিছুই শিখতে হবে তোমাকে। তুমি শেখ লোহাকে কি করে লাল করা হয় আগুনে পুড়িয়ে— কি ভাবে পেটাতে হয় হাতুড়ি। তুমি একবারও মনে কর না যে হাতুড়ি পেটানো খুব সহজ কাজ —এটা শেখার কোন দরকার নেই।

"তাই যখনই আমরা বড় চুল্লীতে কাজ পেলাম থাই আর আমি দুজনেই ঝাঁপিয়ে পড়লাম কাজে। কলের মুখ খোলা, গলিত লোহা বওয়া, টুকরোগুলো বোঝাই করা, হাতুড়ি পেটানো—শ্রমিকদের সংগে সবই করতে সুরু করলাম। থাইয়ের পক্ষে প্রথমদিকে হাতুড়ি পেটানোটা একেবারেই সহজ কাজ ছিল না। একমাস চেষ্টা করেও ও সমান্তরাল ভাবে হাতুড়ি পিটাতে পারত না। একবার তার হাত থেকে পিছলে যাওয়া হাতুড়িতে অন্য একজন কমরেডের মাথা ফেটে যাওয়ার উপক্রম হয়েছিল। কিন্তু ঢালাই কারিগরদের মতো ধৈর্য ছিল ওর। কাজের ছুটির ফাঁকে ও হাতুড়ি নিয়ে চলে যেত একটা গাছের কাছে। সেখানে গিয়ে ও এমনভাবে হাতুড়ি পেটাত যে মনে হত ও বুঝি ভেঙে ফেলবে সব কিছু। এর পরে সে আয়ত্ত করল তার হাতের অপূর্ব নিপুণতা। আমি মনে করি এটা শুধু সম্ভব হয়েছিল আমার বাবার দেওয়া শিক্ষার গুণেই। শ্রমিকদের সংগে মিশে সারাক্ষণ নানান ধরনের পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতে করতেই থাইয়ের মধ্যে জন্মালো এক উদগ্র উদ্দীপনা।"

ভিয়েন তার বন্ধুর সম্বন্ধে কথা বলত এক অপূর্ব অনুরাগ আর কোমলতা মিশিয়ে। ট্র্যামের স্পষ্টভাবে মনে পড়ছে তার কথাগুলো। তার মনে হলো ভিয়েন যেন ফিসফিস্ করে বলছে এগুলো তার কাছে। গভীর দীর্ঘশ্বাস ফেললো ট্র্যাম্।

হঠাৎ উদ্দীপিত হয়ে উঠল সে। তার ইচ্ছে করল বড় চুল্লীর ধারে

থাইয়ের পাশে দাঁড়িয়ে ঠিক ভিয়েনের দেশের মাঝিদের মতো করে "ল্যাম্ নদীর" গানটা গাইতে।

কেন সে যুব সংগঠনের কাছে একটা "ভ্রাম্যমান জাগরণী শাখা" বা ওই ধরনের একটা কিছু গড়ে তোলার প্রস্তাব করছে না? তারা গান শোনাতে যেতে পারে ঢালাই কারখানায় সর্বোচ্চ উত্তাপের মধ্যে যে শ্রমিকরা কাজ করছে তাদের কাছে। বোমার ঘায়ে তৈরি গর্তগুলো বোজাতে ব্যস্ত যে শ্রমিকরা তাদেরও শোনাতে পারে গান। ভাঙা রেললাইনগুলো মেরামত করে চলেছে যারা তাদের কাছেও। তারা গান গাইবে কয়লা আর ইস্পাত চুল্লীগুলোর ধারেও। সে কল্পনা করল সে যেন একদিন রাত্রে গলানো ধাতু বেরিয়ে আসা নলের ধারে দাঁড়িয়ে গান গাইছে।

তাদের ক্লাবের সব কিছু অনুষ্ঠান যদি একটা বিচ্ছিন্ন পাহাড়ের উপর একটি ঘরেই সীমাবধ্ধ থাকে তাহলে থাইয়ের মতো কর্মীরা কি করে শুনবে তার গান?

যুব সংগঠনে তার প্রস্তাব খুব ক্ষিপ্রতার সঙ্গে গৃহীত হলো। ট্যামকে ভ্রাম্যমান জাগরণী শাখার উপনেত্রী করা হলো। আবার সকলে শুনতে পেল তার সেই প্রাণ মাতানো কণ্ঠস্বর। সে সর্বত্রই শোনাল তার গান। কোক্ চুল্লীর শ্রমিকদের কাছে সে গাইল তার গান। শত্রুর বিমান আক্রমণের মুখে অল্পের জন্যে রক্ষা-পাওয়া ট্রেনটিকে স্টেশনে ফিরিয়ে এনেছে যে চালক তাকেও শোনাল তার গান। সে গান গাইল সেই শ্রমিকদের কাছে যারা ব্যস্ত রয়েছে রকেটের ঘায়ে গভীর ছেঁদা হয়ে যাওয়া চিমনীগুলোর মেরামতি নিয়ে। কিন্তু এখনও সে থাইয়ের বড় চুল্লীর ধারে পারে নি শোনাতে তার গান। এক ভীষণ জ্বরতপ্ত পরিবেশে কাজ করে চলেছে সেখানকার লোকেরা। থাইয়ের পরিকল্পনা গৃহীত হয়েছে। তার বিন্দুমাত্র সময় নেই বিশ্রামের। প্রত্যেকবার আকরিক ধাতুগুলো চুল্লীতে ফেলার সময়, প্রতিবার বায়ু অনুপ্রবেশের সময় সে সন্ধানীদৃটিতে চেয়ে আছে, প্রতি মুহূর্তে পরীক্ষা করছে চুল্লীর উত্তাপ।

ট্যামকে বললো সে—"আমাদের এখন নিঃশ্বাস ফেলবার সময় নেই। একটু অপেক্ষা কর। চুল্লীর স্ফীতিটা আপনা থেকেই কমতে সুরু করেছে। চুল্লী প্রায় স্বাভাবিক হয়ে আসছে। কাজটা আমরা খুব তাড়াতাড়ি শেষ করতে চাইছি যাতে না মার্কিনীগুলো আবার এসে পরিস্থিতিটাকে জটিল করে তোলে। আমরা যখন মুহূর্তের বিশ্রাম পাব তখনই এই ঢালাই কারখানায় আমরা এক অনবদ্য সান্ধ্য মজলিস্ বসাব—কেমন?"

বেশ কিছুদিন ধরে থাই অতি অন্তরঙ্গের মতো তাকে "তুমি" বলে সম্বোধন জানাচ্ছে। রাত্তিরে চুল্লীর আগুনের আভায় যখন একটু করে আকাশ

হয়ে ওঠে রক্তলাল—ট্র্যামের তখন মনে হয় তার মনটাও যেন নেচে বেড়াচ্ছে এই রক্তিমাভায়। থাই ও তার কমরেডদের জন্যে সান্ধ্য অনুষ্ঠানের বেশি দেরি আর নেই।

কিন্তু এসে পড়ল মার্কিনীগুলো। তারা কারখানাটার খুব কাছেই বোমা ফেলতে লাগল। সেদিন সকালে থাই তাকে বললো—আজ রাতে তোমার অনুষ্ঠানের আয়োজন কর ট্র্যাম। কিন্তু ঠিক সেই বিকেলেই কারখানার ওপরে বিমানগুলোর গর্জন শোনা গেল। ট্র্যাম্ একটু থামল তারপর তাড়াতাড়ি তার প্রাথমিক চিকিৎসার সাজসরঞ্জামভরা বাক্সটি নিয়ে ছুটল চুল্লীর দিকে। সেখানে এখনও কাজ চলছে। আশপাশের সবাই তাদের নিজেদের তৈরি করা নিরাপদ আশ্রয়স্থলে চলে গেছে। ট্র্যাম দেখল পাশের রক্তলাল চুল্লীটার পাশে অস্পষ্ট ছবির মতো দাঁড়িয়ে আছে কয়েকজন। হাপরের গুড়গুড় শব্দ শুনতে পাচ্ছিল ট্র্যাম। থাই অনবরত আসা যাওয়া করছিল চুল্লীর নিয়ন্ত্রণ ঘর থেকে। তারপর ট্র্যাম দেখল যে লোকগুলিকে অস্পষ্ট ছবির মতো লাগছিল তারাই চুল্লীর নলের মুখটা ঘিরে দাঁড়ালো। এবার সে শুনতে পেল লয়বদ্ধ এক যান্ত্রিক শব্দ। থাই নিপুণ দক্ষতায় একটি হাতুড়ি পেটাতে লাগল। ট্র্যাম চিৎকার করে বলল "ওরা উত্তপ্ত গলিত ধাতু বার করবে এবার।"

বিমানের গর্জনে হারিয়ে গেল ট্র্যামের কণ্ঠস্বর। অনেক উঁচু থেকে ঝাঁপিয়ে নেমে এলো একটি বিমান চুল্লীর দিকে। ট্র্যামের বুকে ধাক্কা লাগল যেন একটা। বিস্ফারিত চোখে সে দেখল এক প্রচণ্ড ধুলোর ঘূর্ণিঝড়। সেই সঙ্গেই সে শুনল বধির করে দেওয়া এক বিকট বিস্ফোরণের শব্দ আর এক দানবিক গর্জন। কারখানার ছাদে বহু বছরের সঞ্চিত ধুলোর সঙ্গে মাটির ধুলোগুলো মিশে গিয়ে সৃষ্টি হলো এক ধুসর মেঘ, সে যেন গ্রাস করে নিল মানুষগুলোকে। তড়িতাহত, প্রস্তরপ্রতিম ট্র্যাম ভাবল থাইয়ের বহু সপ্তাহের নিরলস পরিশ্রমের ফল বুঝিবা নষ্ট হয়ে গেল নিমেষে। বিমানের ঘরঘরানি, বিমান বিধ্বংসী কামানের গর্জন, পাহাড়ের ধারের মেসিনগানগুলোর শব্দ, আশ্রয়শিবিরের ছাদের ওপর সশব্দে আছড়ে পড়া ইঁট, পাথর আর লোহার টুকরোগুলোর আওয়াজ—সবই ট্র্যামের কাছে যেন এক অনেক দূরের ঘটনা বলে মনে হলো। কাছের মানুষের আঘাতের গুরুত্ব কতটা সেটাই তার একমাত্র চিন্তা। ধুলোর মেঘ একটু হাল্কা হতেই সে একটি মানুষের ছায়াকে খুঁজতে চেষ্টা করল। ঠিক সেই সময়েই একটা জ্বলন্ত বোমার টুকরোর আলোয় থাইকে ও অপর দুজন কর্মীকে দেখতে পেল ট্র্যাম্। তারা তখনও গলিত ইস্পাত বার করার নলের কাছে ছেঁদা করার যন্ত্রটার ওপর হাতুড়ির ঘা

মেরে চলেছে। ধুলোর মেঘে আবার ঢেকে গেল তারা। ট্র্যাম বিস্মিত হয়ে ভাবল কি করে থাই এমন নির্ভুল হাতুড়ি চালাচ্ছে।

হঠাৎ চুল্লীর সামনের দিকের ধুলোগুলো একটু পাতলা হয়ে আগুনের ঝলক দেখা দিল। অগ্নিশিখা বয়ে চললো ছোট ছোট প্রণালীর মধ্য দিয়ে। ট্র্যাম আনন্দে চিৎকার করে উঠল—"ধাতু!"

সে আশ্রয়স্থল থেকে ছুটে গিয়ে কমরেডদের বললো—"এসো আমরা যাই"। নিজের ব্যাগটা একটু ঠিকঠাক করে নিয়ে সে ধুলো আর ধোঁয়ার মধ্যে দিয়ে তীরবেগে ছুটে চললো।

মাটির নিচে নিরাপদে রাখা কয়লা আর খনিজ পদার্থের রক্ষণাগার থেকে দেওয়ালের ধার ঘেঁসে তৈরি করা আশ্রয়শিবির ছেড়ে দলে দলে সবাই এগিয়ে আসতে লাগল ওই ধুলোর ভেতর। চুল্লীর পাশে নিঝুম নিস্তব্ধতা। বৈদ্যুতিক যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। মেসিন, হাপর, আগুনের শিখা—স্তব্ধ সব কিছু। শুধু তখনও অনর্গল বেরিয়ে চলেছে গলিত ধাতু।

খসে পড়া বালির চাপড়া আর ধাতুর পরিত্যক্ত আবর্জনার মধ্যে চোখ দুটি বুজে অচৈতন্য হয়ে পড়ে আছে থাই। ঘামে আর ধুলোয় মলিন মুখখানা মুছিয়ে দিল ট্র্যাম, তারপর লালকালো ধুলোমাখা জামাটি খুলে দিল সে। থাইয়ের কাঁধের ওপর দেখা গেল এক বিরাট ক্ষতচিহ্ন। বিস্ফোরণের সময় কোন পাথরের টুকরোর আঘাতেই সম্ভবত এটার সৃষ্টি। ট্র্যাম হাতে খানিকটা অ্যালকোহল ঢেলে নিয়ে থাইয়ের কাঁধে ঘসে দিতে লাগল। থাইয়ের মুখের বেদনার কুঞ্চন ট্র্যামের বুকটাকেও মুচড়ে দিতে লাগল। চুল্লীর মাথার ওপরের মই থেকে শোনা গেল একটি ঘোষণা—"সামান্য কিছু আঁচড় লেগেছে"।

তাড়াতাড়ি সব কিছু নিরীক্ষণ করে কর্মীদলও সমর্থন করল। চোখ মেললো থাই সেই দিকে চেয়ে অভিভূত ট্র্যামের কানে পৌঁছল না এদের কোন কথাই। চুল্লীর থেকে পনেরো মিটার দূরে একটা বোমা পড়েছে কিন্তু তাতে সামান্য কয়েকটা পাইপ মুচড়ে গেছে কয়েক জায়গায়। এই সামান্য ক্ষতির সুসংবাদটাই কি পুনরুজ্জীবিত করল থাইকে? তাদের একমাসের অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলস্বরূপ গলিত ধাতু এখন বেশ অধিক পরিমাণে নির্গত হতে শুরু করেছে। বিচ্ছুরিত হাসির আভায় উজ্জ্বল হয়ে উঠল থাইয়ের মলিন মুখ।

"ট্র্যাম তুমি এখানে?" তার গলার স্বরে ট্র্যাম ক্লান্তির সামান্যতম চিহ্নও খুঁজে পেল না।

নিজের হাতের ওপর ভর দিয়ে উঠে দাঁড়াল থাই। চোখের জল লুকোতে মুখটা ঘুরিয়ে নিল ট্র্যাম।

বনজ্যোৎস্না

নগুয়েন মিন্‌ চাও

পুরনো বাক্সের খোলের মধ্যে প্রায় নিভে আসা সলতেটা হঠাৎ জ্বলে উঠল চড়বড় করে। নিস্তব্ধ অরণ্যে শুধু শোনা যায় একটি ছোট নদীর কলতান আর কয়েকটি নিশাচর পাখির মিথুন-ঈপ্সিত কূজন।

রাত্রি গভীর হয়ে আসে তবুও পেট্রোল সরবরাহ কেন্দ্রের ভাঙাচোরা বাঁশের চালার ভেতর ছড়িয়ে ছিটিয়ে শুয়ে বসে থাকা লোকগুলো ভুলে যায় ঘুমোবার কথা। ঢাকা দেওয়া ধোঁয়াটে তেলের আলো পড়েছে ডজনখানেক কালো মুখের ওপর। এই আলোরই কম্পিত শিখার কিছুটা গিয়ে পড়েছে বোমাবিধ্বস্ত রাস্তাটার ওপর। গাড়ির চাকার চাপে মথিত, বোমার আঘাতে তৈরি হাঁটু ডুবে যাওয়া গভীর গর্তগুলোতেও পড়েছে এই আলোকরশ্মি।

বর্ষার এই রাতে একদল গাড়ির ড্রাইভার জড়ো হয়েছিল সেখানে। চালা-ঘরের ভেতর চলেছে প্রচণ্ড হুল্লোড়। থেকে থেকে ফেটে পড়ছে হাসির দমক, প্রতিধ্বনি জোগাচ্ছে অরণ্যে। ফেলে আসা কত বিনিদ্র রাতের পথপরিক্রমার পর এ এক রমণীয় দৃশ্য। এতগুলি বিনিদ্র রাতের পর না ঘুমিয়ে তারা যে একে অপরের গল্প শুনবে সেটা যেন ভাবাই যায় না। তারা সবাই কিন্তু জেগেই রইল।

"শেষ হলো তোমারটা? এবার আমার পালা।" একজনে তার গল্প শেষ করতে না করতেই অন্যজন চাইছে তার গল্প শুরু করতে। মনে হয় যেন অসংখ্য পথের ছবি সেই মুহূর্তেই ভীড় জমিয়েছে তাদের সকলের মনেই।

"এবার তোমারটা শেষ হলো তো? আমি বলব আমারটা।" অন্ধকার কোণ থেকে ভেসে এলো একটি স্বর। রিসার্ভ কে-৩ থেকে শুরু হয়েছে যে রাস্তাটা মার্চ মাসের একরাতে আমার ট্রাকটা যাত্রা আরম্ভ করল ওই পথে। আমি সৈন্যশাখার হেডকোয়ার্টারে একটা সভায় আটকে পড়াতে ট্রাকে নিয়ে যাবার মালগুলো বুঝে নেওয়ার জন্যে আমার সহকারীকেই যেতে হলো। আমাদের মধ্যে কথা হলো যে আমি পথেই ওর সঙ্গে মিলিত হব।

"আমার সহকারী সদ্যনিযুক্ত এই ছেলেটি এক কথায় বলতে গেলে ভারি আমুদে ছিল। ছেলেটি খুবই সজাগ প্রকৃতির কিন্তু একটু ডাকাবুকো ছিল। আমি যখন পশ্চিমের রাস্তা ধরলুম তখনই শুরু হলো এই গল্পের।

"তখন বর্ষার মাঝামাঝি তাই মার্কিনীগুলো খুবই আক্রমণাত্মক। নদীর যে জায়গাগুলো অগভীর, পায়ে হেঁটে যেগুলো পার হওয়া যায়—বিশেষ করে দা ক্যান্ এ আমাদের ইঞ্জিনিয়ারিং শাখার লোকেরা যুদ্ধক্ষেত্রে যাওয়ায় রাস্তাটি চালু রাখার জন্যে দিবারাত্র কাজ করে যাচ্ছিল।

"রাত্রি হয়ে এলো। সৈনিক শিবির থেকে বেরিয়ে আমি যখন ইয়াঙ চে-র সঙ্গে মিলিত হবার জন্যে নির্দিষ্ট রাস্তার সেই ঢালু জায়গাটায় পৌঁছলাম তখন ঝিরঝির করে বৃষ্টি পড়ছিল। প্যারাসুটের দড়ি দিয়ে তৈরি ঝোলাটা হাতে নিয়ে আমি অলসভাবে সিগারেট টানতে টানতে অপেক্ষা করতে লাগলাম। আমাদের মতো ড্রাইভারদের এটা সকলকেই স্বীকার করতে হবে যে সারা বছর ধরে আমরা সবাই ভাড়াকরা গাড়ির সঙ্গে এক অচ্ছেদ্য বাঁধনে বাঁধা হয়ে আছি। তাই আমাদের হাতে যখন করবার মতো কোনো কাজ থাকে না, সেই ক্ষণিক অবসরের মুহূর্তকটা খুবই বিরল ও মূল্যবান। সেইজন্যেই আমি তখন রাস্তার ধারের গাছের গায়ে হেলান দিয়ে পায়ের ওপর পা তুলে সিগারেটের ধোঁয়ার চক্র রচনা করতে করতে আধভাঙা পলকা চাঁদের দিকে চেয়ে স্বপ্নের জাল বুনতে লাগলাম।

"এটা কিন্তু স্থায়ী হলো না বেশিক্ষণ। তার কারণ আমি তখনই অধৈর্য হয়ে দেখলাম সামনে দিয়ে অন্য ট্রাকগুলো বেশ দ্রুতগতিতে চলে যাচ্ছে আর আমার সেই শয়তান সহকারীর টিকির দেখা পাওয়া যাচ্ছে না। রাত্রি যত বাড়তে লাগল আমার এই অপেক্ষা ততই অসহনীয় হয়ে উঠল। সম্পূর্ণ একাগ্রচিত্ত হয়েও আমি আমার পরিচিত ট্রাকের গর্জন শুনতে পেলাম না। আমার ধৈর্য-চ্যুতি ঘটতে লাগল। এই যুদ্ধের সময় নদীর পারঘাটার কাছে সঙ্গীদের থেকে আধ-চাকা এগিয়ে থাকলেও দুর্ভাবনাটা অনেক কমে। তাছাড়া আমি তাড়াতাড়ি এই রাস্তাটা পেরিয়ে গাড়ির মালগুলো খালাস করে জঙ্গলের মধ্যে নিভৃত নিরাপদ জায়গায় আমার ট্রাকটাকে রেখে দিতে চাইছিলাম। একটা নির্দিষ্ট খুব নিরাপদ জায়গা যার খুব কাছেই আমার এক বোন কাজ করত।

"আমি আগেই অনুমতি নিয়ে রেখেছিলাম ওখানে পৌঁছে আমার বোনের সঙ্গে দেখা করবার। এই বোনটিই আমাকে বার বার নালিশ জানাচ্ছিল যে সে তার প্রিয় ল্যাম-কে আজ তিন বছর দেখে নি।

"রাস্তার ঢালের ওপর দাঁড়িয়ে আমি যখন ক্রমাগত চিন্তা করে চলেছি যে আমার সহকারী নিশ্চয়ই সময়মতো মালগুলো তুলতে পারে নি কিম্বা অন্য কোন বিপদে পড়েছে—ঠিক তখনই আমি আমার গাড়ির হর্ন শুনতে পেলাম। অত্যন্ত খারাপ মানসিকতা সত্ত্বেও মুখের সাহস অটুট রাখলাম আমি। মালের চালানগুলো আমাকে দিয়ে সহকারীটি সানন্দে একটি সরু-চালের প্যাকেট আর

সরবতের বোতলটি রাখল গাড়ির ভেতর। চোখ মট্‌কে আমার কাঁধে থাবড়া মেরে রগ্‌চটা বললো—"শুভযাত্রা"—। বলেই লাফ দিয়ে রাস্তায় নামল। আমাদের শাখার নেতা আগের অন্য অনেকবারের মতো এবারেও আমাকে একাই পাঠিয়েছেন ফ্রণ্টে। আমার এই সহকারীর ওপর অন্য কাজের ভার আছে, তাই সে এখান থেকেই বিদায় নেবে। সে কয়েক পা এগিয়ে গিয়েই, আবার ঘুরে দাঁড়াল—ফিরে এলো আমার কাছে। দরজার ধারে দাঁড়িয়ে সে বললো—"ভালো কথা ল্যাম, মালগুলো তোলার সময় আমি দেখলাম গুনতিতে একটি টায়ার কম আছে, তাই আমি গুদাম-রক্ষককে দিয়ে কাগজে একটা সই করিয়ে নিয়েছি।"

আমি খুশি হয়ে বলি—"তুমি ঠিকই করেছ"।

"আর একটা কথা যেটা ঐ কাগজে লেখা নেই—"

"আবার কি ?"

"গাড়ির পিছনের আসনে একজন যাত্রী বসে আছে ও দা স্নান্ সেতুর কাছে নেমে যাবে।"

আমি থ হয়ে গেলাম। "এসব কি ? তুমি আমাদের সব নিয়মকানুনই তো জান—তাহলে সেগুলি গ্রাহ্য কর না কি তুমি ?"

"এটা......কারণ......"

সে যতই যুক্তি দেখাক না কেন আমি তাতে সায় দিতে পারি না। তবে আমি স্থির নিশ্চিত যে যাত্রীটি একটি মেয়ে।

গাড়িটা এখানে পৌঁছবার পরের দৃশ্য আমি কল্পনায় দেখতে পেলাম। ছোটখাটো একজন কেউ সাদা কোনাচে টুপির আড়ালে নিজের মুখটি লুকিয়ে দরজায় কান লাগিয়ে আমার ধূর্ত সহকারীর রসিকতা শুনেছে, আর সে বসে আছে চালকের আসনে পরম পরিতৃপ্ত মুখে জ্বলন্ত সিগারেট নিয়ে।

যুবকটি চলে গেল। হতভম্ভ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম আমি। এই পথের বিপদের কথা খুব ভাল করেই জানি আমি। তার ওপর সঙ্গের এই সহযাত্রীকে নিয়ে আমাকে হয়তো আরো উত্যক্ত হতে হবে। তবু এখন তাকে বেরিয়ে যেতে বলা আমার পক্ষে সম্ভবপর নয়। আমি গাড়ির জালের মধ্যে দিয়ে একবার পিছন দিকটা দেখতে চেষ্টা করলাম—কিন্তু সেটা শুধু একটা মুখবন্ধ বোতলে উঁকি মারার মতনই লাগল। আমার নাকে পৌঁছল শুধু নতুন রবারের গন্ধ। —ছোট্ট পাখিটি এই বাসাটা জোটালো কোথা থেকে ?

"ওখানে কে ?" —রুক্ষস্বরে প্রশ্ন করলাম আমি। কোনো উত্তর নেই। খালি গাড়ির ভেতরে রাখা টায়ারগুলোর ঠোকাঠুকির শব্দ আর তার সঙ্গে একটু কাকলি। আরোহিণী আমার সঙ্গে আমার সহকারীর পুরো কথাবার্তা

শুনে নিয়েছে। আমার মনে হলো তাকে বোধহয় আগে থেকেই শাসিয়ে দেওয়া আছে নয়তো এমনও হতে পারে যে সে হয়তো ভাবছে আমাকে সে ভোলাতে পারবে না। কিন্তু কে সে?

"ওখানে কে?" —আগের বারের থেকে কিছুটা কোমল স্বরে আমি আবার প্রশ্ন করি।

"আমি....তুমি কি অনুগ্রহ করে আমাকে 'দা স্থান সেতুর কাছে নামিয়ে দেবে একটু?"

যা ভেবেছিলাম তাই! শান্ত আত্মপ্রত্যয়ে ভরা স্বচ্ছ গলার স্বর শুনে বুঝলাম এটি একটি মেয়ে!

"শ্রীমতী আমি তোমাকে গাড়ি থেকে নামিয়ে দিতে পারতাম! এটা মিলিটারি ট্রাক্। সেতুর কাছে কি কাজের জন্য তুমি যাচ্ছ?"

"ঝোলানো সেতুর কর্মী আমি। আগের লোকটা আমার কাগজপত্র সব দেখেছে। আমি আমার কর্মশাখায় ফিরে যাচ্ছি। শাখার অন্য কমরেডরা আমার জন্যে অপেক্ষা করছে।"

বরফটা একটু গলার জন্যে আমি ঠাট্টা করে বলি—"কথাটা সত্যি? নাকি আগে থেকে ব্যবস্থা করে রেখে স্বামী অথবা প্রেমিকের সংগে দেখা করতে চলেছ?"

"আমার প্রেমিক! বেশ, তোমার যদি তাই মনে হয় তো তাই-ই!"

তাড়াতাড়ি গাড়ি চালাতে চালাতে ভাবলাম আমি—বেশ তেজী মেয়েটা, খুব চট্পট উত্তর দিল আমার কথার। ওর গলার স্বর শুনে আগে এতটা বোঝা যায় নি! কে জানে হয়তো সে সত্যি কথাই বলছে।

"ধৈর্য ধরো বৎসগণ"—। মেয়েটি কে আর গল্পটি কি ভাবে শেষ হলো শ্রোতাদের সেটা জানবার অধীর আগ্রহ দেখে বক্তাটি অন্ধকারে গলার স্বর একটু চড়িয়ে কথাগুলো বললো।

নদীর কলধ্বনি আর অরণ্যে দুটি পাখির ভীত কুজন বিনিময় শুনতে পাচ্ছিল তারা। কাঠির মাদুরের ওপর বসে ধোঁয়ায় চোখ পিট্পিট্ করতে করতে কথক নিভন্ত দীপ-শিখাটিকে এক ফুঁয়ে নিভিয়ে দিল। সেই অন্ধকার চালাঘরটি ভরিয়ে তুললো রাত্রির অরণ্যের অদ্ভুত সব শব্দ।

সে আবার শুরু করল তার গল্প।

"এসো এখন ঐ মেয়েটিকে ট্রাকের সেই একগাদা টায়ারের স্তূপের মধ্যেই রেখেদি। তোমাদের আমি আগেই বলেছিলাম দা স্থান্ সেতুর কাছে আমার এক বোন জনকল্যাণের কাজে নিযুক্ত আছে। বছর কয়েক আগে তোমাদের মধ্যে যারাই ওই পশ্চিমের রাস্তা ধরে গেছ সকলেই মনে করতে পারবে সেতুর কাছের সেই কাজের জায়গাটি ছিল কত উদ্দীপনাময়।

আমার বোন টিন্‌ একদম শুরু থেকেই ওখানে কাজ করত। তার মতো আরো একশো জন পাথর কাটিয়ে ছিল ওখানে। ওদের দলে একজনের নাম ছিল নেগুয়েত্‌ অর্থাৎ চাঁদ। কি সুন্দর নাম। স্কুলের পড়া ছেড়ে দিয়ে সে বিধ্বস্ত পশ্চিমাংশকে গড়ে তোলার কাজে লেগে গিয়েছিল। টিন-এর মন জয় করেছিল সে তার মিষ্টি স্বভাব আর কর্মদক্ষতার গুণে। নিজের বোনের মতো তাকে ভালবাসত টিন। প্রতি চিঠিতেই সে এই মেয়ের গুণপনার ফিরিস্তি দিতে ভুলত না। একবার লিখল—"সব দিক দিয়ে ভেবে দেখলে এই মেয়েটিই হবে তোমার ঠিক উপযুক্ত সঙ্গিনী। এরকম মেয়ে সচরাচর দেখতে পাওয়া যায় না। পরের চিঠি থেকেই সে আমাকে পীড়াপীড়ি করতে শুরু করল একবার গিয়ে মেয়েটিকে দেখে আসার জন্যে। টিন লিখেছিল—"তোমার ব্যাপারে আমার মনের কথা আমি খোলাখুলি ভাবেই বলেছি নগুয়েত-কে, সব শুনে মেয়েটি লজ্জায় নিরুত্তর হয়ে রইল। তুমি কিভাবে বাড়ি থেকে পালিয়ে সৈন্যদলে যোগ দিয়েছিলে সেই সব কথা যখন তাকে বললাম সে অভিভূত হয়ে গেল। আর দেরি না করে চলে এস। নেগুয়েত্‌ তোমাকে দেখে খুব খুশি হবে। তোমরা আগে দু'জনে দু'জনকে দেখবে একবার তারপর অন্য সব কিছু ব্যবস্থা হবে।"

ওই সময়ে সার বেঁধে উত্তরের দিকে যে সব গাড়িগুলো যেত তাদেরই এক ড্রাইভারের সহকারী ছিলাম আমি। কিন্তু প্রায় প্রতিবারই আমাকে পশ্চিমাঞ্চলেও যেতে হতো। এই ঘুরপথ দিয়ে কাজের জায়গাতে যাওয়ার সুযোগটা আমি কখনো ছাড়তুম না। তবু টিন্‌ আর নেগুয়েত্‌-এর সঙ্গে দেখা হলো না কখনও। টিন্‌-কে চিঠি লেখার সময়ে আমি অন্তরঙ্গভাবে নেগুয়েত্‌ সম্বন্ধে দু'একটি কথা লিখতাম, সেইসঙ্গে তার সঙ্গে কোন একদিন দেখা করবার ইঙ্গিতও থাকত। টিন্‌-এর সেই সব চিঠিগুলো একটাও পড়তে বাদ দিত না নেগুয়েত্‌। যে সব লোকে দূর জঙ্গলে থাকতে হয় তারা সব সময়েই নিজের নিজের চিঠিপত্র অন্যদেরও পড়ায়। তাই নেগুয়েত্‌ আমাকে বেশ ভাল-ভাবেই জেনে গিয়েছিল।

মাঝে কয়েক বছর কেটে গেল। টিন্‌ পড়তে চলে গেল হ্যানয়। আর মার্কিনীদের আক্রমণও বেড়ে উঠল সেই সময়ে। আমি আবার সৈন্যদলে যোগ দিলাম। মার্কিনী বিমানগুলোর প্রধান লক্ষ্যস্থল ছিল পশ্চিমাঞ্চলের মধ্যভাগ আর রাস্তাগুলো। বিয়ের কথা ভাববার মতো সময় ছিল না তখন আমার। আমি ভুলে গেলাম টিন্‌-এর চিঠিগুলোর কথা, ভুললাম নেগুয়েত্‌-কেও।

দু'বছর পড়াশুনো করার পর টিন্‌-কে আবার ডেকে পাঠাল পশ্চিমাঞ্চলেই। সে আমাকে আবার চিঠি লিখল। তাতে সে জানাল সেতুর

ওপর কি প্রচণ্ড আক্রমণ চলছে আর সেই সঙ্গে কি আপ্রাণ চেষ্টায় ওখানকার কর্মীরা সেতুটিকে গাড়ি চলাচলের উপযোগী করে রাখছে।

এ সব ঘটনাগুলোর কোনোটাই অজানা ছিল না আমার কাছে। যে খবরটা আমাকে সব থেকে বেশি অবাক করেছিল সেটা হলো নেগুয়েত এখনও আমার কথা ভাবে আর আমারই জন্যে অপেক্ষা করে আছে। এতদিনে একাধিক লোক নিশ্চয়ই তার কাছে বিবাহের প্রস্তাব করেছিল আর সে সম্ভবত বলেছে তার মন বাঁধা আছে অন্যত্র। সে এখন এমন একটা পারঘাটায় কাজ করছে যেটার ওপর প্রচণ্ড দৃষ্টি রয়েছে মার্কিনীদের। আমি ভীষণ খুশি আর বিচলিত হয়ে পড়লাম। বস্তুত এটা একটা অসাধারণ ঘটনা একটি মেয়ে এই প্রচণ্ড বোমা বর্ষণ আর ধ্বংসের মাঝখানে দাঁড়িয়ে বেশ কয়েকটি বছর ধরে একটি পুরুষের প্রতি একাগ্রচিত্ত হয়ে আছে—যাকে সে কোনদিন চোখেও দেখে নি। যার সঙ্গে সে প্রতিশ্রুত হয়নি কোন বন্ধনে। কৃতজ্ঞতায় ভরে উঠল আমার মন। তার সঙ্গে দেখা করতেই হবে আমাকে। টিনুকে আমি লিখলাম একটা সময় ঠিক করতে। ছুটি চাইলাম আমি। আমার গাড়িতে করে বয়ে আনা টায়ারগুলো যুদ্ধক্ষেত্রের একটা গুদামে জমা দিয়ে আমি আমার গাড়িটাকে রাখব একটা চন্দন গাছের জঙ্গলে। তারপর আমার বোনের বাড়ি যাব আমি, সে আমাকে নিয়ে যাবে নেগুয়েতের কাছে। ওখানে ঝোলানো সেতু মেরামতে নিযুক্ত কর্মী-দলের অতিথি হয়ে কাটাব একটি রাত।

গাড়ি এগিয়ে চলেছে ধীরভাবে। গভীর অরণ্যের রাত্রি নিস্তব্ধ, নির্জন। স্টিয়ারিং-এ হাত রেখে দূরের পানে চেয়ে আমি কল্পনা করছি সেই মুহূর্তটির কথা যখন আমি মিলিত হব ওই সেতু মেরামতরত প্রাণবন্ত দুষ্টু মেয়েগুলোর সঙ্গে। নেগুয়েত হয়তো দু'একটি কথা বলবে—কিন্তু ততক্ষণে ওর সঙ্গিনীরা ঠাট্টা-টিটকিরি শুরু করে দেবে। কিন্তু আমাদের সম্পর্কে ওদের মনে কোন মালিন্যই থাকবে না। তার কারণ ড্রাইভারদের সঙ্গে ওরা সব সময়েই খুব সহৃদয় ব্যবহার করে। ওরা সবাই সরল, অতিথিবৎসল আর সাহসী মেয়ে।

প্রায় বারো কিলোমিটার অতিক্রম করার পর আমি দেখলাম একসারি ভারী মালটানার গাড়ি কামানগুলোকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। আমাকে রাস্তার একপাশে সরে যেতে হলো। ফ্ল্যাস্ লাইট্ দিয়ে ট্রাকের নিচেটা পরীক্ষা করে নেবার সুযোগ পেলাম আমি। নিষ্প্রদীপের সময় ব্যবহার করবার বাতিটার বাল্বটাও পরীক্ষা করলাম আমি। বাতির পিছনের স্ক্রুটা আমি যখন টাইট করছিলাম তখন শুনলুম—"কি ধরনের বাল্ব ব্যবহার কর তোমরা" ?

আমি বললাম—"কে ?"—এ আমার যুবতী যাত্রীটি। ফ্ল্যাস্‌লাইটের একটি রশ্মি প্রতিফলিত হয়েছে রাস্তার ওপর। সেই আলোয় আমি দেখলাম

ট্রাকের সামনে একজোড়া সুন্দর গোলাপী হিল্‌ওলা পরিস্কার রবারের চটি, গোড়ালী-ছোঁয়া কালো সিল্কের প্যান্ট।—একেতো কর্মী বলে মনে হচ্ছে না—ভাবলাম আমি। এ নিশ্চয়ই এর স্বামী কিম্বা প্রেমিকের সংগে মিলিত হতে যাচ্ছে।

আমি হামাগুড়ি দিয়ে বেরিয়ে এলাম ট্রাকের নিচ থেকে। চোখটা ভাল করে রগড়ে নিয়ে বললাম—"মহাশয়া, পরের বার আমি যখন গাড়ি থামাব তখন আর নেমে পোড়ো না গাড়ি থেকে।"

"আমায় ক্ষমা কর, একটু হাওয়া খেতে বেরিয়েছি আমি।"

"গাড়ির ভেতরের ঐ রবারের গন্ধ আর সহ্য হচ্ছিল না।"

ভারী মালটানা গাড়িগুলো বিকট গর্জন করতে করতে এগিয়ে চলেছে—তাদের ঢাকা দেওয়া বিবর্ণ আলোয় মেয়েটির রূপ আর মাধুর্যে অভিভূত হলাম আমি। তার অবয়ব, তার কণ্ঠস্বর, তার কটিদেশ যেন পাহাড়ের উপরের কুয়াশার মাধুর্যে ভরা। মেরামতির কাজের জায়গাগুলোতে যে সব মেয়েরা কাজ করে তারা সাধারণত বেঁটে রুক্ষ ধরনের। কিন্তু এ যেন তার থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন ধাঁচের। দীর্ঘ চুলের রাশি দুটি বিনুনিতে বাঁধা। তার হাতে সুন্দর করে ঝোলানো রয়েছে একটি বাস্কেট আর আনকোরা নতুন একটি কোনাচে টুপি।

"তুমি পারঘাটায় কাজ কর—না ওখানে কারুর সংগে দেখা করতে যাচ্ছ?"

সে মাথা নিচু করে বললো—"পারঘাটায় কাজ করি আমি"।

"ওহো আমি তোমার নাম জিজ্ঞেস করতে ভুলে গেছি।"

"আমার নাম নেগুয়েত্।"

"...এ্যা!"

কিছু বুঝতে না দিয়ে চকিতে একবার দেখে নিলাম তাকে। তাড়াতাড়ি ট্রাকের দরজা খুলে তাকে বললাম—"সত্যি রবারের গন্ধটা তোমার অসহ্য লাগতে পারে।—এখানেও জায়গা আছে তুমি সামনে এসে বসতে পার।"

ভারী মালটানার গাড়িগুলো ৫৭ মিলিমিটার, কামানগুলোকে নিয়ে পথ আর পাহাড়গুলোর সংগে আমাকেও প্রচণ্ডভাবে কাঁপিয়ে নিয়ে গেল। বুকের খাঁচায় হৃৎপিণ্ডটা যেন লাফিয়ে উঠল।

মাঝে বেশ খানিকটা ব্যবধান রেখেই বেতেবোনা নিখুঁত বাস্কেটটি কোলে নিয়ে দরজার ধার ঘেঁসে বসল মেয়েটি।

আমি জীবনে কোনদিন কোন মেয়েকে গাড়ির এই আসনে বসতে দিইনি। গম্বুজাকৃতি আলোটার দিকে মুখ ঘোরালাম আমি। নেগুয়েত্ নম্র-ঔৎসুক্যে একনজরে দেখে নিল আমায়।

আমি কায়দা করে বললাম—"নেগুয়েত্ বলে আরো অনেক মেয়ে আছে বুঝি তোমাদের দলে ?"

"কি করে জানলে তুমি ?—আমাদের ওখানে একই নামে আরো তিনজন মেয়ে আছে। এর মধ্যে একজন মারা গেছে।"

"কখন মারা গেছে ?"—সরাসরি জানতে চাইলাম আমি। কিন্তু আমার গলার স্বর আমার নিজের কানেই অপরের স্বর বলে মনে হলো।

"তিন-চার মাস আগে একবার যখন প্রচন্ড বোমা বর্ষণে সেতুটা ভেঙে গিয়েছিল—সেই সময়ে।—সে স্বভাবতঃ খুবই শান্ত প্রকৃতির ছিল কিন্তু কি প্রচন্ড শক্তিতে লড়েছিল সেই মেয়েটি। তার জন্যে অনেক কেঁদেছি আমরা।"

"সে কি বিবাহিত ছিল ?"

"না, ওরা বলে তার একজন প্রেমিক ছিল ?"

স্টিয়ারিং-এর ওপর হাতের আঙুলগুলো শক্ত করে চেপে ধরলুম আমি। আমার মনে হলো তা না হলে এটা বুঝি আমার হাত থেকে বেরিয়ে যাবে। আরো প্রশ্ন করবার জন্যে আমি গাড়ির গতি মন্থর করলুম।—"আর দ্বিতীয় নেগুয়েত্ কে ?"

সে বেশ মজা করে বললো—"ও তার চারটি ছেলেমেয়ে আছে। আমরা তাকে বুড়ী নেগুয়েত্ বলি।—কিন্তু এত প্রশ্ন করছ কেন ?"

আমি দীর্ঘশ্বাস ফেলে একটা বোকার মতো রসিকতা করলুম।

মনে মনে আমি বেশ বিচলিত হয়ে উঠেছিলুম। একবার ভাবলাম জিজ্ঞাসা করি ও টিন-কে চেনে কি না। ওর উত্তর পেলেই বোঝা যাবে সব কিছু। কিন্তু আমি পিছিয়ে গেলাম। কাজের সংগে নিজের ব্যক্তিগত ব্যাপার এক-সংগে মিশিয়ে ফেলাটা আমার স্বভাববিরুদ্ধ জিনিস। আমি আরো বিহ্বল হয়ে পড়লাম। দু'জন নেগুয়েত্-এর মধ্যে একজন সজীব তারুণ্যে ভরপুর বসে আছে আমারই পাশে আর অন্যজন বরণ করেছে বীরের মৃত্যু। এদের মধ্যে কোনজন এতদিন ধরে হৃদয়ে লালন করেছে আমার প্রতি তার প্রথম প্রেম—যে প্রেমে আমার সাড়া ছিল খুবই অনাসক্ত ;—দু'জনের কার কাছে যাচ্ছি আমি ?

ট্রাকটা এগিয়ে চলেছে ধাপে ধাপে। জংগলের কিছুটা অংশ, পাহাড়ের চুড়ো, বোমার ঘায়ে তৈরি গর্তগুলোর ভেতর ঝোপগুলো ছুটে চলেছে আমাদের সামনে দিয়ে। আমি একটা রকেটের বিবর্ণ আগুন কাঁপতে দেখলাম আমার মাথার ওপর। সংগে সংগে গাড়িটা থামালাম। গর্জে উঠে বললাম—"এই এক আপদ। এগুলো না জানিয়েই জোটে। আমি কোন বিমানের আওয়াজই পাইনি।"

নেগুয়েত্ জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে দেখছিল। ও আমার দিকে ফিরে বললো—"কিন্তু এটা তো চাঁদ"।

তাইতো এটা চাঁদই বটে। আমি যে চাঁদের আলোয় গাড়ি চালাচ্ছি সেটা খেয়ালই ছিল না।

নেগুয়েত্ শান্তভাবে আবার বাইরের দিকে তাকাল। আমি অপ্রস্তুত হয়ে একটা সিগারেট ধরিয়ে গাড়ির গতি বাড়িয়ে দিলাম। একজন অভিজ্ঞ ট্রাক ড্রাইভার যে বিপদে সদা-সতর্ক, সে চাঁদকে কি করে ভাবল আগুনের গোলা। কুয়াশায় ভরা গাড়ির কাঁচের ভেতর দিয়ে দেখা যাচ্ছে মেঘের ফাঁকে একফালি চাঁদ গাড়ির ঝাকুনিতে কেঁপে কেঁপে উঠছে আর লুকোচুরি খেলছে গভীর অরণ্যের উঁচু গাছগুলোর সংগে।

মাঝরাতের কাছাকাছি দক্ষিণ-পশ্চিম দিক থেকে ধেয়ে আসা হাওয়া ওই ধূসর মেঘগুলোকে দিক্‌চক্রবালে নিশ্চিহ্ন করে দেওয়ার আগে তাদের তাড়িয়ে নিয়ে গেল আকাশের এক কোণে। আর সেই হাওয়ারই দোলায় গাড়ির মাথার ওপর ঢাকা দেওয়া গাছের শাখাগুলো ঘষড়ানি খেতে লাগল ট্রাকের ছাদে। আমাদের মাথার ওপর দেখা দিল নির্মল অনন্ত আকাশ! কিন্তু তখনই পাহাড়ের ঢালু জংগলে কুয়াশা জমতে লাগল। আমাদের বাঁদিকে বেঁকে যাওয়া নদীটা ধীরে ধীরে অদৃশ্য হয়ে গেল ঘোমটার আড়ালে। অন্যদিকে মাঝে মাঝে দেখা দিতে লাগল একটা ছোট ঝোপ, কখনও বা কোন পাহাড়ের চূড়ো ঐ বিশাল শ্বেত-সমুদ্রে সেগুলো যেন কৃষ্ণকায় আর নিঃসংগ।

পরের ট্রাকের পেছন দিকটা এখন যেন ভেসে উঠল কুয়াশার সমুদ্রে। দিগন্তের ক্ষীণ চাঁদের আলোয় দরজার পাশে বসা নেগুয়েতকে ছবির মতো দেখাচ্ছিল।

আমার মধ্যে এক কঠিন অপ্রাকৃত অনুভূতির সঞ্চার হলো। আমার যেন মনে হলো এই পাশে-বসা মেয়েটিই সেই নেগুয়েত্ যার কথা আমার বোন বলেছে আমাকে। বারে বারে চকিত দৃষ্টিতে আমি দেখতে লাগলাম তাকে। চাঁদের আলোয় অবগাহন করছে তার অলকগুচ্ছ। এই অফুরন্ত চুলের মধ্যে কি সুগন্ধ, কি সজীবতা।

"নেগুয়েত্ হঠাৎ আমার দিকে চেয়ে কি একটা প্রশ্ন করল—আমি বুঝতেই পারলাম না। যার মোহ আচ্ছন্ন করে রেখেছে আমার চোখটা—আমি কি করে শুনব তার কথা?

চাঁদের আলো তার মুখে এনে দিয়েছে এক অতুলনীয় সৌন্দর্য আর সজীবতা। তার মুখের দিকে বেশিক্ষণ চেয়ে থাকবার সাহস হলো না আমার। আমি চোখ ফেরালাম এবড়ো-খেবড়ো রাস্তার ওপর—সেখানেও ছড়িয়ে আছে ছিটেফোঁটা চাঁদের আলো।

সে বললো—"বলো, তাই না ?"

"কি ?"

"তোমরা ড্রাইভাররা তো সর্বত্র যাও। অনেক লোককে চেনো নিশ্চয়ই, তাই না ?"

এবার আমি বুঝতে পারলুম নেগুয়েত্ কি বলতে চাইছে। আমি সোৎসাহে বললাম—"আমরা দূরান্তর থেকে আসা পাখির ঝাঁকের মতো। কত পাহাড়, উপত্যকা অতিক্রম করে চলে যাই আমরা। আমাদের সংগ দিতে আছে শুধু এই পথ আর ঐ চাঁদ।"

চাঁদের কথাটা যে কি করে আমার মনে চলে এলো তা আমি নিজেই জানিনা। অদৃশ্য হয়ে গেছে চাঁদ—মুখ লুকিয়েছে অরণ্যের আড়ালে।

আমরা পেঁৗছে গেছি দা ক্লান্ সেতুর কাছাকাছি। থেমে গেছে আমাদের কথা। আমি একটু আলোর জন্যে বাতিটা জ্বালালাম। নেগুয়েতকে বললাম, "শোনো মন দিয়ে—এই জায়গা থেকেই বিমানগুলো আসে প্রায়ই।"

সে বাইরের দিকে চেয়ে শান্তস্বরে বললো—"কোনো চিন্তা কোরো না। এ জায়গাটা আমি খুব ভালো করে জানি।"

সে আমাকে পারঘাটে পেঁৗছাবার জন্য একটা ঘুরপথের নিশানা দিল। আমরা বোমার ঘায়ে তৈরি গর্তগুলো আর কাদার মধ্যে দিয়ে ঘুরে ঘুরে নামতে লাগলাম।

গাড়ির সামনের কাঁচের ভেতর দিয়ে প্রায় চোখ জেবলে আমি রাস্তার গভীর খাদগুলো এড়িয়ে যেতে চেষ্টা করলাম। সেগুলোর গভীরতা প্রায় ছোট নদীর মতো। যখন সামনের চাকা দু'টো ডুবে গেল তার মধ্যে নেগুয়েত্ তখন লাফিয়ে বাইরে এলো আমাকে সাহায্য করতে। আমি এ্যাক্সিলেটারে চাপ দিলাম। গাড়ির ভেতরটা খুব গরম হয়ে উঠেছিল—চাকাগুলো পাথরের গায়ে ঘষা খেয়ে পোড়া রবারের গন্ধ ছড়াল।

আমরা এই রাস্তাটাকে যে ভাবেই ভরাট করি না কেন, ওরা কখনও এটাতে বোমা ফেলতে ছাড়ে না। ক্ষমা চাইবার মতো করে বললো নেগুয়েত্—"সব সময়েই এটা মেরামত করতে হয় গোড়া থেকে।"

আমি মুখের ওপর গড়িয়ে পড়া ঘাম মুছে নিলাম টুপিটা তুলে। তারপর স্মরণ করলাম সেই মুহূর্তটির কথা যখন নেগুয়েত্ চলে যাবে আমাকে ছেড়ে। আমি বললাম—"তুমি কি এক্ষুণি নামবে ? আমাকে ঠিক সময়মতো বোলো যাতে করে আমি নির্দিষ্ট জায়গাতে গাড়িটা দাঁড় করাতে পারি।"

পারঘাটার এপারে গার্ডপোস্টের কাছে তার নামবার কথা ছিল, কিন্তু অন্য পারে পেঁৗছানো পর্যন্ত অপেক্ষা করল সে। আমাকে ঠাট্টা করে বললো

—"তুমি আমাকে অনুগ্রহ করে এখানে পৌঁছে দিলে আর আমি তোমাকে এই সংকটের মুহূর্তে ছেড়ে চলে যাব ?"

আমি দৃঢ় প্রত্যয়ের সঙ্গে বললাম—"আবার দেখা হবে আমাদের। তুমি আগে নামলেও ভাবতাম না যে আমাকে একা বিপদের মুখে ফেলে চলে গেছ।"

"কেন ?"

"তোমাকে দেখে এটাই মনে হলো আমার।"

আমরা পারঘাটার থেকে জলে নামলাম। সাধারণত এ জায়গাগুলো বিশেষ চওড়া হয় না, কিন্তু গতবারের বন্যায় এর জলের মাত্রা প্রায় একমিটার বেড়ে গেছে। অনেক সাবধানে ট্রাকটা চালানো সত্ত্বেও মাঝস্রোতে গিয়ে অনিচ্ছুক মোষের মতো গর্জন করে থেমে গেল সেটা! নেগুয়েত্ দরজা ধরে ঝুলে দাঁড়িয়ে আমাকে দুপাশের সীমারেখার নিশানার নির্দেশ দিচ্ছিল। সে হঠাৎ জলে ঝাঁপিয়ে পড়ে জলের ওপর রুপালী প্রতিচ্ছায়া ফেলা আলো দুটোকে সঙ্গে সঙ্গে নিভিয়ে দিতে বললো চেঁচিয়ে।

"শত্রু বিমান ?"

"আমি জানি না। ওটা যাই হোক সব আলোগুলো আগে নিভিয়ে ফেল। জানো না জলের ওপর আলোর রেখা অনেক দূর থেকেও দেখা যায় ?"

আলো নেভানোর সঙ্গে সঙ্গে এক অদৃষ্টপূর্ব ঘন অন্ধকারে ডুবে গেল সব। আমি শুধু শুনলাম বাঁধের গায়ে আছড়েপড়া জলের শব্দ। আমি বৃথাই চেষ্টা করতে লাগলাম এগোবার বা পেছোবার। ট্রাকটা শুধু নড়ে উঠল—একটুও সচল হলো না। রাত্রের প্রচণ্ড ঠাণ্ডাতেও আমার সারা শরীর ঘামে ভিজে গেল। নিজের জামাকাপড় ভিজে যাবার কথা বিন্দুমাত্র চিন্তা না করে নেগুয়েত্ তখন গাড়ির চাকা ঘোরাবার মোটা দড়ি নিয়ে নদী পার হয়ে অপর পারে পৌঁছে দড়িটাকে গাছের গুঁড়ির সঙ্গে বেঁধে দিল। কঠিন সংগ্রামের পর অবশেষে আমি নদীর অপর পারে পৌঁছতে পারলুম।

দুজনে আমরা একটু নিঃশ্বাস ফেলবারও ফুরসৎ পেলাম না। আমরা সবে মাত্র মোটা দড়িটা গুটোতে শুরু করেছি তখনি এসে পড়ল শত্রু বিমান। চকিতে পাহাড়ের পিছন থেকে বিকট আওয়াজ করে তারা একেবারে আমাদের মাথার ওপর এসে পড়ল। ভারী কেবলটা ফেলে দিয়ে আমি দৌড়লাম ট্রাকের দিকে। আমি দু'পাও এগোয় নি এমন সময় নেগুয়েত্ এক অস্বাভাবিক জোরে আমাকে একটা শক্ত ও গভীর গর্তের ভেতর ঢুকিয়ে দিয়ে শান্ত গলায় বললে—"বোমা পড়া শুরু হয়েছে।" একটা আগুনের ঝলক কাঁপিয়ে দিল আমাকে। কেঁপে উঠল আমার পায়ের তলার মাটি। ক্ষণিকের নিস্তব্ধতায় আমি শুনতে পেলাম ঝিঁঝিঁপোকার পাখাঝাপটানির শব্দ। তারপরই হঠাৎ বৃষ্টির মতো

ঝরে পড়তে লাগল মাটির ঢেলা, পাথরকুচি আর গাছের ভাঙা ডালপালা। আমি বুঝতে পারলাম দুটো কাঠের গুঁড়ির মাঝখানে আটকে গেছি আমি। গুঁড়ি দুটোর মাঝে কোনরকমে একজন মানুষ দাঁড়াবার মতো ফাঁক আছে। বাইরে একটা গাছের গুঁড়ির আড়ালে লুকিয়ে আছে নেগুয়েত্। দুটো নতুন বিমান পাক খেয়ে নেমে আসছে নিচের দিকে। আমি নেগুয়েতের হাত ধরে তাকে টেনে হিঁচড়ে আশ্রয়স্থলের দিকে নিয়ে গেলাম। সে খুব ধস্তাধস্তি করতে করতে চেঁচিয়ে বললো—"আগে তুমি নিরাপদ আশ্রয়ে ফিরে যাও। যদি তুমি আহত হও তোমার ট্রাকের মালগুলো নষ্ট হবে।"

আমি কোনোমতে তাকে মাটি থেকে তুলে সেই দুটো কাঠের গুঁড়ির ফাঁকে ঢুকিয়ে দিয়ে আমার ট্রাকের দিকে ছুটলুম।

২০ মিলিমিটার গোলার বিস্ফোরণের রাত্রির বুকে এঁকে দিল রক্তরেখা! তারই তপ্ত হাওয়ার দাপটে আমার মুখ জ্বালা করতে লাগল। ট্রাকটা তখনও দাঁড়িয়ে আছে কিন্তু আগুনের শিখা প্রায় গ্রাস করতে চলেছে টায়ারগুলোকে। আমি তাড়াতাড়ি আগুন নিভিয়ে গাড়ির ভেতর ঢুকে ইঞ্জিন চালু করলাম। নেগুয়েত্ আবার আমার সঙ্গে ছুটে এসেছিল। সে বললো—"তাড়াতাড়ি কর। ওরা এবার পারঘাটার ওপর বোমা ফেলবে।"

"আমারো তাই মনে হয়।"

কাছেই একই সঙ্গে ফাটলো অনেকগুলো বোমা। তার ধাক্কায় মাটিতে ছিট্‌কে পড়ল নেগুয়েত্। আমি তাকে গাড়িতে টেনে তুলে নিয়ে গাড়ির দরজা বন্ধ করে দিলাম। তারপর নিশ্ছিদ্র অন্ধকারে তার নির্দেশ অনুযায়ী গাড়ি চালাতে লাগলাম।

বিমানগুলো আমাদের মাথার ওপর দিয়ে গর্জন করে চলে যাচ্ছিল। তারা মাটির প্রায় কাছাকাছি নেমে এসে ২০ মিলিমিটার বন্দুক থেকে গুলি ছুঁড়ে আগুন জ্বালিয়ে দিচ্ছিল চারিদিকে। সেসব গ্রাহ্য না করে আমি নেগুয়েতের সঙ্গে গাড়ি চালিয়ে এগোতে লাগলাম। নেগুয়েত্ স্থির ও স্পষ্টস্বরে বলে যাচ্ছিল—"বাঁদিকে চল···সামনে ডানদিকে বোমার তৈরি গর্ত আছে···খুব সাবধান, ডানদিকের বাঁকটা গড়ানে আছে···"

আমরা যখন একটা দুর্গম অন্ধকার জায়গায় এসে পড়লাম তখন সে লাফিয়ে গাড়ি থেকে নেমে এগিয়ে যেতে লাগল আর আমি তার সাদা পোশাকের দিকে লক্ষ্য রেখে ধীরে ধীরে সেই পথে গাড়ি চালাতে লাগলাম।

প্রায় দু'কিলোমিটার এইভাবে যাওয়ার পর আমি একটা গাছে ঢাকা গড়ানে জায়গার পাশে আমার ট্রাকটা দাঁড় করালাম। গাড়ির আলোটা ঘুরিয়ে প্রথমেই আমি দেখলাম নেগুয়েতের কাঁধ বেয়ে রক্ত ঝরছে। তার গায়ের নীল রঙের

জামার একটা হাতা রক্তের দাগে ভরা। এই আঘাত লাগল কখন ?—সে যখন আমাকে নিরাপদ আশ্রয়ে রেখে বাইরে দাঁড়িয়েছিল তখন, না যখন সে ট্রাকের দিকে ছুটে এলো সেই সময়ে ?

একটা শ্রদ্ধামিশ্রিত অনুরাগে ভরে উঠল আমার সারা মন।

একমুখ হাসি নিয়ে সে তার হাতের ক্ষতটা নিরীক্ষণ করল। মুখে সামান্য পাণ্ডুরতা সত্ত্বেও অপূর্ব দেখাচ্ছিল তাকে। মাথা থেকে পা পর্যন্ত ভিজে গিয়েছিল সে। আমি আমার তেলকালি মাখা রুমালটা দিয়ে একটা ব্যাণ্ডেজ বেঁধে দিলাম আর বললাম—"চল তোমাকে পেঁৗছে দিয়ে আসি পারঘাটার অপর পারে তোমার শাখার কর্মীদের কাছে।"

সে কিন্তু বাধা দিয়ে বললো—"আমি তো নিজের জায়গায় পেঁৗছে গেছি। তুমি যাত্রা শুরু কর আবার—কারণ সকাল হতে বেশি দেরি নেই আর।"

সে হাসতে হাসতে বললো—"কিছু ভেবোনা, সামান্য আঁচড় লেগেছে আমার, আর কিছুই হয় নি। এখন থেকে ভোরের মধ্যে আমি পৃথিবীর অপর প্রান্তে চলে যেতে পারি।"

বন-মোরগগুলো ডেকে উঠল জঙ্গলে।

ট্রাকটা ছেড়ে আমার কোথাও যাওয়া সম্ভব নয় বুঝে নিজেকে সংযত করলাম আমি। নেগুয়েত্‌কে বিদায় সম্ভাষণ জানালাম। কিছু অতিরিক্ত সময় নিয়ে করমর্দন করলাম তার সঙ্গে। রক্তে ভেজা তার হাত। আমি অঙ্গীকার করলাম—"আগামীকাল ফেরার পথে আমি তোমার সঙ্গে দেখা করে যাব।"

গাড়িতে উঠে খুব দ্রুতগতিতে গাড়িটা চালিয়ে আমি ফ্রন্ট লাইনের দিকে এগুতে লাগলাম। আমার মন ভরে গেল নেগুয়েতের জন্যে সুখমিশ্রিত উদ্বেগে। চোখে ভাসতে লাগল তারই তন্বী দেহটি, গায়ের নীল জামা। আমারই রুমালে ব্যাণ্ডেজ বাঁধা তার দেহে, হাতে বাস্কেট, মাথায় কোনাচে টুপি আর চাঁদের আলোয় সদ্য ধোয়া অপূর্ব মুখখানি।

"বল বল—বলে যাও।" সজাগ হয়ে বসে থাকা শ্রোতার দল বলে উঠল "তুমি নিশ্চয়ই যে করে হোক ওই ঝোলানো সেতুতে কাজকরা মেয়ের দলকে দেখতে গিয়েছিলে ?"

রাত তখন নিশ্চয়ই দু'টো-তিনটে হবে। ঝোপের মোরগগুলোর ডাক শোনা যাচ্ছে। পাখিদুটি দুজনে দুজনকে সারারাত ডেকে ডেকে হয়তো পেঁৗছতে পেরেছে দু'জনের কাছাকাছি।

অন্ধকার কোণ থেকে লোকটি আবার শুরু করল তার কাহিনী।

এতো তাড়াহুড়ো করেও কিন্তু ডিপোয় পেঁৗছে মালখালাস করতে করতেই

সকাল হয়ে গেল। ডিপোর ধারে ট্রাকটাকে লুকিয়ে রাখার মতো শুধু একটু সময় পেলাম আমি। এখন আবার গাড়িটাকে ভাল করে ঢাকা দেবার জন্যে গাছের ডালপালা জোগাড় করতে হবে, পেট্রোল ভরতে হবে, তারপর নিজের খাবার তৈরি করতে হবে। কি বিরক্তিকর কাজ। একটা ছুটির দিন বৃথাই কেটে যাবে।

পরের সন্ধ্যায় নতুন করে আদেশ পেলাম আমি ফ্রন্টলাইনের অপর পারে যাবার। এবার আমার সেই বোনের সংগে দেখা করবার সময় মিললো। সে থাকে পারঘাটার ঝোলানো সেতু মেরামতির কাজে নিযুক্ত মেয়েদের দলের সংগে।

জংগলের ভেতর সুন্দর সুন্দর কুটীরে থাকত এই মেয়েরা। তোমরা তো জানো মেয়েরা আমাদের মতো নয় একেবারেই। ওরা যেখানেই থাকুক সেখানটাই সুন্দর করে সাজিয়ে গুছিয়ে থাকে। তাদের ওখানে সবকিছুই সুন্দর, পরিষ্কার, পরিচ্ছন্ন। একটি করে খাবার ঘর আছে, ক্লাব আছে।

আমাকে সানন্দে অভ্যর্থনা জানাল শুধু আমার বোন টিনু-ই নয় অন্য সব আমুদে দুষ্টু মেয়ে কর্মীরাও। তাদের হাসি ঠাট্টায় যোগ দেবার মতো মানসিক অবস্থা ছিল না ত নে আমার। আমি প্রথমেই টিনু-এর মুখের দিকে চেয়ে তার মনের ভাব বুঝতে চেষ্টা করলাম। দু'দিন আগে আমার দৃঢ় ধারণা ছিল যে আমারই জন্যে চিরপ্রতীক্ষারতা আসল নেগুয়েত্-এর সংগেই দেখা হয়েছে আমার। কিন্তু এখন এক অজানা ভয়ে আমার মনে হচ্ছে যে আসল নেগুয়েত্ হয়তো সেই—যে চারমাস আগে বরণ করেছে বীরাঙ্গনার মৃত্যু।

ঘরের মধ্যে নিয়ে গিয়ে টিনু আমাকে ভর্ৎসনা করে বলল—"পরশু দিনে তুমি এলে না কেন? নেগুয়েত্ সারাদিন তোমার জন্যে অপেক্ষা করে বসেছিল। সে সপ্তাহে মাত্র একদিন ছুটি পায় সন্ধেবেলাতেই ওকে ফিরে যেতে হয় হেড্ কোয়ার্টারে।

আমি হাল্কা সুরে জিজ্ঞাসা করলুম—"ওখানে কি করতে যায় ও?"

"ওখানে পার্টির নতুন কর্মীদের ও কাজ শেখাতে যায়।"

আমরা যখন নেগুয়েতের সম্পর্কে কথা বলছিলাম ঠিক তখন প্রায় চল্লিশ-বিয়াল্লিশ বছরের এক গাট্টা গোট্টা ভদ্রমহিলা বাঁশের কোঁড়া ভর্তি দুটি ঝুড়ি বুকে চেপে ধরে সবেগে ঘরে ঢুকলেন। "কে ল্যাম্? —টিনু তোমার ভাই তাহলে এসে গেছে—আর আমার সংগে তুমি এখনও তার পরিচয় করিয়ে দাও নি?"—মুখের ওপর কথাটা বলেই সে বিশাল হাত-দিয়ে আমাকে জাপ্টে ধরল। "কি সুন্দর ছেলে। তুমি কি ট্রাক ড্রাইভার? তুমি জানো—কি করেছ তুমি?"

টিন হাসি চাপল। আমার অসোয়াস্তি হচ্ছিল। পরের মুহূর্তে আমি

জানতে পারলাম এই হলো 'বৃদ্ধা' নেগুয়েত্, ক্যান্টিন পরিচালনা করেন ইনিই। টিন্-এর সঙ্গে এঁর অনেক দিনের পরিচয়।

আমি এদের হাসিঠাট্টার খোরাক হয়ে রইলাম। 'বৃদ্ধা' নেগুয়েত্ আমাকে প্রশ্নবানে জর্জরিত করতে লাগলেন। কেন আমি ঐ ছোট্ট মেয়েটাকে অপেক্ষা করিয়ে মারছি, 'হ্যাঁ' কি 'না'—এটা তাকে বলা আমার উচিত ছিল। তিনি বর্ণনা করে শোনালেন—দু'দিন আগে মেয়েটি কিভাবে একটা মিলিটারী ট্রাকে করে আসছিল আর এখান থেকে অনেকটা দূরে ট্রাকটা কিরকম বোমার মুখে পড়েছিল। বরাত ভালো যে মেয়েটার হাতে সামান্য চোট লেগেছে শুধু।

তিনি বলে চললেন—"তুমি কিন্তু এখনো দেখ নি তাকে" বলে আমাকে সামনের দিকে টেনে এনে পুরনো কার্ডবোর্ডের টুকরোয় আটকে দেওয়ালে ঝোলানো অন্যান্যদের ছবির সঙ্গে একটা ছোট্ট ছবির দিকে নিয়ে গেলেন। তিনি নেগুয়েতকে চেনাবার আগেই আমি চিনে নিলাম তাকে। ছবিটা বোধ হয় কয়েক বছর আগে তোলা, কারণ তাকে খুব ছেলেমানুষ দেখাচ্ছিল। একটা ঢালু জায়গার মাঝামাঝি দাঁড়িয়ে আছে সে, কাঁধে ড্রিলিং মেসিন—তার নিকষ-কালো চোখে সরলতা আর অতলতা। দা ক্লান সেতুর কাজ শুরুর দিনগুলো ছিল কি উৎসাহ আর উদ্দীপনাময়—সেই কথা মনে পড়ল আমার। নানারঙের পাথরের চুড়োটার ওপর হেলান দিয়ে, পারঘাটার বাম তীরের দিকে মুখখানি ঘুরিয়ে দাঁড়িয়ে আছে নেগুয়েত্। প্রায় একশো' মেয়ে কাজ করত পাথর-কাটাইয়ের দলে। কোমরে একটিমাত্র সেফ্টি বেল্ট্ সম্বল করে তারা নির্ভয়ে খাড়া পাহাড়গুলোর ওপর উঠে যেত সেতুটা তৈরি করবার জন্যে সুন্দর রঙের পাথরের চাঙড় খুঁজতে। দু'বছর পরে শেষ হলো কাজ। স্বপ্নের মতো সুন্দর পান্নারঙের সেতুটি গড়ে উঠল। কিন্তু মাত্র কয়েকমাস পরেই শত্রুর আক্রমণে ধ্বংস হলো সেটা বোমার আঘাতে।

সেই সন্ধ্যায় টিন্ আর 'বৃদ্ধা' নেগুয়েত্ আমাকে পারঘাটার কাছে নিয়ে গেল। নেগুয়েত্ তার বিশাল হাতটি নেড়ে বললো—"কতো কাছের লোক তার কাছে বিয়ের প্রস্তাব করেছে—তবু সে কিন্তু তোমারই জন্যে অপেক্ষা করে থেকেছে। আমি লক্ষ্য রাখছিলাম তুমি পালাও কি না। আমার ভালোবাসার ডোর নেই, কিন্তু শুয়োর বাঁধার দড়ি আছে।" তুমি যদি পালাও তাহলে সেইটে দিয়েই আমি টেনে আনব তোমাকে। উত্তরে আমি চট করে তার ময়লা রান্নার ব্যাগের ভেতর একটা চিঠি গলিয়ে দিলুম। সেদিন দুপুরেই এটা লিখে-ছিলাম আমি—আমার প্রথম প্রেমপত্র।

জঙ্গলের শেষপ্রান্তে পেঁছে আমার ট্রাকটা যেখানে লুকোনো আছে সেখানে চট করে যেতে পারলাম না আমি। সেতু পর্যন্ত নদীর ধারে ঘুরে

বেড়াতে লাগলাম। নদীর সেই পশ্চিমপাড় তীরভূমি সমেত ঢেকে গেছে আগাছায়। বোমার আঘাতে তৈরি গর্তগুলোর জলে প্রতিবিম্বিত হয়ে আছে জঙ্গলভরা পাহাড়ের চূড়োগুলো। সেতুটি ভেঙে দুভাগে ভাগ হয়ে গেছে, দেখে মনে হয় যেন কুঠারের আঘাতে দু'টুকরো করা হয়েছে এটাকে। তিনটি খিলেন ভেঙে গেছে। জলের মধ্যে দেখা যাচ্ছে সবুজ পাথরের চাঙড়গুলো—তার মধ্যে আকাশের দিকে মুখ তুলে দাঁড়িয়ে আছে দুটি স্তম্ভ। নদীর তীরে দাঁড়িয়ে এই সেতুর ধ্বংস স্তূপের দিকে তাকিয়ে আমি প্রশ্ন করলাম নিজেকেই—"কি করে এই ধ্বংস আর মৃত্যুর মাঝে দাঁড়িয়ে চোখের সামনে নিজের কঠিন পরিশ্রমে গড়া জিনিসগুলি ভেঙে পড়তে দেখেও নেগুয়েত্ এতো বছর ধরে আমার ওপর বিশ্বস্ত হয়ে রইল? বোমার সহস্র আঘাতও কি এই মেয়েটির কোমল মনের বিশ্বাস ও ভালোবাসায় এতটুকু চিড় ধরাতে পারল না?"

এই কাহিনীর কথক থেমে গেল হঠাৎ। সে যেন শুনতে চাইল তার আপন হৃদয়ের কথা। শ্রোতারা নির্বাক। তাকে গল্প বলে যাবার অনুরোধ জানাতে ভুলে গেল সবাই। কিছু বলার কথা কল্পনাই করতে পারল না তারা।

রাত্রি শেষ হয়ে এলো। পাখিদুটি পরস্পরের সংগে মিলিত হয়ে এখন নীরব।

দিকচক্রবালের অন্ধকার ফিকে হয়ে এলো। গাছের সারির ওপর দিয়ে ধীরে বেরিয়ে এলো চাঁদ। ঘরের চালার মাথার ওপর গাছের পাতাগুলোকে চাঁদের আলোয় রুপোর থালার মতো দেখাচ্ছিল। শেষ রাতের চাঁদের আলো অজস্রধারায় ছড়িয়ে পড়ল চালা ঘরের ছাদে আর ঘরে ঢোকবার ক্ষতবিক্ষত পথের ওপর।

কাহিনীর কথক চাঁদের আলোর রুপোর পাতে মোড়া আকাশের দিকে চাইল একবার। তারপর কমরেডদের দিকে ফিরে বললো—"এসো এবার আমরা ঘুমোই। কাল আবার শুরু হবে আমাদের পথ চলা।"

নদী তীরে অচিন কথা

ত্রান্ কিম থান্

বিকেল চারটের সময় আমরা পাঁচজন থাক্ বা-র উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করেছি। আমাদের মধ্যে ছিল দু'জন সাংস্কৃতিক শাখার লোক, একজন কারিগরি শাখার, একজন প্রত্নতাত্ত্বিক ও অপরজন হ্যানয় পত্রিকার সাংবাদিক। ড্রাইভার আমাদের আশ্বাস দিয়েছিল তুয়েন্ কোয়াঙ-এ আমরা রাতটা কাটাতে পারব। কিন্তু হিয়েন্ নদীর ঘাটে ওপার থেকে নৌকাটা যখন আমাদের পার করবার জন্যে এগিয়ে আসতে শুরু করল, ঠিক তখনই তার ইঞ্জিনটা একবার গর্জন করেই থেমে গেল। রঙিন টি-সার্ট পরা মেকানিকরা ইঞ্জিন মেরামতির কাজ শুরু করেছে, আমাদের বেশ কিছুক্ষণ অপেক্ষা করতে হবে বুঝেই আমরা কাছেই একটা ঘাসে ঢাকা জায়গায় চলে গেলাম। ছোট ছোট ঝোপের মধ্যে বসে পড়লাম আমরা। ঝোপের ছোট ছোট পাতাগুলো শিশিরে ভিজে চিক্ চিক্ করছে আর তার প্রত্যেকটিতে ফুটে উঠেছে অপর পারের অন্ধকার ঢাকা গাছের ওপর দিয়ে সদ্য বেরিয়ে আসা প্রায় পূর্ণচাঁদের প্রতিবিম্ব।

আমাদের মধ্যে প্রায় সকলেই এই প্রথম থাক্ বা যাচ্ছি। ওখানে যে বিরাট কর্মযজ্ঞ চলেছে সেটাই আমাদের প্রধান আকর্ষণীয় বিষয়। আমাদের মধ্যে একমাত্র সাংবাদিক তুয়ান্ ওখানে গেছে আগেই। ওঁর প্রবন্ধ থেকেই আমরা আমাদের দেশের উত্তরে সব থেকে বড় জলবিদ্যুৎ কেন্দ্রের কথা পড়েছি। তাই ফেরির জন্যে আমাদের অপেক্ষা করতে হবে জেনে আমরা তাকে থাক্ বা সম্বন্ধে আমাদের আরো কিছু বলতে অনুরোধ করলাম।

তুয়ান্ হাতের ওপর ভর দিয়ে আরাম করে সিগারেটে টান দিলেন। সিগারেটে ওর ভীষণ আসক্তি। জ্বলন্ত আকাশের নিচে ট্রাকের ওপর বসেও একের পর এক সিগারেট টেনে গেছেন বড় বড় ধোঁয়ার কুণ্ডলী ছড়িয়ে।

"না, আমার ওই প্রবন্ধে ওখানকার বিশাল কর্মকাণ্ড বা ওখানকার লোকদের সম্বন্ধে কোন বাস্তবরূপ ফুটিয়ে তোলাই সম্ভবই হয় নি।"...

"তুমি ওই রকমেরই কথাকার যাঁরা বাস্তবের মুখোমুখি হলেই নির্জীব হয়ে পড়েন।" হুংকার দিয়ে বলে উঠলেন প্রত্নতাত্ত্বিক, এইমাত্র যিনি কথা বললো, যদিও তিনি এখনো পুরোপুরি যৌবনোত্তীর্ণ হন নি, দেখতে তাঁকে

কিন্তু অবিকল প্রত্নতাত্ত্বিকেরই মতো। এলোমেলো মাথার চুলের ভেতর এখনই দু'একটি পাকাচুলের দেখা পাওয়া যাচ্ছে, চোখের চশমার কাঁচটা বোতলের কাঁচের মতো পুরু। আর মুখে ঠাট্টা টিট্‌কিরি লেগেই আছে সর্বদা।

আর একটা সিগারেট ধরাবেন বলে আগের সিগারেটের টুকরোটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে তুয়ান্‌ বললেন—"সেটা অবশ্য সত্যি। তবে এ বাস্তবতাটা এমন কিছু অসাধারণ নয় যা ভাষায় বর্ণনা করা যায় না। কিন্তু পাঁচবার থাক্‌ বা গিয়েও আমি এখনও এটাকে বিভিন্ন দিক দিয়ে ব্যাখ্যা করে উঠতে পারি নি। তোমরা যদি শুনতে চাও তো আমি আমার প্রথম থাক্‌ বা দেখার অভিজ্ঞতার কথা বলতে পারি।" সিগারেটে একটা লম্বা টান দিয়ে অনেকক্ষণ চুপ করে রইলেন, মনে হলো তিনি যেন তাঁর পুরনো স্মৃতিটা মনে মনে ঝালিয়ে নিচ্ছেন, তারপর শুরু করলেন তাঁর কাহিনী।

এটা সেই ১৯৬…এ যখন ওখানে সবে কাজ শুরু হলো। তখন ওখানে ছিল একটিমাত্র ছোট কর্মীদল আর কিছু প্রযুক্তিবিদ্‌ যারা একটি অংশকে মাপজোখ করে দুভাগ করেছিল ওই ভাগদুটোকে বাঁধের জলে প্লাবিত করা হবে বলে। আমাদের কাগজের সম্পাদক তখন আমাকে ওখানে পাঠিয়েছিলেন প্রাথমিক সংবাদ সংগ্রহের জন্যে।

তখন সকালবেলায় আমি ওদের কাজের জায়গার কমিটি ডিরেক্টরদের সঙ্গে কাজ করতাম, তারপর একটি কেবিনে যেতাম সেটা ছিল উপত্যকার গভীরে। এখন সেটা নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে জলাধারের অতলে। তারপর এক ক্লান্তিকর ট্রেনযাত্রার পর আমার ঠিক যে ধরনের স্নানের প্রয়োজন ঠিক সে রকম স্নান করে আমি কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিতাম। ওরা যখন খাবার ঘণ্টা বাজাতো আমি তখন ঘুম থেকে লাফিয়ে উঠতাম। কোনো জায়গা থেকে একটা পাত্র আর চপ্‌স্টিক্‌ ধার করে অফিসের কর্মীদলের পেছন পেছন উঠতে শুরু করতাম পাহাড়ের ধারের সদ্য তৈরি খাবার ঘরের দিকে। একদল যুবতী নারীকর্মী আমাদের আগে আগে চলেছে। তারা খাবার নেবার ধাতুর পাত্রটির গায়ে চপ্‌স্টিক দিয়ে তাল দিতে দিতে গান গাইত। তাদের দুষ্টুমিভরা গানের মজাদার দু'একটি কথা শুনলেই আমার হাসি পেত।

ও আমার প্রাণের সখা
বলিতে মন সরেনা
পিরিতি আর কোরোনা
মিনতি করি, ধরি পায়।
ছোট মোর হৃদয় খানি
চূর্ণ বালিতে পড়েছে গাঁথা

কে বোঝে আমার ব্যথা
তুমি না শোন যদি হায়।

যে যুবতী কর্মীটি গান গাইছে তাকে একটু দেখার জন্যে পা চালালাম আমি। গাঁথনীর কাজ করা কর্মীদের মতো তার পরণে ছিল মোটা ক্যানভাসের ঢোলা পোশাক, সিমেন্টবালির ছিটেলাগা একটি নীল টুপি ছিল তার মাথায়। একথা কিন্তু হলফ্ করে বলা যায় যে তার মুখখানি একেবারে নিখুঁত অপূর্ব সুন্দর। চওড়া কপাল, উজ্জ্বল দুটি চোখ, ছোট্ট খাড়া নাক। খাওয়ার সময় প্রায় সমস্তক্ষণই তাকে দেখতে থাকলাম আমি। বাক্‌পটিয়সী, হাস্যময়ী মেয়েটি তার সংগীসাথীদের সংগে সমস্তক্ষণ ঠাট্টা-টিট্‌কিরি আর মজা করছিল। আমি তার নামের প্রথমটুকু জানতে পারলাম। নাম তার এ্যান্‌হ—যার মানে হলো উজ্জ্বলা।

বিকেল বেলা আমার ছবি তোলার সাজসরঞ্জাম নিয়ে আমি কাজের জায়গায় গেলাম। তখন মাপজোক করার জন্যে জায়গাটা সাদা রঙের কাঠের বেড়া দিয়ে ঘেরা ছিল। আর সেই সংগে এক সার কুঁড়ে ঘর আর কয়েকটি বাড়ি ছিল সেখানে। সেগুলো সবই গড়ে উঠেছিল পাহাড়ের ধার ঘেঁসে। আমি দেখলাম কাজের জায়গা থেকে কিছুটা ওপরে কর্মীদের জন্যে যে বাড়ি-গুলো তৈরি করা হবে তারই ভিতরে গাঁথনীর জন্যে যে চৌকো পাত্রগুলি প্রয়োজন হয় সেইরকম একটি নতুন চৌকো পাত্রের গায়ে সিমেন্ট লাগাতে খুব ব্যস্ত রয়েছে এ্যান্‌হ্। ঐ যুবতী সুন্দরী কর্মীটি ভারায় চড়ে যেন ওই বিরাট জলবিদ্যুৎ কেন্দ্রের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করছে। এক যান্ত্রিক অভ্যাস-বশেই আমি আমার ক্যামেরায় ওই সুন্দর দৃশ্যটি ধরে রাখতে চাইলাম চিরকালের জন্যে। কিন্তু মেয়েটি যখনই আমাকে ক্যামেরাটা হাতে নিতে দেখল তক্ষুনি সে তার কোনাচে টুপিটি নিজের মুখের ওপর টেনে দিয়ে পিছন ফিরে হাসিতে ফেটে পড়ল। তাকে যথাসম্ভব বোঝাতে চেষ্টা করলাম, আমি অনেক অনুরোধও করলাম, প্রচুর যুক্তিও দেখালাম তবু সে দ্বিধাগ্রস্তভাবে আরক্তিম মুখে মাথা নেড়ে আপত্তি জানাল।

"আমার ছবি তুলবেন না"-সে বললো—"আমি সবে এসেছি এখানে। কাজের জায়গায় অনেক অভিজ্ঞ কর্মী আছেন—তাঁদের কর্মদক্ষতারও অনেক ভালো রিপোর্ট আছে।"

ছেড়ে দেবার আগে তাকে জিজ্ঞেস করলাম এখানকার মহিলা কর্মীরা কোথায় থাকেন? সে বাঁশের চালাযুক্ত অনেকগুলো ঘরের দিকে আঙুল দেখিয়ে সন্ধেবেলা আমাকে সেখানে যাবার জন্য আমন্ত্রণ জানাল।

তখন বিশেষ কারণবশতই ওখানে কাজের জায়গায় বিদ্যুতের আলোও ছিল

না বা কোন যান্ত্রিকতার চিহ্নও ছিল না। এখন সেখানে দিনরাত্রি যন্ত্রের ঘর-ঘরানি চলছে তো চলছেই। বালি আর পাথরভর্তি মালগাড়িগুলো—যেগুলো ওল্টানো যায়, তাদের যাতায়াতের লাইনে সবসময় আলোর ঝলকানি লেগেই আছে। বাঁধ বরাবর দাঁড় করানো ক্রেনের হাতলগুলোতে রঙিন আলোর মালা—এসব কিছুই ছিল না তখন। ওই ছোট্ট কুটিরগুলোর তেলের বাতিগুলো থেকে তখন আলোর চেয়ে ছায়াই ছড়াতো বেশি। একজন তরুণ হিসাব পরীক্ষককে দিয়ে ট্রানজিস্টার রেডিও তৈরি করালে তা' থেকে যেমন সুরের চেয়ে বিকট শব্দই বেশি বেরোয় তেমনি ঐ ছোট ছোট কুটিরগুলোতে যে তেলের বাতি-গুলো জ্বলছিল সেগুলো আলো দেওয়ার চেয়ে অন্ধকারই বেশি ছড়াচ্ছিল। এ্যানহ্-র নিমন্ত্রণ পেয়ে আমি হাতে একটি ফ্ল্যাসলাইট নিয়ে ওই ঘরগুলির দিকে তাকে খুঁজতে গেলাম।

একজন ভদ্রলোক প্রথমে আমাকে অভ্যর্থনা করে তার কাছে নিয়ে গেল। সুন্দরী গাঁথনির কাজ করা কর্মীটি বিবাহিতা এবং সন্তানের জননী। তার ছেলে প্রথম শ্রেণীতে পড়ে আর সারাদিন স্কুলেই থাকে। তার স্বামী এইমাত্র হ্যানয় থেকে ফিরেছে। আমার সংগে করমর্দন করে আমাকে তার পরিচয় জানাল। আমি আরো খুশি হলাম যখন শুনলাম তার স্বামী গাঁথনি কর্মীদলের প্রধান এবং অন্য অনেক কাজের জায়গা থেকে সে প্রচুর খ্যাতি অর্জন করেছে।

তার নাম ভিয়েত। সে তার স্ত্রীর চেয়ে প্রায় এগারো-বারো বছরের বড়। তাদের দুজনের মধ্যে পার্থক্য কিন্তু এইটুকুই নয়। এ্যানহ্ হলো খুব ছেলে-মানুষ, হাশিখুশি বেশ চোখে পড়ার মতো মেয়ে আর তার স্বামী বিশাল আর বেশ বাকপটু লোক। তার পিঠের বোঝা থেকে সে তার ছেলের জন্যে কেনা উপহারগুলো বার করল। আর একটি প্যাকেট খুললো সে তাতে দুটি ব্লাউজ সযত্নে খবরের কাগজ দিয়ে মোড়া।

এ্যানহ্ অতিথি আপ্যায়নের জন্যে চা তৈরি করছিল। রঙিন ছাপা পপ-লিনের নিখুঁত কাটছাটওলা ব্লাউজগুলো দেখে উজ্জ্বল চোখে স্বামীর কাছে ছুটে এলো "ও-গুলো হয়ে গেছে"? শিশুর মতো সরল হাসিতে মুখখানি ভরিয়ে তুলে সে একটি জামা উঁচু করে তুলে ধরে নিজের গায়ের ওপর ফেলে জামাটা তাকে কেমন মানাবে দেখতে লাগল।

"দর্জি যাতে এগুলো শেষ করে দিতে পারে সেইজন্যে আমার আসা পিছিয়ে দিতে হলো সন্ধের ট্রেন পর্যন্ত। দর্জি বললো মাপের জামা থেকে এগুলো বড় করে কেটে ফেলেছিল এবার। কো-অপারেটিভে এখন ভীষণ কাজের চাপ চলেছে।" বয়সে অনেক ছোটদের সংগে কথা বলবার সময় বড়দের

মুখে যে কোমল হাসির আভাস পাওয়া যায়, স্ত্রীর সঙ্গে কথা বলবার সময় ভিয়েত-এর রুক্ষ চোকো মুখে সেই হাসির আভাস ফুটে উঠল।

এই দম্পতি যদিও খুবই আগ্রহের সঙ্গে আমাকে চা খাওয়াতে লাগল তবুও ওদের পরস্পরের প্রতি মধুর উষ্ণ আকর্ষণ দেখে, যেটাকে আমি ঠিক কি ভাবে প্রকাশ করব জানি না...এ্যানহ-এর ভিয়েত-র মতোই তার স্বামীর প্রতি সমান মধুর উষ্ণতা দেখে...আমার নিজেকে ওদের মধ্যে কেমন বেমানান লাগতে লাগল। আমি তাড়াতাড়ি করে ওদের কাছ থেকে বিদায় নিলাম।

সন্ধের বাকি সময়টুকু আমি কাজের জায়গার প্রথম অংশের যিনি প্রধান তাঁর কাছ থেকে কিছু খবরের প্রত্যাশায় অপেক্ষা করে রইলাম। তারপর ওঁকে কথায় কথায় ভিয়েত-এর কথাও বললাম। তাঁকে জানালাম যে ভারায় চড়া অবস্থায় আমি ওর স্ত্রীর একটি ছবি তুলতে চাই।

"আপনার ম্যাগাজিনের জন্যে ছবির বেশ ভালো বিষয়বস্তু হবে ওর স্ত্রী।" দক্ষিণের ভাষায় বিশিষ্ট ভঙ্গিমায় কথাগুলো বললেন তিনি। "ওর স্ত্রী সবেমাত্র বেশ নামকরা গাঁথনী কর্মী সমাবেশ থেকে এখানে এসেছে।"

"কিন্তু সে তার ছবি তুলতে দেয় নি আমাকে।"

"ধ্যেৎ, কেন?"

"আমার মনে হয় এটা তার বিনয়।" সে আমাকে বললো—সে এখানে নতুন এসেছে। "কাজের জায়গায় অনেক ভালো কর্মীর দেখা পাবেন।"

শাখাপ্রধান হাসিতে ফেটে পড়লেন। দাড়ি চুলকে আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন—"ও কাকে উদ্দেশ্য করে কথাটা বলেছে জানেন?"

"না, আমি জানি না—আপনাকে জিজ্ঞেস করতে যাচ্ছিলাম ওই কথাটাই।"

"দুষ্টু মেয়ে। ভারার ওপর দাঁড়িয়ে নিখুঁত কাজ করার ওর কোন জুড়ি নেই। কিন্তু যেখানেই প্রশংসা বা প্রচারের ব্যাপার সেখানেই সে তার স্বামীকে এগিয়ে দেবে সব সময়।" —বলে তিনি মুখ টিপে হাসতে লাগলেন।

আমার কৌতুহল জাগিয়ে তোলার পক্ষে এটাই যথেষ্ট খবর। এই দম্পতির মিলন বাহ্যতঃ বড়ই বেমানান। একটি তাজা সুন্দরী যুবতীর স্বামী একজন অমার্জিত তাগড়াই প্রৌঢ়। একটি দুষ্ট চঞ্চল কাঠবিড়ালীকে একটি বেয়াড়া ভাল্লুকের সঙ্গে কল্পনা করে আমার খুব হাসি পেল।

এই শাখার প্রধান ভিয়েত-এর একজন পুরনো বন্ধু আর ভিয়েত তাঁর শাখারই অঙ্গবিশেষ। বিভিন্ন পরিকল্পনায় তাঁরা দুজনে একই সঙ্গে কাজ করেছেন। পরের কয়েকটি দিনে আমি বিভিন্ন লোকের কাছ থেকে ওই দম্পতি সম্পর্কে আরও অনেক খবর জানতে পেরেছিলাম।

অতীতে এ্যানহ হ্যানয়-এ একটি মাধ্যমিক স্কুলে পড়ত। ওর বাবা এমনই

[illegible] নামকরা দর্জি ছিলেন যে সাজপোশাক সম্বন্ধে খুব সচেতন যাঁরা তাঁদের [illegible] তাঁকে কোন বিজ্ঞাপন দিয়ে পরিচিত হবার দরকার হতো না। প্রতিদিন প্রায় আধ ডজন করে যুবক যাদের বড় বড় চুলগুলো বেশ সযত্নে আঁচড়ানো, যাদের পরণে থাকত কড়া ইস্ত্রিকরা প্যান্ট, তারাই হাতে কাপড় ঝুলিয়ে একটা নোংরা সাইকেলের দোকানের ভেতর দিয়ে এক পোকা-খাওয়া কাঠের সিঁড়ি বেয়ে উপরের তলায় একটি বিশেষ ঘরে হাজির হতো। ওই ঘরটিই ছিল সেই দর্জির বাড়ি ও দোকান। ওই দোকান থেকে যে সুন্দর ফিট্ করা "জীনস্" আর নিখুঁত সেলাই করা সার্টগুলো বেরিয়ে আসত সেগুলোর মজুরি প্রায় দ্বিগুণের চেয়ে বেশি ছিল। কো-অপারেটিভ থেকে যেগুলো তৈরি হতো তার চেয়ে এর ছাটকাট ছিল অনেক উচ্চাঙ্গের। দাম বেশি হলেও এই নবীন ফুল-বাবুরা এগুলোকে খুবই পছন্দ করত।

দ্বিতীয় শ্রেণীর পড়া ভালোভাবে শেষ না করতে পারার জন্যে এ্যান্‌হ-কে তৃতীয় শ্রেণীতে নেওয়া হলো না। যদিও এটা খুব একটা আনন্দের কথা নয় তবু এ্যান্‌হ এতে কেঁদে ফেলবার মতো কিছু খুঁজে পেল না। বাড়িতে অনেকদিন থেকেই সহকারী হিসেবে সে তার বাবাকে সেলাইয়ের কাজে সাহায্য করত। একদিন তার বাবা তার জন্যে একটি নতুন সেলাইয়ের কল কিনে দিলেন। অল্প পরিশ্রমে প্রায় খেলার ছলেই মেয়েটি দিনে দশ থেকে পনের 'ডঙ' ঘরে আনতে লাগল।

এ্যান্‌হ দরজার পাশে একটি জানলার সামনে বসত। ওই জানলা দিয়ে দেখা যেত একটি ছোট সরু উঠোন যেখানে এক কামরার বাসিন্দারা পরস্পর গায়ে গা দিয়ে বাস করত। সেখানে শোনা যেত শিশুদের অবিরাম কান্না, এজমালি কলের জল পড়ার শব্দ আর সেই সংগে আরো নানান ধরনের আওয়াজ। ওখানেই সবশেষের ঘরটাতে থাকত ভিয়েত। প্রত্যেকবার এ্যান্‌হ-এর যখনই তার সংগে দেখা হতো সে কলের সামনেই হোক বা উঠোনে কাপড় কাচার ভাঁটির কাছেই হোক—সব সময়ই ওই শান্ত নীরব কারিগরটিকে ক্ষ্যাপাত সে। অতি সাধারণ সাজসজ্জায় অভ্যস্ত লাজুক লোকটি ভেবে পেত না সে কি করবে! মুখটা রাগে লাল হয়ে যেত। এক একবার তার ভয় হতো মেয়েটির হাতে নিখুঁত কাটা বিদেশী কাপড়ের প্যান্ট বা সার্টে সে জল ছিটিয়ে ফেলবে কোন দিন। এক বিশেষ গোষ্ঠীর ছেলেদের কাছ থেকে এ্যান্‌হ-এর বাবা প্রচুর প্রশস্তি পেলেও ভিয়েত এ্যান্‌হ-দের কাঠের সিঁড়িতে পা দেয় নি কোনদিন। অবশ্য এ্যান্‌হ-এর বাবার মেজাজ ভাল থাকলে ভিয়েত-কে বলতেন যে খুব অল্প দামে ওর জন্যে একটি উচ্চাঙ্গের স্যুট তৈরি করে দেবেন। এ্যান্‌হ তার বাবার কাছে যে সব খদ্দেররা আসত তার মধ্যে থেকেই বেশ কিছু ছেলে-

মেয়েদের বাছাই করে নিয়ে প্রায়ই এদিক-ওদিক বেড়াতে যেত। স্কুলের বাইরের জীবনে সে অনেক বৈচিত্র্য ও নতুন নতুন আনন্দের স্বাদ পেত। টাকা, ভালো-ভালো সাজ পোশাক আর সেই দুটি হ্রদের মাঝখান দিয়ে তৈরি যুব-সরণীটি যেখানে যুবক যুবতীরা চিংড়ি মাছ আর কেক্ খাবার জন্যে সমবেত হয়, যেখানে তারা উপভোগ করে তাদের নিজস্ব দলবদ্ধ সংগীত সম্মেলন—এইসব রাস্তা ধরে পরমানন্দে বেড়িয়ে বেড়ানো, সবই দারুণ উপভোগ্য মনে হতো এ্যান্‌হ-এর। সে যে পৃথিবীর এই ছোট অংশটুকুর সব সেরা সুন্দরী সেটা বেশ ভাল করেই জানত। ভালোভালো সাজপোশাক পরা বেশ কিছু ছেলে সাইকেলে করে রোজ তাদের বাড়ির সামনে দিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা যাওয়া-আসা করত শুধু সে কখন সেলাইয়ের কল ছেড়ে একটু উঠবে—তাই দেখার জন্যে।

তার প্রথম প্রণয়ী ছিল একটি সুন্দর গিরিমাটি রঙের মোটর সাইকেলের মালিক। তাকে দেখতে খুব ভালো ছিল। একমাস পরেই এ্যান্‌হ জানতে পারল যে ঐ ছেলেটির বৌ ছেলে আছে আর হাইফঙে একটি সাইকেল মেরা-মতের দোকান আছে। এ্যান্‌হ তাকে ছেড়ে দিয়ে অন্য একজনকে ধরল। কিন্তু সেও টিকল না বেশিদিন। তারপর আসতে লাগল একের পর এক, তারা কেউ কেউ বেশ ঘা খেল এ্যান্‌হ-এর কাছ থেকে। সে নিজের খেয়াল খুশিমতো একবার এর সংগে, একবার ওর সংগে প্রেম করে যেতে লাগল। আগে থেকে কথা দিয়ে নির্দিষ্ট জায়গায় নিয়ে গিয়ে সে তাদের সংগে তার সেই মুহূর্তের খেয়াল অনুযায়ী অথবা তার সেই দিনের মেজাজ অনুসারে তাদের খেলাতো। যাই হোক সব থেকে আশ্চর্যের ব্যাপার ছিল এই যে সে তার প্রথম প্রেমিককে ভুলতে পারে নি কিছুতেই। সেও প্রায়ই ওদের বাড়িতে আসত তার জামা-প্যান্ট করাতে। সে কোনদিন পরে আসত চকচকে নাইলনের শার্ট, কখনও বা পরতো কোমরের কাছে কড়া ভাঁজওয়ালা প্যান্ট। তার মোটর সাইকেলের হর্ন শুনতে পেলে এ্যান্‌হ কিছুতেই স্থির হয়ে বসে থাকতে পারত না। তখন সে সেলাইয়ের কল ছেড়ে উঠবেই। ঠোঁটে একটু লিপস্টিক ঘসে তাড়াতাড়ি কাঠের সিঁড়ি দিয়ে ছুটে নেমে যেত সে।

তার বাবা লক্ষ্য করতে লাগলেন সেলাইকলের সামনেটা প্রতিদিনই বেশির ভাগ সময়ে খালি পড়ে থাকছে। অভিজ্ঞ লোকটি তাঁর মেয়েকে খুবই ভালো-বাসতেন, কিন্তু শাসনও করতেন তার থেকে বেশি। এই লোকটির মাথায় এই কথাটা কিছুতেই ঢুকতো না যে তাঁরই তৈরি করা ওই নিখুঁত জামাকাপড়-গুলোই তাঁর মেয়ের মাথাটি খাচ্ছে, আর তাঁর উপকারী খদ্দেররাই তাঁর মেয়ের ক্ষতি করছে সব থেকে বেশি। তিনি মেয়ের উঁচু হিল-ওয়ালা জুতো ভেঙে দিলেন, তাঁরই নিজের রুচি অনুযায়ী তৈরি সুন্দর সুন্দর জামাগুলো ছিঁড়ে

দিলেন। কিন্তু সেদিন বিকেলেই আবার সকলে দেখল তাঁর মেয়ে ঝক্‌ঝকে নতুন বিশেষ একটি সাইকেলের পেছনে চড়ে বেড়াতে যাচ্ছে। সারাদিনের শাস্তি ভোগের পর তার চোখ তখনও ফুলে লাল হয়ে আছে।

খুব অল্পদিনের মধ্যেই খারাপ মেয়েদের নামের তালিকায় উঠে গেল এ্যান্‌হ-এর নাম। ওখানকার যুব সংগঠন শাখার সভায় তাকে একটি খারাপ দৃষ্টান্ত বলে চিহ্নিত করা হলো। যুব সংগঠনের সভ্য-সভ্যারা দু'তিনবার তার সঙ্গে কথা বলতে এলো, সে কিন্তু প্রতিবারই এড়িয়ে গেল তাদের। আঠারো উনিশ বছরের মেয়েরা এক অদ্ভুত চাপা কৌতুহলের সঙ্গে তার দিকে চেয়ে দেখত। পাশ দিয়ে হেঁটে যাওয়া চা-ওয়ালারা, ঘরে বসে বোনার কাজে ব্যস্ত মেয়েরা তাকে রাস্তায় যেতে দেখলে মুখ ভ্যাংচাত। তাদের মুখে গালাগালি বেরিয়ে আসত। শুধু ঐ দর্জির খদ্দেরদের বাপের মতো মেয়ের ওপরেও সমান ভক্তি ছিল। তারা সব সময়ে এ্যান্‌হ-এর চারপাশে ঘুরঘুর করত। তার দরজার সামনে দিয়ে যাওয়া আসা করত আর রকমারিভাবে শিস্‌ দিয়ে তার দৃষ্টি আকর্ষণ করার চেষ্টা করত।

কিন্তু এই সব ছেলেদের মধ্যে কেউই এ্যান্‌হ-এর হৃদয়ে কোন স্থায়ী আসন নিতে পারে নি। মাঝে মাঝে মার চোখের জল আর তাঁর অভিযোগগুলো এ্যান্‌হ-কে একটু নাড়া দিত। তার সমবয়সী অন্য মেয়েদের স্কুলের ব্যাগ হাতে স্কুলে অথবা বিশ্ববিদ্যালয়ে যেতে দেখলে অথবা কাউকে কাউকে রাজনৈতিক সভায় যোগ দিতে যেতে দেখলে এ্যান্‌হ মাঝেমাঝে একটু বিচলিত হয়ে উঠত। তার হিংসেও হতো একটু। এটা কিন্তু বেশিক্ষণ স্থায়ী হতো না তার মনে। অসংখ্য নতুন আমোদে আবার মেতে উঠত সে। কোন নতুন ধরনের চুলের কায়দা, পূর্বনির্দিষ্ট জায়গায় নতুন কোন আড্ডা আবার মাতিয়ে তুলত তাকে। কিন্তু চারিদিকের যেসব জিনিসগুলো তার নাগালের বাইরে, যেগুলো সে কোনদিনই অর্জন করতে পারবে না, সেগুলোর জন্যে তাকে অপরের করুণার প্রার্থী হতে হবে এটা ভেবে তার মনে একটা চাপা ক্ষোভ তাকে আরো মরিয়া করে তুলত।

একদিন এ্যান্‌হ-এর বাবা তাঁর একজন খদ্দেরের দেওয়া একটা পোশাক তৈরির কাপড় আর বেশ মোটা রকমের কিছু টাকা খুঁজে পেলেন না। তিনি সন্দেহ করলেন তাঁর ওই উচ্ছন্নে যাওয়া মেয়েকেই। সারা বিকেল ধরে পাড়ার লোকেরা শুধু শুনল বেত মারার আওয়াজ আর এ্যান্‌হ-এর আর্তনাদ। কিন্তু তার মধ্যে নাক গলাতে এলো না কেউই। এ্যান্‌হ-এর মার খাওয়াটা নতুন কিছু ব্যাপার নয়, কিন্তু তবুও তার এবারের মার খাওয়া অন্যদের দেহে যেন কাঁপুনি ধরিয়ে দিল। সন্ধের দিকে পরিশ্রান্ত দর্জি তাঁর স্ত্রীর ওপরেও রেগে

উঠলেন। সে বেচারী সবে তখন ঠাণ্ডা হয়ে যাওয়া খাবারগুলো চোখের জল মুছে টেবিলের ওপর সাজাচ্ছিলেন।

রাত ন'টা নাগাদ দর্জিটি আবার তাঁর কাপড়ের গোছাতে মনসংযোগ করলেন। মেয়েকে ওই ঘরে খেতে দিতে সাহস হলো না তার মায়ের। তিনি একটি পাত্রে খাবারগুলো ভরে নিয়ে মেয়েকে সঙ্গে করে ভিয়েত-এর ঘরে গেলেন, কারণ এই কারিগরটির গম্ভীর ভদ্র ব্যবহারের জন্যে তাঁর স্বামী একে কিছুটা শ্রদ্ধা করতেন। এ্যানুহ এই ঘরটি বেশ ভাল করেই চেনে। স্কুলে পড়ার সময় সে প্রায়ই এ-ঘরে আসত পড়ার মতো কিছু বইয়ের খোঁজে। বিছানা ছাড়া একটা ঘরে তৈরি আলমারীর ওপরে বেশ কয়েকখানি বই থাকত এঘরে তখন। এখন এ ঘরে আরো দুটো চেয়ার এসেছে আর একটা নতুন ঢালাইগাঁথনীর কাঠামোর ড্রইং রাখা আছে যেটার বিষয়ে ভিয়েত এখন সান্ধ্যস্কুলে পড়ছে।

চেয়ার দুটোকে প্রশংসা করার মতো মনের অবস্থা ছিল না তখন নিগৃহীতা এনুহ-এর। প্রথমে একদম খেতে ইচ্ছে করছিল না তার। পরে কিন্তু সে ভাবল কেনই বা খাব না! কান্না আর কাৎরানিতে তার চোখ আর গলা দুই-ই শুকিয়ে কাঠ হয়ে গিয়েছিল। ওই টিনের পাত্রের খাবারগুলো জোর করে গিলে নিল সে। তারপর চোখ তুলে তাকিয়ে এবারে সে সম্পূর্ণরূপে বুঝতে পারল সে ভিয়েত-এর ঘরে আছে। ভিয়েত তার দিকে চোখ বড় বড় করে তাকিয়ে আছে। একটুও অস্বস্তিবোধ না করে সে তার এত দিনের অভ্যস্ত কায়দায় নিজেকে সামলে নিল। বাঁকা আঙুলের মোহিনীভঙ্গিতে সে তার একগুচ্ছ চুল সরিয়ে নিয়ে ভিয়েত-এর দিকে চেয়ে মধুর হাসি হাসল।

নীরবতা ভঙ্গ করল ভিয়েত-ই। সে বললো—"বিকেলে তোমার বাবা যখন ওপরে তোমাকে মারছিলেন, তোমার মা তখন এখানে এসে ভীষণ কাঁদছিলেন। তার সে কান্না কিছুতেই থামানো যাচ্ছিল না।"

"কিন্তু আমি আমার বাবার কিছুই নিই নি"—রাগে গর্জে উঠল এ্যানুহ। "উনি নিশ্চয়ই প্যাকেটটা কোথাও ফেলে এসেছেন নয়তো ও'র কোন খদ্দের চুরি করেছে ওটা। আমার সঙ্গে উনি কি রকম ব্যবহার করেন দেখ তোমরা।"

"এটা হয়তো সত্যিই যে তুমি ওগুলি নাও নি। আমার মনে হয় কোন মানুষ যখন কাউকে সন্দেহ করে তখন তার সম্বন্ধে তার মনে কোন সন্দেহের অবকাশ আছে বলেই না সে সন্দেহটা করে? বিশেষত বাবা মা আর তাদের ছেলেমেয়ে যারা একই ছাদের তলায় বাস করে তারা সাধারণত পরস্পরকে ভালো করেই চেনে।" একটু থেমে সে আবার বলতে শুরু করে—"আমি আশা করি তুমি নিশ্চয়ই নিজেকে এভাবে বয়ে যেতে দেবে না। এই অঞ্চলের যুবক-যুবতীরা..." ভিয়েত তাকে এক কাপ চা দিল।

"নিশ্চয়ই না। আমি বিয়ে করব।"

ভিয়েত তো একেবারে থ'! "কাকে বিয়ে করবে।"

"তুমি কি মনে করছ ওইসব অকর্মা সাজসজ্জা সর্বস্ব ছেলেগুলো যারা আমার কাছে ঘুর ঘুর করছে সর্বদা তাদের কাউকে বিয়ে করব আমি?" সে বিদ্রূপের হাসি হাসল। তার চোখের চাহনি ক্রমশঃ ভয়ঙ্কর হতে থাকল। "এইসব ছেলেগুলো যারা আমাকে বিয়ে করে বাড়িতে রেখে আমার ঘাড়ে কতকগুলো বাচ্চার দায়িত্ব চাপিয়ে সারাদিন অন্য জায়গায় প্রেম করে বেড়াবে আর বাড়ি ফিরে আমাকে অপমান আর মারধর করবে? এসব ছেলে আমার জন্যে নয়। আমি বরং মাথামোটা একজন হাবাগোবা লোককে বিয়ে করব। সে আমার জন্যে সব কিছু করতে পারবে। শুধু আমাকে হারানোর ভয়ে সে আমার প্রতিটি অনুশাসন, আমার প্রতিটি চোখের চাহনিকে মেনে চলবে। ঠিক আমার পায়ের তলায় পড়ে থাকা একটি ক্রীতদাস হবে সে—। আর যারা ভালো লোক, যারা স্বভাবতই দায়িত্বশীল—তারা তো আমাকে প্লেগের মতোই এড়িয়ে যাবে।" প্রায় চুপি চুপি কথাগুলো বললো সে। আর তিক্ততার সংগে বাকিটা কল্পনা করে যেতে লাগল।

দারুণ বিদ্বেষবশে সে ভিয়েত-এর দিকে চোখ তুললো। তার সেই চোখে মাখানো ছিল এক পাশবিক প্রতিশোধস্পৃহা আর ঝগড়াটে ভাব। সে বলে উঠল "মিস্টার ভিয়েত—এই যেমন তোমার মতো লোক—তুমি কি পারবে আমার মতো একটা উচ্ছন্নে যাওয়া মেয়েকে বিয়ে করতে? এটাই তোমাকে জিজ্ঞেস করতে চাই।" সে এই "উচ্ছন্নে যাওয়া-মেয়ে" কথাটা এমনভাবে জোর দিয়ে উচ্চারণ করল যেন এই কথাটাকেই সে দাঁতে পিষে শেষ করে দিতে চাইছে।

অবাক স্তম্ভিত ভিয়েত চোখ পিট্‌পিট্ করতে লাগল। তার চেয়ে বয়সে অনেক ছোট এই মেয়েটির কথা বুঝতে পারল সে। কিছুক্ষণ নীরবতার পর সে দৃঢ় সংযত স্বরে বললো—"আমি তোমাকে একেবারেই উচ্ছন্নে যাওয়া মেয়ে বলে মনে করি না। তোমাকে শুধরে নেওয়া যাবে না বলেও মনে হয় না আমার। এখনও তোমার নিজেকে শোধরাবার সময় আছে। এটা বোঝা যাচ্ছে যে কিছু খারাপ লোকের সংসর্গে পড়েই তুমি এরকম হয়েছ। কিন্তু কিছুদিন পরে এমন দিন আসবে যখন আর তুমি অন্যের জন্যে খারাপ হচ্ছ এটাও বলা যাবে না। তখন তোমার সংসর্গে পড়ে অন্যরাই খারাপ হয়ে যাবে।..."

হাতের উপর মাথা রেখে এ্যানুহ কান্নায় ভেঙে পড়ল। তার কাঁধ আর বুক ফুলে ফুলে উঠতে লাগল কান্নায়। দেখে মনে হচ্ছিল যেন তার বুকের মধ্যে পাষাণ হয়ে জমে থাকা তার এতদিনের সব লজ্জা, সব ক্রোধ, সব প্রতিশোধস্পৃহা গলিত অশ্রু হয়ে ঝরে যাচ্ছে।

মানুষ যখন একে অপরকে ভালবাসে তখন দেখা যায় বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই তাদের ভাবনাচিন্তা, তাদের অনুভূতি সাধারণত একই ধরনের হয়। কিন্তু যখনই সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতির কোন একজন অপরের দিকে চেয়ে তার হৃদয়ের দুয়ারে নাড়া দেয় তখন তাদের দুজনের প্রকৃতিগত যে বিরাট ব্যবধান সেটাই বড় হয়ে উঠে, বিচ্ছিন্ন করে দেয় তাদের। তখন তাদের যুক্ত করতে পারে একটি-মাত্র বস্তু সেটি হলো শ্রদ্ধা। এই অসীম শ্রদ্ধাই সব ব্যবধান দূর করে পরস্পরের মধ্যে গভীর ভালবাসায় রূপান্তরিত হয়।

মেয়েটির বাবাকে অশেষ ধন্যবাদ। তিনি যখন শুনলেন যে এতদিন ধরে যে লোকটি জামার ছাঁটকাটের ব্যাপার থেকে শতহস্ত দূরে থাকত—সেই কর্মীটিই তার মেয়েকে বিয়ে করতে চাইছে—তিনি তখন ভীষণ খুশি হলেন। লোকের বাইরের পোশাকের চাকচিক্য নিয়ে সব সময় ব্যস্ত থাকলেও দর্জি ভদ্রলোক আসল মানুষকে চিনতে জানতেন। যাদের জন্যে তিনি ভালো ভালো জামাপ্যাণ্ট কাটতেন—তাদের সেই বেশভূষার জন্যে তারা যে খুব বড় তা তিনি মনে করতেন না। তিনি বেশ খুশি মনেই মেয়ের জন্যে কেনা প্রায় নতুন সেলাইয়ের কলটি বিয়ের যৌতুক হিসেবে দিতে চাইলেন। সেই সঙ্গে একথাও বললেন যে উঁচুদরের জামা-প্যাণ্ট করবার জন্যে তাঁর খদ্দেররা তাঁকে যে বাড়তি মজুরি দেয় সেটাও তিনি তাঁর মেয়ের জন্যে জমিয়ে রাখবেন।

কিন্তু ভিয়েত কোন যৌতুকই নিল না। এমনকি প্রতিশ্রুত জিনিসগুলোও নিতে চাইল না। কাজের জন্যে বদলি হলো সে থ্যাক্ বা-তে। বৌকে নিয়ে ওখানে চলে গেল। তারপর থেকে তারা এই পরিকল্পনাটির বিভিন্ন শাখাতেই কাজ করে চলেছে। তারা যখন এখানে এসেছিল ভিয়েত তখন ছিল এখানকার গাঁথুনী বিভাগের প্রধান আর এ্যানহ্ ছিল ভারায়-চড়া চতুর্থ শ্রেণীর গাঁথুনী কর্মী।

আর একটা সিগারেট ধরাবার জন্যে স্তব্ধ হলেন তুয়ান্। আবার তিনি বলতে শুরু করলেন—"দেখ, যতবারই আমি এই থাক্ বা সম্বন্ধে কিছু লিখতে চাই তখনই এই দম্পতির কথা ভাবি আমি। সেই সেদিনের বিকেল—যেদিন তাকে ভারায় চড়ে কাজ করতে দেখেছিলাম, সেই সন্ধ্যাটি যেদিন আমি তার স্বামী ও সন্তানের সঙ্গে পরিচিত হয়েছিলাম, এ্যানহ্-এর বাবা এখন যিনি সমবায় শাখার দর্জি তাঁরই নিজের হাতে তৈরি নিখুঁত জামাগুলো এনে নিজের স্ত্রীর হাতে তুলে দেবার জন্যে এ্যানহ্-এর স্বামী অতিবাহিত করছিল তার একটি পুরো সন্ধ্যা, আর সেগুলো পরে দেখবার সময় তার সেই অনাবিল আনন্দের কথা সবকিছুই মনে পড়ে যায় আমার। এইসব অপূর্ব অনুভূতির কথা ঠিক আমি যা যা বলতে চেয়েছি—হয়তো তার অনেকখানি অব্যক্ত রয়ে

গেছে আমার নিজের প্রতিভার অভাবে। থাক্ বা-তে বাঁধ তৈরি করা একটি বৃহৎ ভূমিখণ্ডকে জলে পরিপূর্ণ করা, জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপন করা। উচ্চ বৈদ্যুতিক শক্তিসম্পন্ন লাইন তৈরি করা এইগুলোই তো থাক্ বা সম্বন্ধে বলবার মতো আসল খবর। তার মধ্যে আমার এই ক্ষুদ্র কাহিনীর স্থান কোথায়…"

আমাদের সাংবাদিক চুপ করে গেলেন আবার। সিগারেটে কয়েকটি টান দিয়ে ধোঁয়ার বৃত্ত রচনা করতে শুরু করলেন। নদী থেকে প্রতিফলিত হয়ে আসা কুয়াশা-ঘন আলোয় ভেসে বেড়াতে লাগল সেগুলো।

প্রত্নতাত্ত্বিক বললেন—"এটা লিখে ফেল কাগজে। এ এক স্বর্ণোজ্জ্বল কাহিনী। এ কাহিনীতে লেখা হবে যার কথা তিনি শুধু দেশকে গড়ার কাজই করেন নি—তার সঙ্গে গড়ে তুলেছেন একটি নতুন মানুষ…"।

আমরা সকলেই এতক্ষণ যে কথাটি চিন্তা করছিলাম আমাদের প্রত্নতাত্ত্বিক বন্ধুটি তাঁর অপরিচিত উপহাসের সুরে সেই কথাটাই ব্যক্ত করে দিলেন। আমরা স্তব্ধ হয়ে রইলাম কিছুক্ষণ।

তুয়ান্ কাশতে লাগলেন। তাঁর সিগারেটের অবশিষ্ট অংশটুকু তাঁর দু' আঙুলের ফাঁকে রক্তাভা ছড়াল শেষবারের মতো—তারপর অর্ধবৃত্তাকারে সেটি গিয়ে পড়ল নদীর বুকে।

কিছুক্ষণ চিন্তা করলেন তিনি। তারপর প্রত্নতাত্ত্বিকের কথার রেশ ধরেই বলতে শুরু করলেন—"এ কাহিনীতে শুধুই মানুষ গড়ার কথা নেই, তারই সঙ্গে নিজের আনন্দকে নিজেই সৃষ্টি করে নেওয়ার অবকাশ আছে। কিন্তু এখন যখন সেইসব কথা ভাবি তখন বুঝতে পারি তোমরা সকলেই এই বৃহৎ কর্মকাণ্ডের ভিত্তি স্থাপন করেছ। আবার যারা কাজে নেতৃত্ব দিয়েছিল তাদের মধ্যে ভিয়েত একজন, আর ঐ মহিলা কর্মীটি যে ভারার ওপর চড়ে লাল পতাকা নিয়ে গাঁথুনী কারিগরদের পরিচালিত করছে—সে এ্যান্হ্ তারই সহধর্মিনী।"

আবার আমরা তলিয়ে গেলাম নিজের নিজের চিন্তায়।

ধূসর মেঘের ভেতর থেকে হঠাৎ আমাদের মাথায় চাঁদের আলো এসে পড়ল। এই আলোয় উজ্জ্বল হয়ে উঠল ঘাসে ছাওয়া মাটি।

নদীর অপর পারে নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করে আবার গর্জন করে উঠল আমাদের ফেরী নৌকা। ওর যে যান্ত্রিক গোলযোগ দেখা দিয়েছিল সেটা মেরামত করার কাজ শেষ হয়েছে। নৌকাটি আমাদের দিকেই মুখ ফিরিয়ে এগিয়ে আসছে ছোট ছোট ঢেউ কেটে নিজেরই গায়ে ছপ্ ছপ্ শব্দ তুলে।

অনেকের জীবননাট্য

ভু খি থুয়োঙ

ছোট্ট ত্রিন্ সাইকেলের ঘণ্টিটা শুনেই বুঝতে পারল এটা তার অতি পরিচিত ঘণ্টি। তার বাবা গলির মুখে এসে গেছে। সে তার কাঠি-খেলা ফেলে ছোট্ট বোনটিকে তুলে নিয়ে পিঠের ওপর চাপিয়ে একছুট লাগালো বাবাকে দেখবার জন্যে। চিনু-অর্থাৎ তার বাবার সাইকেলে বসবার আসনটা আঁকড়ে ধরে বললো—"বাবা, ফিল্মের কিছু লোক তোমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছে।"

চিনু একটু থেমে ছেলের দিকে রাগত দৃষ্টি হেনে বললো—"তাতে কি হয়েছে? এইরকম করে তুমি তোমার ছোট্ট বোনের দেখাশুনো কর? ওর নাক দিয়ে জল পড়ছে দেখনি তুমি?"

অপ্রতিভ ত্রিনু তার বাবা লজেন্স-টজেন্স কিছুই আনে নি অনুমান করে নিঃশব্দে চলে গেল।

বাড়িতে এসে চিনু তার পাইপটা বার করে তাতে এক-চিমটে তামাক ভরতে লাগল। ঠিক সেই সময় বাড়ির আঙিনা থেকে জলদগম্ভীর স্বরে সমবায় সমিতির সহসভাপতি হি বলে উঠল—"কি হে, জেলা থেকে এত জরুরী তলবের কারণটা কি?"

চিনু তাচ্ছিল্যের স্বরে বললো—"না না, তেমন কিছু ব্যাপার নয়। কৃষি উৎপাদন সংক্রান্ত একটা সভা হলো। উঃ, আকাশবাণীর লোকগুলো সাংঘাতিক। সব ব্যাপারে এত বাড়াবাড়ি করে ওরা! বিশাল সমাধি সৌধের মতো একটা বড় ট্রাক ভর্তি শুধু টেপ আর রেকর্ডিং করবার যন্ত্রপাতি এনেছে। অন্যান্যবারের মতো নয় একেবারেই। বোঝ কি ধরনের লোক ওরা।"

সেইদিনই দুপুরের আগে চিনু ইঁটের ভাটা জ্বালাবার জন্যে সবকিছু যখন খুঁটিয়ে পরীক্ষা করে দেখছিল, তখন তার স্ত্রী মাঠের মধ্যে দিয়ে ছুটে হাঁফাতে হাঁফাতে এসে তাকে বাড়ি ফিরে যেতে বললো, কারণ—জেলা পরিষদ থেকে তার বাড়িতে গাড়ি পাঠিয়েছে।

চিনু-এর তখন ভাটাটা ছেড়ে যেতে বিরক্ত লাগছিল, তাই সে তার স্ত্রীকে বললো—"ওদের জন্যে একটু খাবার আয়োজন কর, আমি ভাটাটা ভালো করে ধরে গেলেই বাড়ি যাচ্ছি।"

"কিন্তু ওদের কি করে অপেক্ষা করিয়ে রাখবে তুমি? তোমাকে নিয়ে যাবার জন্যে ওরা বিশেষ গাড়ি পাঠিয়েছে।"

"ঠিক আছে, একথাটা আমায় আগে বলবে তো! সে তার সাইকেলে চড়ে যথাসম্ভব জোরে সেটাকে চালাতে শুরু করল। এবারের বৃষ্টিতে ধানক্ষেতের মাঝখানের রাস্তাটা খুব ঢেউ-খেলানো করে তুলেছে। সাইকেলটা এমনভাবে লাফাতে লাগল যে পাছে পড়ে যায় সেই ভয়ে তার স্ত্রী তার জামাটা আঁকড়ে ধরে বসল।

শুধু যাতে পরের দিনই আবার বাড়ি ফিরতে পারে তার জন্যে তার সাইকেলটাকে কোন মতে ট্রাকে তোলবার মতো সময় পেল চিন্ বাড়িতে এসে। ওটাকে তুলেই সে লাফিয়ে ওঠে পড়ল গাড়িতে। গাড়িটা চলতে শুরু করার বেশ খানিকটা পরে তার খেয়াল হলো যে সে তার সবচেয়ে দরকারি জিনিসটা সংগে নিতে ভুলেছে—তার তোয়ালেটা নেয়নি সংগে…

পিঠের ওপর থেকে এক বিরাট বোঝা নেমে গেল এমনভাবে দীর্ঘশ্বাস ফেললো হি। "তবু ভালো, আমি মনে করেছিলাম জেলা পরিষদ বুঝি তোমাকে অন্য কোথাও সরিয়ে নিতে চাইছে। তুমি যদি কোথাও চলে যাও তাহলে একথা আমি বলতে পারি যে এখনকার সবকিছু ভেঙেচুরে তছনছ হতে দু'মাসও সময় লাগবে না। এতো জানা কথা যে বড় মেয়ের বিয়ে হয়ে গেলেই ছোট মেয়ে দেখতে দেখতে বিয়ের যুগ্যি হয়ে ওঠে, কিন্তু সমবায় সমিতি তো আর অত সহজে বাড়ে না। আর সব থেকে বড় কথা এর বৃদ্ধির তাল বজায় রাখবার মতো যোগ্যতা কি আমাদের আছে? আচ্ছা আগের দিনের সভাতে অনেক লোক এসেছিল?"

"না, খুব বেশি লোক আসে নি। প্রদেশ কমিটির সচিব, কৃষিসভার উপনেতা, দু'জন জেলা পরিষদের সচিব আর কিছু লোক যেমন দাঙ্ লা সমবায় সমিতির সভাপতি সন্ আর ভঙ্ তিয়েন সমবায়ের সভাপতি ভ্যান্ অর্থাৎ কিনা উচ্চফলনশীল সমবায়ের সভাপতিরা এসেছিলেন।"

ভেতরে ভেতরে বেশ উত্তেজিত হলেও বাইরে চিন্ একটু নির্লিপ্ততার ভান করল। শুধু তার কালকের রেডিওতে বক্তৃতা দেওয়ার জন্যেই এই উন্মাদনা নয়, কারণ রেডিওতে বলা তার বেশ অভ্যাস আছে। সত্যি কথা বলতে কি খুব বিনয় করে বললেও এটা বলতে হবে যে তার কালকের বক্তৃতা আর সকলের থেকে অনেক উঁচু দরের হয়েছে। প্রদেশ কমিটির সচিব বলেছেন শুধু নীতির বিষয়ে, কাজেই তাঁর বক্তৃতা ভালো কি মন্দ সে বিষয়ে কোন প্রশ্নই ওঠে না। জেলা পরিষদের সচিবরা যা বলেছেন তাঁদের বক্তব্যকে একেবারে বাজে বলে উড়িয়ে দেওয়া যায় না তবু এটা বলতে হবে যে তাঁদের

বক্তব্য ছিল নীরস আর বাস্তবতা বর্জিত। আর সমবায়ের সভাপতিরা খুঁটিনাটি সবকিছু ব্যক্ত করতে গিয়ে যৌক্তিকতা হারিয়ে ফেলেছেন একেবারে…

চিনু তার পাইপটানা শেষ করল। হাস্যোজ্জ্বল চোখে মুখ দিয়ে ঘন ধোঁয়ার রাশি ছড়িয়ে দিল। হি-র দিকে ফিরে জিজ্ঞেস করল—"আমি চলে যাবার পর নতুন কিছু ঘটেনি ?"

"নিশ্চয়ই, কিন্তু আমরা আমাদের ওপরওয়ালার নির্দেশের জন্যে অপেক্ষা করছিলাম। গতকাল বিকেলে তুমি চলে যাবার খানিকটা পরেই নামু দুয়োঙ থেকে কয়েকজন লোক এসেছিল কয়েকশ' কিলোগ্রাম নতুন বীজ চাইতে তাদের বীজ কম পড়েছে বলে। আমি ট্যানের সংগে এ ব্যাপারে আলোচনা করে তুমি ফিরে না আসা পর্যন্ত ওদের অপেক্ষা করতে বললুম। তোমার কি মত, আমরা বীজ দেব ?"

চিনু উদারকণ্ঠে বললো—"দিয়ে দাও। তা নাহলে ওরা আবার আমাদেরই এই বলে দুষবে যে আমরা এগিয়ে যাওয়া দল হয়ে পিছিয়ে পড়া কোন দলকেই সাহায্য করতে চাই না।"

হি তেরছা চোখে চেয়ে চিনু-এর মন-মেজাজটা কিছুটা বুঝে নিয়ে আবার বলতে আরম্ভ করল—"ওদের আরো বীজ চাইবার ইচ্ছে ছিল, কিন্তু ওরা জানে যে আমরা ইতিমধ্যেই বেশ কয়েকটা সমবায়কে সাহায্য করেছি, তাই ওরা চাইছে চারশো কিলোগ্রাম। আমরা কি করব ? ওরা বড্ড বেশি চাইছে, তাই না ? তোমার কি মনে হয় ?"

"চারশো কিলোগ্রাম বীজ দেওয়া এমন কিছু বেশি চাহিদা মেটানো নয় আমাদের কাছে কেননা আমরা আরো বৃহৎ পরিকল্পনা নিয়ে কাজ করছি—দুশো কিলো আর চারশো কিলোতে খুব একটা বেশি তফাৎ হবে না।" সে বক্রহাসি হেসে বললো—"ভালো কথা, এটা দেখে মনে হচ্ছে এবার নামু দুয়োঙ সমিতিও চিনতে পেরেছে সংকট কাটিয়ে ওঠার পথটা।"

হি ওকে উসকে দিয়ে ঠাট্টার সুরে বললো—"ওদের পরিচালক থাকু-কে দেখলে হাসি পায়। ওর কোন যোগ্যতা আছে বলে মনে হয় না। ও যেন ঠিক আমাদের খোয়াটের মতো। দুজনে যেন সমান দুটি ফোঁটা জল, তাই না ?"

পুরনো পরিচালক খোয়াট্ সমবায় সমিতি গড়ে ওঠার সময় অনেক কাজ করেছে। কিন্তু হি বেশ ভালো করেই জানে যবে থেকে চিনু-এর চোখে এই সমবায় সমিতি এক বিখ্যাত সমবায় সমিতি বলে চিহ্নিত হয়েছে তখন থেকেই খোয়াট্ এক কিম্বদন্তীতে, ফসিলে, মিউজিয়ামের একটি দ্রষ্টব্য বস্তুতে পরিণত হয়েছে। যদিও সমবায় সমিতির সভাগুলিতে খোয়াটকে চিনু সভার প্রথম

সারিতে বসিয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে তার কানে ফিস্‌ফিস্‌ করে বলে—"সভা শুরু করুন, হ্যাঁ হ্যাঁ আপনার বক্তব্য রাখুন কিছু।"

চিন্‌ উরুতে থাবড়া মেরে বললো—"ঠিক বলেছ, থাক্‌ ঠিক খোয়াটের মতো অবিকল! সবকিছু বুঝতে অনেক দেরি হয় ওর আর সবেতেই ভয়! যেমন কিছুদিন আগে পরিচালকদের সভায় যখন জেলা পরিষদ উৎপাদন মাত্রা বেঁধে দিল ওমনি ওর পা থেকে মাথা পর্যন্ত কেঁপে উঠল আর ওঁদের বলে দিল অসম্ভব। আমি বললাম—"থাক্‌ তুমি বাড়াবাড়ি করছ। তোমাকে এই উৎপাদনমাত্রাটা মেনে নিতেই হবে, এতে ভয় পাবার কিছুই নেই।"

মুখের উপযুক্ত জবাব শুনে হি অবাক বিস্ময়ে খুশির স্বরে বললো—"সত্যি তুমি এইভাবে বললে ওকে?"

চিন্‌ অত্যুৎসাহের স্বরে বললে—"আমি কি বললাম জানো? বললাম, আমার অভিজ্ঞতা অনুযায়ী আমি তোমাকে বলতে পারি যে উৎপাদনের ব্যাপারে নির্দেশ দিতে হলে তোমাকে বেশ সাহসী হতে হবে। সাহসিকতা না থাকলে এমনি আর সব ব্যাপারে তুমি ঠিকই আছ, কেউ তোমাকে দুষবে না, কিন্তু শেষ বিশ্লেষণের সময় তোমার এই গতানুগতিকতা নিয়ে কি করে তুমি ভাল কাজ দেখানোর আশা রাখবে?"

"সে কি বললো?"

"কি আবার বলবে। একটা কাঠের গুঁড়ির মতো চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল—দেখলে হাসতে হাসতে মরে যাবে তুমি। আমার মনে হয় আমাদের মিসেস নানের সংগে ওর বিয়ে দিলে খুব ভাল হয়।"

দুজনে মিলে বেশ খানিকক্ষণ ধরে রসিকতা করতে লাগল।

অবশেষে হি বললো—"এই রে একটা কথা তোমাকে বলতে একেবারে ভুলে গেছি। ফিল্মের একদল লোক এসেছে। ওদের আমি চি-র বাড়িতে রেখেছি। ওদের মধ্যে একজনকে বেশ চেনাচেনা লাগল। মনে হয় আগের বারের বসন্তকালীন ফসল তোলার মরশুমে এসেছিল ঐ লোকটি।

মুখ বাঁকালো চিন্‌। এই লোকটির আগের বারের উপস্থিতির কথা শুনে তার সামান্য বিরক্তি জাগল মনে। গত বছর শরৎকালীন ফসলের জন্যে যখন সবাই সয়াবীন্‌ বুনতে, জমি তৈরি করতে, সার দিতে, চারা রুইতে খুব ব্যস্ত—ঠিক সেই সময় কেন্দ্রীয় কর্মশাখার উদ্যোগে একটি ফিল্মের দল এই গাঁয়ে এসে পৌঁছেছিল। যখন গাঁয়ের প্রতিটি লোক ফসল ফলাতে সাধ্যের অধিক পরিশ্রম করছিল, তখন তারা ছবি তুলতে আরম্ভ করল। এটা হাসির ব্যাপার নয়। আর ওদেরই দলের একজন বলে উঠল যে সে

নিজের কোন ব্যক্তিগত লাভের আশায় এটা করছে না, সে ঐ অঞ্চলের ওপর প্রচার অভিযান চালাবার জন্যেই এটা করছে, তাই তাকে সাহায্য করা উচিত সকলেরই, তখন চিন্ খুব রেগে উঠে বলেছিল—"সুগন্ধ ছড়িয়ে পড়ে অনায়াসেই। আমরা কৃতী একথা জানে সারা উত্তরাংশ। কে চায় তোমার প্রচার আর তোমার কয়েক মিটার ছবি?" কি ছবি তোলা হবে-না-হবে সে ব্যাপারে মাথা না ঘামিয়ে সে সমবায়ের সকলকে জমিতে সার দিতে যেতে নির্দেশ দিল। পাঁচটা ছবি যা তারা তুলতে চেয়েছিল তার মধ্যে মাত্র দুটি ছবি তোলার অনুমতি যোগাড় করতে তাদের সিনারিও লেখককে চিন্‌কে অনেক পীড়াপীড়ি করতে হয়েছিল। এখন দেখ আজ আবার কোন না কোন এক ফিল্মের দল এসে হাজির হলো।

চিন্ কোন উত্তর দিচ্ছে না দেখে হি বললো—"আজ সন্ধেয় কিম্বা আগামীকাল তোমাকে অল্পক্ষণের জন্যে একটু দেখা করতেই হবে ওদের সঙ্গে। কখন দেখা করবে বল তাহলে চিন্‌র বাড়িতে গিয়ে আমি ওদের সময়টা জানিয়ে দেব।"

নীরসস্বরে উত্তর দিল চিন্—"ওদের সঙ্গে তুমিই দেখা কর—আমি পারব না।"

হি অবাক হয়ে গেলেও সঙ্গে সঙ্গেই ওর মনোভাবটা পাল্টানোর একটা মতলব ভেবে নিল। "হ্যাঁ নিশ্চয়ই, তুমি যদি বল তো আমিই না হয় দেখা করব ওদের সঙ্গে···কিন্তু আসলে তোমার হাতেই তো সব ব্যবস্থাপনার ভার, সব কাজের বিবরণ দিতে অভ্যস্ত তুমিই। একমাত্র তুমিই জানো ঠিকমতো গুছিয়ে সব কিছু বলতে, কখন কোন কাজের ওপর জোর দিতে হবে সবকিছু তোমার নখদর্পণে। তুমি ওদের বুঝিয়ে বললে যা কাজ হবে, আমি বললে হয়তো তার দশভাগের একভাগ সফলতা আসবে। তার ওপর ওরা নিশ্চয়ই ওদের কাজে আমাদের সহায়তাদানের কথা তুলবে, সেখানে আমাদের ওপর-ওয়ালা হিসেবে তুমি যা স্থির করবে, সেটা আমার থেকে নিশ্চয়ই আরো অনেক নির্ভুল হবে..."

চিন্-এর মুখখানা উজ্জ্বল হয়ে উঠল। "হ্যাঁ কথা বলার কায়দাটা বেশ ভালোই জানো তুমি। ওদের বল কালকে ওদের সঙ্গে দেখা করব আমি। আজকে বিকেলে জমিচষা আর চারা লাগানোর ব্যাপারে আমরা এখন কোন স্তরে আছি সেটা জানবার জন্যে শাখার প্রধানদের, উপ-প্রধানদের আর কার্য-নির্বাহক সমিতির সকলকে নিয়ে একটা সভা ডাকতে হবে। আমাদের সব কিছু খুব তাড়াতাড়ি শেষ করতে হবে—বুঝলে হে!"

দুই

দু'বছর আগে গ্রুঙ্‌ কোয়ান্‌ একটি অতি মাঝারি ধরনের সমবায় সমিতি ছিল আর চিন্‌ তখন ছিল একটি অপরিচিত নাম।

জেলা অথবা প্রদেশভিত্তিক সভাগুলোতে চিন্‌ সাধারণত হলের একেবারে পেছনের সারির লুকোনো একটি কোণ বেছে নিয়ে সকলের চোখের আড়ালে বসতো। স্বভাবতই সে সেখানে সব কিছু থেকে দূরে সরে থাকত। লাউড-স্পীকারের কর্কশ শব্দ আর হলের প্রচণ্ড গণ্ডগোলের ভেতর সভার বক্তব্যের সামান্য ছেঁড়াছেঁড়া অংশ কানে আসত শুধু। এত হট্টগোলে বক্তৃতার বিশেষ কিছুই শুনতে না পেয়ে সে যা করতে চাইত তাই করে যেত। যখন বক্তৃতা শোনার ক্লান্তি আসত একটু ঝিমিয়ে নিত সে, কিম্বা তার গড়গড়াটা আওয়াজ করে টেনে তামাক খেত। আবার কখনও সামনের সারির দিকে ঝুঁকে কোন পরিচালকের সংগে চুণের বিষয়ে অথবা কোন বীজের ব্যাপারে আলাপ আলো-চনা সেরে নিত। ফলে তার একটা খুব লাভ হতো এই যে উঁচুতলার কোন কর্মসচিবের চোখে পড়বার ভয়টা থাকতো না তার। দুর্ভাগ্যবশত সে যদি কখনও উঁচু সারির কোন নেতার চোখে পড়ত তাহলে তার কাজের ত্রুটিবিচ্যুতি নিয়ে নিশ্চয়ই তাকে সকলের কাছে চিহ্নিত করা হতো।

পাঠচক্রগুলোতেও সে চেষ্টা করত লোকচক্ষের আড়ালে থাকবার। যার খুশি তাকে বলতে দাও—থান্‌ কঙ্‌ তোৎলাক, নাম্‌ হাই ঘাড় শক্ত করে লড়াইয়ের মোরগের ঝুঁটির মতো মুখ লাল করে যত খুশি বকুক না কেন চিন্‌ চুপচাপ থাকত চোখ আধবোজা করে, সে দুটি মুদ্রার সাহায্যে তার দাড়ির লোম তুলে যেত। এই চুপচাপ থাকার ব্যাপারে একটা যুক্তি ছিল তার সেটা হলো এই বক্তৃতা শুধুই ফাঁকা আওয়াজ। সব থেকে মূল্যবান হলো তোমার জমিতে তুমি কি ফলালে সেইটে দেখানো।

১৯৬··· পর্যন্ত এইভাবেই চললো। কিন্তু সেই বছরের বসন্তকালীন ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধির সংগে সংগে শুরু হলো সব কিছু। সকলকেই সে বছর স্বীকার করতে হলো যে চিন্‌-এর দক্ষতা আছে যথেষ্ট। বসন্তকালীন এই নতুন ধরনের ধানের বীজের ওপর কোন লোকেরই বিশেষ কোন ভরসা ছিল না। যদিও প্রাদেশিক স্তর থেকে এই বীজ বোনার জন্যে প্রচার চালানো হচ্ছিল কিন্তু তবুও ওদের বীজগুলো দেখে মনে হয়েছিল ওগুলো বড্ড ছোট আর ভঙ্গুর। অন্যান্য বছর এই সমবায় সমিতি ওপরওলার আদেশ অমান্য করছে না সেটা দেখাবার জন্যে এখানে সেখানে মাত্র কয়েক হেক্টর জমিতে এই বীজ বুনেছিল। তারপর তারা এগুলোকে প্রকৃতির দয়ার উপর ছেড়ে দিয়েছিল যাতে ধানকাটার সময়ে ওরা বলতে পারে,—"এই দেখ, এইতো নতুন বীজ

আমাদের বুনতে হয়েছে বলেই বুনেছি আমরা, কিন্তু কি করে আমাদের বাপ-ঠাকুর্দারা একশ বছর হাজার বছর ধরে যে তেপু, হিনু, চিয়েমু ছানু আর সাই দুয়োঙ জাতের ধান ফলিয়েছে তার পাশে দাঁড়াবে এই নতুন বীজের ধান!"

এ বছর চিনু অত্যন্ত আত্মপ্রত্যয়ের সংগে সমবায়ের প্রায় অর্ধেক জমিতে এই নতুন ধরনের বীজ বুনেছিল। আর তাতেই হঠাৎ যে সমবায় সমিতি আর সব সমিতি থেকে অনেক নিচে ছিল সেটি হঠাৎ এক লাফে জেলার প্রথম সারিতে উঠে গেছে আর পরের বারে ফসল তোলা শেষ হলে এর স্থান মিলেছে এই প্রদেশের চোদ্দটি সমবায় সমিতির ভেতর।

শুরুতে গুঙ্ কুয়ানু সমবায়ের নাম যখন সবাই করতে আরম্ভ করেছে, তখনও চিন ঠাণ্ডা মাথায় নিজেকে বিচার করার ক্ষমতা রাখত। বহুদিনের খ্যাতিসম্পন্ন গুওঙ জুয়ান আর তানু লাপু সমবায়গুলিকে ছাড়িয়ে গুঙ কুয়ান যখন এদেরই মাথায় চড়ে বসল তখন ভেতরে ভেতরে একটু অস্বস্তি হতো চিন-এর।

সেই বছর সারা প্রদেশের কৃষি উৎপাদনের পরিমাণ খতিয়ে দেখার জন্যে যে সভা ডাকা হলো তাতে চিনুকে ওপরের সারির কর্মী হিসেবে বেছে নেওয়া হলো আর তার উৎপাদনের পরিমাণ আদর্শ পরিমাণ হিসেবে গণ্য হলো।

যখন সে গ্রামে ফিরে এলো তখন তাদের সমবায়ের বিষয়ে প্রাদেশিক স্তরের সকলের কি বক্তব্য তাই শোনার জ্বলন্ত আগ্রহ নিয়ে তার যে সব কম-রেডরা এতদিন প্রতীক্ষা করছিল তারা এসে ঘিরে ধরল, গুঙ কুয়ান কোন সারিতে স্থান পেল? যে কথা শোনবার জন্যে কমরেডরা গভীর আগ্রহে অপেক্ষা করছে সে বিষয়ে কোন উচ্চবাচ্য না করে চিনু সভার যতসব ছোটখাট ঘটনার কথা বলতে লাগল, যেমন—প্রতিনিধিদের গোপনতা ও সতর্কতার বিষয়ে অংগীকার নিতে হয়েছিল। 'বাবাঃ, কল্পনা কর শহরের মাঝখান থেকে সভা পর্যন্ত সে কি বিরাট গাড়ির লাইন, প্রদেশের অন্যান্য বারের হোটেল এবার বদলে গেছে, সভায় যে সব মেয়েরা চা দিচ্ছিল তারা সবাই প্রায় আমাদের চেনা—এই ধরনের কথাবার্তা বলতে লাগল চিনু। যারা শুনছিল তাদের ক্লান্তি এসে গেল। তারা চিনু-এর কাছে সভার এই ধরনের বিবরণী শুনতে আসে নি। এ কথাগুলো মুখরোচক হলেও এর মধ্যে গুরুত্ব নেই কোন।

একমাত্র জেলা পরিষদের সচিব নাহুনু-ই বুঝতে পেরেছিল চিনু-এর অবস্থা। চিন-এর এখনও কোনটা মুখ্য আর কোনটা গৌণ সে বিষয়ে ধারণাটা একেবারেই পরিষ্কার হয় নি, তাই সে অপ্রধান বস্তুর ভিড়ে আসল বস্তুটি খুঁজে পায় নি। সে ভাবল এটা তবু মন্দের ভালও মুখ্যবস্তুটি ধরতে না পেরেও—সে যে সেটা বোঝবার ভান করে চাল মারে নি, সেটাই যথেষ্ট।

তিন

তৃতীয়বারের ফসল ওঠার পর গ্রুও কুয়ান উৎপাদনকারীদলের সম্মানপতাকা অর্জন করল। চিন নিজেকে অগ্রণী নেতা হিসেবে ধরে নিল আর তারপর থেকেই সবকিছু বদলাতে শুরু হলো আস্তে আস্তে।

এখনকার জনসভাগুলোতে আগেকার সেই সরে থাকা নীরব সভাকক্ষের পেছনের সারিতে আশ্রয় নেওয়া চিনকে আর খুঁজে পাওয়া যেত না। তার বদলে এক আত্মপ্রত্যয়বান মহিমান্বিত চিন কারুর দিকে দৃকপাত না করে প্রথম সারির চেয়ারের দিকে এগিয়ে যেত সরাসরি আর মনে মনে এটাও সে জানত যে বহুলোক কেউ বা সপ্রশংস আবার কেউ বা ঘৃণার চোখে চেয়ে আছে তার দিকে। জেলার অগ্রণী নেতাদের সংগে মিশত সে আর খুব সহজ ও আন্তরিকতার সংগে কথা বলত তাঁদের সংগে। এমন কি ওপর-ওলা লোকদের সংগে সে এত সাবলীলভাবে কথা বলত যে তাকেও ওদেরই সমকক্ষ বলে মনে হতো।

আগে আগে কাগজ পড়ে কাগজে যে সব জায়গায় তাকে অতিরিক্ত প্রশংসা করা হতো সেগুলো দেখে তার অস্বস্তি হতো। অন্যরাও যে তারই মতো প্রশংসা পাবার যোগ্য কাজ করছে অথচ খবরের কাগজে তাদের নাম বেরুচ্ছে না এই নিয়ে সে সমালোচনা করত। সাংবাদিকদের বলত ওরা গ্রুও কুয়ানকে নিয়ে বড্ড বেশি বাড়াবাড়ি করছে—এতটা প্রশংসা পাবার যোগ্যতা নেই তাদের। আর এখন গ্রুও কুয়ান-কে আকাশে তুলে কাগজে সুখ্যাতি বার হলেও সেটা তার মনো মতো হয় না! সে বলে—"কি ওরা যা লিখেছে তার থেকেও বেশি সুখ্যাতি পাবার যোগ্যতা নেই নাকি আমাদের। ওরা আমাদের প্রশংসা করেছে ঠিকই কিন্তু মাত্র কয়েকটা ছোটখাট কাজের যেগুলো আমরা ধর্তব্যের মধ্যে মনে করি না।"

এখন সে এতই মোহান্ধ হয়ে গেছে যে গ্রুও কুয়ান-এর সুখ্যাতিতে সে একটুও ক্লান্ত না হয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা একটানা শুনতে পারে বসে বসে। আবার সেই বক্তাই যদি অন্যান্য সমবায় অর্থাৎ ভিয়েত থ্যাঙ অথবা জুয়ান কুয়াঙ সম্বন্ধে সামান্যতম প্রশংসার কথা বললে তো চিন-এর যেন দম বন্ধ হয়ে আসে। সে সংগে সংগে তাকে বাধা দিয়ে বলে—"নিশ্চয়ই। ভিয়েত থ্যাঙ-এরও অনেক-গুলো গুণ আছে, কিন্তু আমরা আরও একটু খতিয়ে দেখলে ওর কতকগুলো দুর্বলতা দেখতে পাব। যেমন ধরা যাক ওদের উৎপাদনী খরচখরচার ব্যাপারটা। আমরা হিসেব করে দেখেছি ওদের একশো কিলো চাল উৎপন্ন করতে আমাদের থেকে ৫৮ সেন্ট বেশি পড়ে।"

কিম্বা যেমন—"জুয়ান কুয়াঙ-এর কথাই আলাদা। এটি জেলার নিকটতম

সমবায় তাই এর ওপর নজর খুব কাছ থেকেই পড়ে। তাছাড়া ওদের ধানী জমির আয়তন বেশ ছোট। ছোট জায়গায় ভালো ফসল ফলানো অনেক সোজা। সে তুলনায় আমাদের বেলেমাটির জমিগুলো আর পুকুরগুলো যদি তোমরা বাদ দাও তাহলে ওদের না আমাদের কোন সমবায় বেশি ভালো সেটা বল তো ? যখন তোমরা উৎপাদনের পরীক্ষার ফল ঘোষণা করবে তখন এসব বিষয়-গুলোকেও বিচার করতে হবে তোমাদের…”

চার

নবম এবং একাদশ ব্রিগেডের জমিগুলো পর্যবেক্ষণ সেরে নান সমবায় সমিতির মুখ্যসচিবালয়ে চলে এলো সরাসরি।

সেখানে তখন কেউই নেই। ভেতরে উঁকি দিয়ে দেখল চেয়ারগুলো এলো-মেলো হয়ে আছে। লাল রঙ করা টেবিলটা যেটাকে ডেস্ক হিসেবে ব্যবহার করা হতো, তার ওপর পড়ে আছে হুঁকো, কেটলি আর চায়ের কয়েকটা কাপ। মাটিতে একটা বাতি জ্বলছে—ছোট মটরের দানার মতো দেখাচ্ছে তার আলোটা। একটু আগেই এখানে একটা সভা শেষ হয়েছে মনে হয়। হতাশ হলো নান। কি দুর্ভাগ্য ! সে যদি খোয়াটের বাড়িতে একটুও না থেমে সোজা এখানে চলে আসত তাহলে হয়তো চিন-এর সংগে দেখা হতো তার।

বাড়িটার চারপাশ ঘুরে নগোই-কে খুঁজতে লাগল সে। এই বৃদ্ধ থাকে এখানে। আগে এখানকার প্যাগোডাটির রক্ষণাবেক্ষণের ভার ছিল এই নগোই-এরই ওপর। তারপর বোমার ঘায়ে সেটা ভেঙে যাবার পর এই দু'বছর ধরে সমবায় সমিতির মুখ্যসচিবালয়ের বাড়িটা পরিষ্কার করা আর দেখাশোনা করার ভার দেওয়া হয়েছে লোকটিকে।

নান মাঝমাঠেই দেখা পেল তার। সে ওখানে বসে কুলো বুনছিল। সে বলল—“ও দাদু, কর্মকর্তারা সব গেল কোথায় ? এখানে এখন কারুর ডিউটি নেই ?”

বৃদ্ধা মাথা তুলে বললো—“ও নাতনী এই কিছুক্ষণ আগেই এখানে চিন, হি, বে— সব মিলিয়ে জনা আষ্টেক লোক ছিল। ওরা এইমাত্র নদীর দিকে গেল। চুন আনতে যাচ্ছি বললো ওরা।”

একটু অপ্রস্তুত হলো নান।

“আচ্ছা চিন কি ফিরবে তাড়াতাড়ি ?”

বৃদ্ধ বারান্দায় একটা মাদুর এনে বিছিয়ে দিয়ে বললো—“ওর কথা বলা শক্ত। তবে অপেক্ষা করতে চাইছ যখন—তখন বস একটু। মনে হয় টাটকা তৈরি করা চা একটু বেঁচেছে, খানিকটা তুমি নিজে ঢেলে নিয়ে খাও।”

বেশ কিছুটা নীরবতার পর খুব নীরস গলায় প্রশ্ন করল বুধ "আচ্ছা নান, এ বছরেও কি অন্যান্য বছরের মতন জলের ওপর পুতুল নাচ হবে ?"

ওঃ এই জলের ওপর পুতুলনাচ কি সুন্দর। গত কয়েক বছর ধরে সব সমবায় সমিতিগুলো একত্রিত হয়ে যখন বাৎসরিক উৎপাদনের হিসেব নিকেশ করে এখানে, কুয়ান সমবায় সমিতি ভ্যান জা থেকে তখন জলের ওপর পুতুল-নাচের দলটিকে আমন্ত্রণ জানায় এখানে। চিন-এর পরিকল্পনা এটা। তখন চারিদিকে কি আনন্দমুখর এক উৎসবের মেজাজ এনে দেয় সকলের মনে। দলে দলে লোক আসে এটা দেখতে। গ্রামের জনসভার মাঠটির ঠিক সামনের একটা পুকুরে এই পুতুল নাচ অনুষ্ঠিত হয়। আগের বছরের দেখা নাচের পর থেকে পরের বছর আবার পুতুলনাচের সময় পর্যন্ত সবাই এই নাচের গল্প করে। পুতুলগুলো কি সুন্দর বেত বোনে, কি সুন্দরভাবে হাঁসের পরিচর্যা করে—ঠিক যেন জীবন্ত মানুষ—অবিকল তাদেরই মতন হাবভাব, চলাফেরা! অবিকল মানুষের মতো আদুড় গা, গোল চাঁদের মতো মুখ, পেট আর তার সঙ্গে হাস্যোজ্জ্বল চোখে কেমন তারা পুকুরের চারিদিকে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখে…।

নান বুধ নগুই-এর দিকে চেয়ে তার মনের ভাবটা আঁচ করতে চেষ্টা করল। এ ব্যাপারে বলার মতো তার নিজস্ব কিছু না থাকাতে সে প্রশ্নটি এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করে। "ওটা হবে কি না সেটা নির্ভর করছে আমাদেরই ওপর। এটা করবার জন্যে তোমাকে আমাকে সকলকেই সাহায্য করতে হবে।"

বুধ নিজের মাথায় হাতটা একবার বুলিয়ে হাসল। "কিন্তু আমার এ প্রশ্ন সরাসরি তোমাদের মতো নেতাদের উদ্দেশ্যেই করা। তোমরা সব সমস্যা-গুলো বোঝ ভালোভাবে। তোমরা নিশ্চয়ই এরই মধ্যে বুঝতে পেরেছ যে আমাদের সমবায় গত বছর বা তারও আগের আগের বছরগুলোর মতো এবারেও নিজের সম্মানের আসনটি অক্ষুণ্ণ রাখতে পারবে কিনা…"

বুধের দিকে স্থিরদৃষ্টিতে চেয়ে নান তার বিস্ময় চাপতে পারল না। বুধ নগোই নিজের কাজের ওপর ঝুঁকে পড়ে বেতের গোছাগুলো ঠিক করতে করতে অসংলগ্ন স্বরে প্রায় ফিসফিস করে কয়েকটি চতুর মন্তব্য ছুঁড়ে দিল।

"দেখ নান্ কথাগুলি বলছি শুধু তোমার আর আমার মধ্যে। চিন্ আজ-কাল মনে করে ট্রুঙ্ কুয়ান অনায়াসে আর সমস্ত সমবায় সমিতিগুলোকে ছাড়িয়ে যাবে। হি-ও ঠিক তাই মনে করে। পরশুদিন আমি শুনলাম ওরা বলছে আমাদের সম্মান গ্রহণের জন্যে যে নতুন ঘরটি তৈরি হয়েছে তার কাজ সম্পূর্ণ শেষ হয়ে গেছে তবুও এখন আমরা এর দ্বারোদ্ঘাটন করব না।

আমরা এ বছরের সম্মানের সার্টিফিকেট যেদিন পাব সেদিন এটার দ্বারোদ্ঘাটন করা হবে। আর কি বিরাট প্রোগ্রাম হচ্ছে! জলের ওপর পুতুলনাচ ছাড়াও আমরা এবার নতুন ধরনের অপেরা দেখতে পাব।

নানু উঠে দাঁড়িয়ে শেষবারের মতো পায়ে চলা পথের ওপরকার পাথরের সেতুটির দিকে চেয়ে বললো—"না, কারুর দেখা নেই আমাকে এবার যেতে হবে দাদু। চিনু যখন আসবে ওকে একটু বোলো ওর সংগে আমার একটু দরকার আছে, বলবে তো?"

বৃদ্ধ তার দিকে চেয়ে জিজেস করল—"তোমার দরকার কি খুব জরুরী?"

নানু হেসে বললো—"না দাদু, এমনি একটু দরকার ছিল।"

নানু চুপ করে থাকলেও নুগোই-এর কথাগুলো তার মনটাকে নাড়া দিল। বৃদ্ধ সবকিছুই দেখছে নির্ভুলভাবে। প্রায় এক বছর আগে চিনু-এর এই আত্মপ্রসাদের ভাব দেখে সে নিজে অত্যন্ত হতাশ হয়েছিল। এ ব্যাপারে কিছুই করতে পারছিল না নানু। কারণ চিনুকে নিয়ে সবাই অত্যন্ত বাড়াবাড়ি করছিল, প্রশংসা করে করে তাকে প্রায় মই দিয়ে আকাশে তুলেছিল। তার কোন ব্যাপারে কোন প্রশ্ন করা প্রায় অযৌক্তিক হয়ে পড়েছিল। একবার সে জেলা পরিষদের সচিবের কাছে চিনু-এর বিষয়ে এক বিচক্ষণ পরোক্ষ উক্তি করেছিল। তাই শুনে সে ভদ্রলোক এত হাসতে লাগলেন যেন হাসিতে ফেটে পড়ছেন। তার ভাবখানা এমন যেন নানু এতো তুচ্ছ ব্যাপারে বড্ড তাড়াতাড়ি উদ্বিগ্ন হয়ে ওঠে।

সেদিনের সেই জনসভার বিরতিতে একমাত্র নানু-ই শুধু উদ্বিগ্ন হয়েছিল। স্যাকু নামে তাদের সভার এক সদস্য তাকে একেবারে ডেকে বললো—"কথাটা শুধু তোমার আমার মধ্যেই বলছি—চিনু-কে এবার তোমার সাহায্য করার সময় এসেছে। সাফল্যের গর্বে চিনু-এর মাথাটা বিগড়ে গেছে। ও এবার ওর সাফল্যের ফয়দা ওঠাতে চলেছে।"

নানু দীর্ঘশ্বাস ফেললো। একটি দলের সচিব হিসেবে চিনু-কে এই সময় সাহায্য করা তার বিশেষভাবে উচিত, কিন্তু তাকে কোন কিছু প্রস্তাব দেওয়া একেবারে অসম্ভব ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। সে কোন সমালোচনার ধার ধারে না। এই কয়েকমাস আগে প্রশাসন বিভাগের একজন কর্মী উৎপাদন শাখার কয়েকটি ব্রিগেডের স্বল্প উৎপাদনের ওপর কিছু মন্তব্য করছিল। তাতেই রেগে টং হয়ে উঠল চিনু। এমনভাবে তাকে কথার উত্তর দিল সে, যে ও-বেচারা লজ্জায় মুখ রাখার জায়গা খুঁজে পায় না প্রায়।

স্যাকু-এর কাছে স্বীকার করল নানু যে "সমস্যাটা অত্যন্ত জটিল স্তরে এসে পৌঁছেছে। অনেক সময়েই আমার মনে হয় যে এবার আমার কিছু বলা উচিত..."

তাকে কথা শেষ করতে না দিয়ে স্যাক্ তার সমস্যাটা বুঝতে পেরেছে এমনভাবে মাথা নাড়ল। "তোমার অবস্থা বুঝতে পারছি আমি। আমি যখন ঐ দলের কর্তা ছিলাম তখন অবশ্যই কাজকর্মের ব্যাপারে আমিও ওর কাছে কিছু প্রস্তাব দিতে গেছি। কিন্তু চিনু আমার কথা কানেও নেয়নি। ও মনে করে অন্যের পরামর্শ নিয়ে কাজ করা অত্যন্ত লজ্জাকর। তোমার পক্ষে তো আরোই অসুবিধে—একে তুমি মেয়ে তার ওপর তোমরা দুজনেই একই সারির কর্মী। কিন্তু তা সত্ত্বেও তোমাকে কোন কিছু বলার জন্যে উপযুক্ত কমিটি বাছতে হবে। ওকে খুব আস্তে আস্তে বদলাতে চেষ্টা কর। এ তো শুধু ওরই ক্ষতির সম্ভাবনা নয়, পুরো আন্দোলনের ক্ষতি হবে এতে।"

এবারে নানু মন স্থির করে ফেললো কিছুটা। চিনু যখন খুব হাসিখুশি মেজাজে একা আছে তখনই সে স্যাকের তার বিষয়ে মূল্যায়নের কথাটা তুললো; কিন্তু সে তার বক্তব্যের ভাষা সম্বন্ধে খুব সচেতন হলো যাতে করে চিনু তার বক্তব্যের সমালোচনার খোঁচাটা না ধরতে পারে। তা সত্ত্বেও চিনু-এর মুখটা হঠাৎ কালো হয়ে গেল। কারণ চিনু এখন প্রচন্ড অভ্যস্ত হয়ে উঠেছে শুধু প্রশংসা, অভিনন্দন, খোসামোদ আর অলঙ্কৃত ভাষা শোনায়। তবু চট করে সে তার মুখের হাসিটা ফিরিয়ে আনল আর নান-কে খুব চাপাচাপি করতে লাগল এই সমালোচনা কে করেছে তার কাছে সেটা জানতে। "আমি জানি কে তোমাকে বলেছে কথাগুলো। তার নামটি শুধু আর একবার শোনার জন্যেই এটা বলছি আমি। কে সমালোচনা করল আমার তাতে কিছুই যায় আসে না কিন্তু আর একজন চুপ করে বসে সেটা শুনে এলো তো—তাই না?"

লজ্জায় লাল হয়ে উঠল নানু। অবশেষে সে বলেই ফেললো যে মন্তব্যগুলো করেছে স্যাক, কিন্তু তার ওকে সাহায্য করা ছাড়া আর কোন উদ্দেশ্যই ছিল না। আর সেই সংগে একথাও বললো যে নানু-এরও ওকে সাহায্য করা ছাড়া আর কোন উদ্দেশ্য নেই।

চিনু চুপ করে রইল দেখে মনে হলো যেন সে ব্যাপারটা বুঝতে চেষ্টা করছে। কিন্তু আসলে তা নয়। হঠাৎ উরুতে থাপ্পড় মেরে বলে উঠল সে—"আমি সবই বুঝেছি। ওই লোকটার উদ্দেশ্য খালি আমার সমালোচনা করা। শোন, প্রথমে ও যখন আমাদের গাঁয়ের মাথা ছিল তখন মনে আছে তোমার? কতকগুলো বিষয়ে ওর আর আমার মতের মিল হতো না। অনেকগুলো জিনিস সে নিজের ইচ্ছে মতন পরিচালনা করতে চাইত আর তখন আমি হয় ও ব্যাপারে কিছুই করতাম না, অথবা অনিচ্ছা সত্ত্বেও কিছু কিছু কাজ করতাম কিন্তু মুখে কিছু বলতাম না। তাতে করে ও রেগে যেত আর আমাকে ভাবত খুব উদ্ধত বলে। আমার সম্বন্ধে এখনও ওর মনে এই

কুসংস্কার রয়ে গেছে। দ্বিতীয়ত ও এখন ভিয়েত কুওঙ-কে খুব এগিয়ে নিতে চেষ্টা করছে আর তার জন্যেই আমাদের সমবায়কে ও পিছু হটাতে চেষ্টা করছে, তাই না ? সে আমাদের সমবায়ের আর কোন দোষ খুঁজে পাচ্ছে না, তাই সে পড়েছে আমার আত্মম্ভরিতার সমালোচনা নিয়ে। ঠিক তাই। এবারে বুঝতে পেরেছ তুমি ? দেখ আমি এসব লোকের মনস্তত্ত্ব জানি খুব ভাল করেই।"

তার যুক্তিতে ভয় পেয়ে নানু নিজের সাহস হারিয়ে ফেললো। চিনু-এর কাছে সমালোচনা মানেই হলো হয় সেটা হিংসে নয়তো সেটা কোন ব্যক্তিগত মনকষাকষির ব্যাপার। তাহলে কার কাছ থেকে সে গ্রহণ করবে কোন নির্দেশ বা প্রস্তাব ? নানু-এর অবস্থাও খুব জটিল। সে কিছু প্রস্তাব দিতে গেলে তার ব্যাপারেও ঠিক স্যাক-এরই মতন এই ধারণা হতে পারে চিনু-এর যে সে তার পথের বাধা হয়ে তাকে ঝামেলায় ফেলতে চায় অথবা একজন হিংসুকে প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবেও দেখতে পারে তাকে, ও নিশ্চয়ই নানু-এর বক্তব্যগুলোকে এইভাবেই বিচার করবে আর ও যদি এইভাবে জিনিসটাকে দেখে তাহলে দলের আর সকলেও তাকে তাই বুঝবে। দলের সকলেই চিনকে সহানুভূতি জানিয়ে বলবে—"বেচারা চিনু, আমাদের সব সাফল্যই এসেছে ওর জন্যে।" কাজেই বাছা এখানেই থাম। এটাতো ঠিক যে নিজেকে রক্ষা করার ক্ষমতা তার যথেষ্টই আছে, কাজেই থেমে যাও।

নিজেকে অনেক সংযত রাখার চেষ্টা করেছিল নান। কিন্তু নিজের ভয় থাকা সত্ত্বেও ঘটনাচক্রে পড়ে চিনু-এর ব্যাপারে তাকে হস্তক্ষেপ করতে হয়েছিল।

সেটা ছিল এক দশমী তিথি। হেমন্তের ফসল তোলা চলছে। এখানে ওখানে কয়েকটি ব্রিগেডের ছেলেমেয়েরা বসন্তের ফলনের জন্যে জমিচষা আর বীজবোনা শুরু করেছে। সেই সময় সদর কৃষিকার্যালয় থেকে একজন লাইসেন্স-প্রাপ্ত প্রযুক্তিবিদকে ব্রুংকুয়ান-এ পাঠালেন। দশদিন ধরে চিন ভান করতে লাগল এমন, যেন সে কাজের চাপে এক মিনিটের জন্যেও দেখা করতে পারছে না তার সঙ্গে। এমন কি সে কোথায় থাকবে তারও কোন কিছু ব্যবস্থা করবার সময় মিলছে না তার। ফলে সে বেচারীকে আজ এ বাড়ি কাল ও বাড়ি করে থাকতে হলো। বাড়ির জমি চষতে ব্যস্ত নানু-এর কানে পৌঁছল খবরটা। হাতের কাস্তে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে তার মাকে জমির বাকি কাজটুকু সেরে নিতে বলে সে ছুটে সেই বীজ বোনায় ব্যস্ত দলটির কাছে পৌঁছল যেখানে ঐ প্রযুক্তিবিদ কি করবে না করবে বুঝতে না পেরে উদ্দেশ্যহীনভাবে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

ওই এলোপাথাড়ি কাজের থেকে অব্যাহতি পেয়ে আনন্দে প্রযুক্তিবিদের মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। তার মনে হলো এবার নিশ্চয়ই কিভাবে কাজ করতে হবে তারই পাকা নির্দেশ এসেছে। তার প্রতীক্ষার দিন শেষ হলো। তাকে

দেখে নান্-এর মনে ভীষণ কষ্ট হলো। আর সেই সঙ্গে চিন্-এর ওপর প্রচণ্ড রাগ হলো তার।

এটা তার নিজস্ব কাজ—না হলেও দলগত দায়িত্বের কথা ভেবে সে তাকে দুপুরে থাকার মতো একটি আশ্রয়ের বন্দোবস্ত করল। তারপর লোকটিকে বোঝাতে হলো নান্-কে এ গাঁয়ে প্রযুক্তিবিদদের সর্বদাই সসম্মানে গ্রহণ করা হয় আর চিন্ যে এখনও পর্যন্ত তার সঙ্গে দেখা করে নি তার একমাত্র কারণ হলো তার অত্যধিক কাজের চাপ।

বিকেল বেলা চিন্-এর সঙ্গে দেখা করবার জন্যে সে তার বাড়ি গেল। মিষ্টি স্বভাবের মেয়ে নান্ খুব ভালোভাবেই চিনত নিজেকে, সে জানতো তার চড়া গলার স্বরে কেউই কেঁপে উঠবে না তাই সে অল্প গলা তুলে কথা শুরু করল।

চিন নির্লিপ্তভাবে শুনতে লাগল তার কথা। অনুতাপের ভান করে সে হেসে বললো—"দেখ তো আমি তার সঙ্গে দেখা করতে চাই যখনই ঠিক তখনই একটা না একটা কাজের চাপে পড়ে যাই।"

কিন্তু ভেতরে ভেতরে বেশ উদ্ধত হয়ে উঠেছিল সে। মেয়েগুলো সবই একজাতের। ওরা সব সময় তিলকে তাল করে। হঠাৎ তার মন আকৃষ্ট হয়ে উঠল বিষয়ান্তরেঃ আরে দেখ নিচে ঐ ছেলেটাওতো চিন্-এরই ছেলে চিন্-না? মিসেস লু-র জলার ধারে পেয়ারা গাছের ডালে চড়েছে না? ভয়ে যেন দমবন্ধ হয়ে এলো চিন্-এর। হতভাগা ছেলে! আজ বাড়ি ফিরুক তারপর দেখে নেবে সে। প্রতিবার এতো মার খাচ্ছে তবুও ওর স্বভাব বদলাচ্ছে না একটুও?

হঠাৎ চিন্ বললো যে নান্ তাকেই ব্যক্তিগতভাবে দোষ দিচ্ছে। তার বক্তব্য হলো নিজেকে কি ভেবেছে চিন্। সে নিজেকে এতো উঁচুস্তরের লোক বলে মনে করছে যে তার কাছে আর সবাই নগণ্য, যে প্রযুক্তিবিদকে তাকেই সাহায্যের জন্যে পাঠানো হয়েছে প্রদেশ স্তর থেকে সেটা তার কাছে একটা হাসিঠাট্টার ব্যাপার বলে মনে হচ্ছে। সে রেগে আগুন হয়ে মুখখানা লাল করে বললো—"কি বলতে চাইছ তুমি? আমি কাজের চাপের জন্যে দেখা করতে পারি নি ব্যাস। গাঁয়ে নতুন কেউ এলে তার সঙ্গে দেখা করতে সময় লাগে আমার... তার ওপর আবার···ওর যোগ্যতা কতটা সেটা জানতে হবে আমাদের তারপর ওকে স্বাগত জানাতে আয়োজন করতে হবে।"

নান্-এর বিরক্তি বাড়তে লাগল। ক্রমশ তার মুখের রেখাগুলো শক্ত হয়ে উঠল—"এটা অভ্যর্থনা বা গ্রহণের প্রশ্ন নয়। তোমার ওর সঙ্গে এক মুহূর্তের জন্যে দেখা করে ওকে কি কি করতে হবে সেটুকু বলে দেবার মতনও একটু

সময় নেই এটা অসম্ভব। এ কথার কোন যুক্তি নেই। তাকে পাঠানো হয়েছে প্রাদেশিক স্তর থেকে। আমাদের শুধুমাত্র সাহায্য করবার উদ্দেশ্যেই—সুতরাং তার যোগ্যতা কি তা তুমি বেশ ভালো করেই জানো।”

শক্ত হয়ে উঠল চিন্। আমাদের সাহায্য করতে? তাহলে শোন, ওর আসা না-আসায় কিছু যায় আসে না আমার। আমি হলে ওকে এখানে আসতে বলতাম না কখনোই। আমাদের সাহায্য করতে আজ পর্যন্ত কেউ আসে নি তাতে করে আমার কোন ক্ষতি হয় নি। নিজের কাজ আমি নিজেই চালিয়ে যেতে সক্ষম। যত লোক আসবে ততোই নানা মুনির নানা মতের সৃষ্টি হবে—তাতে কি লাভ বলত? খালি খানিকটা হচপচ হবে।”

ঘৃণা মিশ্রিত রাগ আর বিরক্তিতে কাঁপতে লাগল নান্। কিন্তু আসল ব্যাপারটি বুঝল সে—চিন্-এর নিজস্ব কাজের এলাকায় সে আর কাউকে ঢুকতে দিতে নারাজ। পুরোপুরি স্বৈরতন্ত্রী সে। নান-এর নিজেকে এর আগে কখনও এত দুর্বল মনে হয় নি।

সেতু থেকে পাম্পিং স্টেশন—সেই যেখানে পথটা দুভাগ হয়ে একভাগ এগিয়ে গেছে উত্তরের গাঁয়ের দিকে—সেখানে নবম ও একাদশ বাহিনীর সম্পূর্ণ কাজটি যেদিন সকালেই দেখে এসেছিল নান্।

কাজটা দেখতে গিয়ে সে শুধু জমিতে ধানের ফসল ভালো হয় নি বলে দুঃখ পেয়েছিল আর বিচলিত হয়েছিল তা নয়। তার মনে হয়েছিল এখানে বাহিনীর কাজটা নিছক লোক দেখানো গোছের হয়েছে। রাস্তার পাশের খামার ঘরের পাশের, সমবায়ের প্রধান কার্যালয়ের পাশের জমিগুলো অর্থাৎ যেগুলো সব সময় লোকের নজরে আসে, সেগুলো গাঢ় সবুজ রঙ মনকে ভরিয়ে দিচ্ছে। সে তুলনায় একটু দূরের গাঁয়ের শেষ প্রান্তের কিছু কিছু জমি পাখির পায়ের পাতার মতো ফেটে চৌচির হয়ে আছে, কোথাও বা ধানের চারার পাশাপাশি মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে আগাছার ঝাড়—কেন? কেন এমন হবে?

দাদু নুগোই-এর সংগে মুখে গল্প করলেও নান্-এর মনটা তলিয়ে গিয়েছিল অন্য এক চিন্তায়। সে শুধু ভাবছিল সে যা চোখে দেখে এলো কিভাবে সে বিষয়ে সমালোচনা করলে চিন্‌কে তার আসল কর্তব্য অর্থাৎ জমির ফলনের ব্যাপারে সজাগ করতে পারবে। সে যদি চিন্-কে এ ব্যাপারে ঠিকমতো বোঝাতে পারে, তবেই সকলে একত্রে বসে সমালোচনা করে, বিভিন্ন দল মিলে জমিগুলো দেখে এসে সমস্যার মোকাবিলা করে নিজেদের ভুল শোধরাতে পারবে। তা না হলে এবারের ফসল একেবারেই ভালো হবে না। কিন্তু ওর সংগে আলোচনা করাই তো মুশকিল। আর আমার মতো

মেয়েকে দিয়ে কি হবে—যে একেবারেই লোককে খোসামোদ করতে জানে না। সাধারণের ভালোমন্দ নির্ভর করছে যে ব্যাপারে সেটাকে ঘুরিয়ে পেঁচিয়ে বলা যে কি শক্ত তা বলা যায় না। কথাটা কিন্তু যদি সোজাসুজি বলি আমি তাহলেই তার আঁতে ঘা লাগবে, সে কিছু শুনতেই চাইবে না, আর কোন কাজও হবে না। হেরে পেরে সে বললো, বাবা যথেষ্ট হয়েছে আমি বুঝতেই পারছি না কি করব।

মাথাটা ধুয়ে বিনুনীর জলটা নিঙড়ে নিয়ে ঘাড়ের কাছে একটা ছোট্ট খোঁপা বেঁধেই তার কতকগুলো ধানচারায় ভর্তি, থলেটা নিয়ে সে চিনু-এর বাড়িমুখো হাঁটতে শুরু করলো।

রান্নাঘর থেকে মা চেঁচিয়ে উঠলেন ভাত হয়ে গেছে তো, একটু কিছু মুখে দিয়ে যা। নানু চেঁচিয়ে বললো—"প্রভু চিনু যখন ভাত খেতে বসবেন ঠিক সেই সময়ের মধ্যে না পেঁছলে তাকে আমি আর ধরতে পারব না মা। তুমি খেয়ে নিও কিন্তু।"

বস্তুত চিনু তখন চতুর্থ বাহিনীর কাজকর্ম দেখতে বেরুবার জন্যে তৈরি হচ্ছিলো। তার খাওয়াদাওয়া শেষ করে সাইকেল নিয়ে উঠোনটা পার হচ্ছিল। নানু-কে আসতে দেখে টেবিল সাফ করতে করতে ছোট্ট ত্রিনু তাকে স্বাগত জানিয়ে চিৎকার করে বললো—"বাবা নানু আমাদের সঙ্গে দেখা করতে এসেছে।"

চিনু-এর স্ত্রী ঠিক তার ছেলেরই মতন সপ্রতিভ। সে তার ছোট ছেলেটিকে কোলে নিয়ে ভাত খাবার সময় ব্যবহারের জন্যে ছেঁড়া খোঁড়া মাদুরটা গুটিয়ে ফেলে একটা আনকোরা নতুন সাদা মাদুর বিছিয়ে নানু-কে তাতে বসতে অনুরোধ করল। অবিবাহিত নানু-এর সন্তান সম্বন্ধে কোন অভিজ্ঞতা না থাকলেও চিনু-এর স্ত্রী তার সঙ্গে তৃতীয় কন্যা ইয়েনু সম্বন্ধে এক বিরাট বিস্তারিত কাহিনী শুরু করল। রাত্তিরে বিছানা ভিজিয়ে ফেলা ছাড়া মেয়েটার আর কোন অসুখ নেই তবুও মেয়েটা ভালোভাবে বেড়ে উঠছে না, দিন দিন রোগা হয়ে যাচ্ছে। যাতে মেয়েটা ভালো হয়ে যায় তেমন কোন ওষুধ বা গাছগাছড়া নানু-এর জানা আছে কি? মেয়েটা তখন মাথার চুলে নীল প্লাস্টিকের ক্লিপ আটকে উঠোনের মাঝখানে দাঁড়িয়ে বুড়ো আঙুল চুষছিল।

চিনু তার স্ত্রীর দিকে বিরক্তির দৃষ্টি হানলো। এর কথার কি আর শেষ নেই? সে আজ তাড়াতাড়ি বার হবে বলে স্ত্রীকে একটু চটপট রান্না করতে বলেছিল। কিন্তু বোঝ ব্যাপার, সে আজ সকালের কাজের সময় থেকে বহুক্ষণ নষ্ট করেছে এই মেয়েকে স্নান করাতে। আর সেই জন্যেই

তার সবকিছু পণ্ড হলো। সময়মতো বেরোনো হলো না অথচ চতুর্থ বাহিনীর কর্মীরা বরাবরই নির্দিষ্ট সময়ে জমায়েত হয়। অধৈর্যে চিনু তার স্ত্রীর কথার মাঝখানেই বলে উঠলো—"কমরেড, তুমি কি কোন জরুরী কাজের ব্যাপারে এসেছ ?" সাইকেলের সিটে আঙুল নাড়াতে নাড়াতে চিনু বললো "মিনিট পনেরো সময় দিলে তোমার কাজের কথা শেষ হবে ? মানে আমি তো জানতাম না যে তুমি এখন আসবে (এটা অবশ্য তার মিথ্যে কথা—মনে মনে সে ভাল করেই জানতো নানু আজ আসবে) তাই আমি চতুর্থ বাহিনীকে জমায়েত হতে বলেছিলাম এই সময়েই। আর তাছাড়া বিনু-এর আহত মোষটা নিয়ে যে সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে আমাকে আজ তারও একটা মীমাংসা করতে হবে।"

অপমানে কালো হয়ে গেল নানু-এর মুখ। মাত্র পনেরো মিনিটে কি ধরনের আলোচনা করা যেতে পারে তার সংগে ? সে উঠে পড়ে যথাসম্ভব মিষ্টি হেসে বললো- "সেটা তোমার উপরেই নির্ভর করছে। তুমি যদি এ আলোচনা পনেরো মিনিটে করে ফেলতে পারো তাহলে খুবই ভালো। আমারও গ্রামে রক্ষীবাহিনীর অফিসে একটা সভায় যাবার কথা আছে এখনই।"

শুরু থেকেই চিনু স্পষ্টতই এই আলোচনাটা এড়াবার জন্যে অধৈর্য হয়ে উঠেছিল। চেয়ারের কোণায় কোন রকমে বসে উঠোনে রাখা সাইকেলটার দিকে বারবার তাকিয়ে সে নানু-কে স্পষ্টই বুঝিয়ে দিচ্ছিল—"যা বলবার আছে চটপট বলে ফেল, আমার অন্য অনেক কাজ পড়ে আছে। "নানু সব দেখে বুঝেও তার থলে থেকে একটি একটি করে ধানের চারা বার করে শান্ত-ভাবে তার সামনে মেলে ধরতে লাগল—সাদাটে ধানের চারাগুলো প্রায় হলদে হয়ে শুকিয়ে আসছে। চিনু ক্রমশ কাঠ হয়ে যাচ্ছিল, তারপর কোনমতে নিজেকে সংযত করে এগুলো সবই যেন তার দেখা জিনিস এমন ভাণ করতে লাগল।

সে বললো—"জানি জানি এ চারাগুলো এসেছিল তিন কন্যার মন্দির থেকে। খুবই অল্প কতকগুলো চারা মাত্র কয়েক জায়গায় লাগানো হয়েছে।"

নানু মাথা নেড়ে বললো—"না না অল্প জমিতে এ চারা লাগানো হয় নি। অনেকটা জমিতেই এগুলো লাগানো হয়েছে . এমন কি নবম আর একাদশ বাহিনীর জমিগুলোতেও এই চারা লাগানো হয়েছে। আমি ঐ বাহিনী দুটির লোকেদের কখনো বিশ্বাস করতাম না বিশেষ করে খোয়াকে যে নবম বাহিনীর অধিকর্তা যিনি সর্বদাই কাজে ফাঁকি দিয়ে মিথ্যে মিথ্যে ভালো কাজের রিপোর্ট দিতেন..." কথাগুলো বলতে বলতে নানু-এর মুখটা টকটকে লাল

হয়ে উঠলো। সে মোটেই চিন্-কে খোঁচা দেবার জন্যে ওই লোকটির কথা তোলে নি। "আর সবচেয়ে খারাপ ব্যাপার সেটা হলো রাস্তার ধারের জমি-গুলো, লোকজনের যাতায়াতের পথের ধারের জমিগুলো যেগুলো সর্বদা লোকের চোখে পড়ে সেই জমিগুলোর ওপরেই খোয়া বেশি যত্ন নিয়েছে। অন্য জমিগুলোর জন্যে কোন গ্রাহ্যই নেই ওর। এই ধানের চারা আর ওই লালচে হয়ে যাওয়া চারাগুলোর বিশেষ প্রয়োজন উপযুক্ত সারের। আর এই প্রায় শুকিয়ে আসা চারাগুলো এনেছি খালের ধারের জমি থেকে। খালের ধারের জমিতেই দেখেছি বেশি জলাভাব। অদ্ভুত ব্যাপার তাই না? আজ সকালে আমি এ ব্যাপারে খোয়ার সঙ্গেই আলোচনা করতে গিয়েছিলাম কিন্তু ও তখন ওখানে ছিল না। ওর ছোট মেয়েটা শুয়োরের জন্যে জল-মসুর গুঁড়ো করছিল। সে বললে তার বাবা নেমন্তন্ন খেতে গেছে।"

চিন্ তার মনের বিরক্তি প্রাণপণে ঢাকবার চেষ্টা করছিল (ব্রিগেডে যখন কোন কাজে গলতি হতো সেটা সে ছাড়া অন্য কেউ জেনে ফেলে এটা সে কিছুতেই বরদাস্ত করতে পারতো না।)

চিন্ বলে উঠলো—"খোয়া খারাপভাবে কাজ করে সেটাকে খুব ভালো কাজ বলে চালাতে চেষ্টা করে—সব সময় এটা বললে কিন্তু ওর সম্বন্ধে একটু বাড়িয়ে বলা হবে। তবে হ্যাঁ এটা সত্যি যে এ বছরের এই বাহিনীগুলো জমিতে মোটেই উচ্চাঙ্গের সার দেয় নি, তাই জন্যেই ওরা ওদের দোষটা খানিকটা ঢাকবার চেষ্টা করছে···" সে আলোচনার গুরুত্বটা একটু হাল্কা করে দিতে চাইছিল। "ঠিক আছে, ঠিক আছে এগুলো সব জানা রইল। তুমি এ ব্যাপারে আমাকে সচেতন করে ভালোই করেছ। কালকে আমি নিজে গিয়ে এগুলো সব দেখে আসব। একটু চা খাও, মিষ্টার কুইং আমাকে থাই ন্‌গুয়েন-এর চা উপহার দিয়েছে। কি হলো এটা ভালো লাগছে না তোমার? কড়া লাগছে? দাঁড়াও আর একটু জল মিশিয়ে দিই। ভালো কথা আগামী-কাল রাত্রে তুমি যদি সেলের একটি মিটিং-এর আয়োজন কর তাহলে সেখানে আমরা নদীর ধারের ডাঙা জমির ব্যাপারে কিছু আলোচনা করতে পারি। জানো, এ বছর আমি মন স্থির করে ফেলেছি যে এটাকে সমবায়ের আওতায় আনবোই।"

বেচারা নান্! সে ভাবল একবার অন্তত জ্বলন্ত প্রমাণ সামনে দেখে চিন্-কে খুব নরম হতে হলো, তার অহমিকার বড়াই ভাঙতে হলো। নান্-এর ছলাকলা বোঝার মতো অভিজ্ঞতা ছিল না একেবারেই, তাই সে এখনকার কথা-গুলো ধ্রুব সত্য বলে মেনে নিল। কারণ ও ভাবল এবারে ওর জারিজুরি ভেঙেছে—এই ভেবে সে খুব আশ্বস্ত ও বিগলিত হয়ে ফিরল। নিজেকেই

সে ধিক্কার দিতে লাগল এতো সহজ কাজটা তার অযথা কতো কঠিন মনে হচ্ছিল বলে।

মনে মনে কত যুক্তিই না সাজিয়ে নিয়ে গিয়েছিল সে কিন্তু কাজটা কত সহজভাবে হয়ে গেল। যদি এই কমরেড সম্বন্ধে তার মনে কিছু ভুল ধারণা না থাকত, সে যদি চিন্‌কে ঠিকমতো মূল্যায়ন করতে পারত তাহলে অনেক আগে থেকেই সে এর সঙ্গে সব ব্যাপারে খোলাখুলি আলোচনা করতে পারত আর অনেক সমস্যার সমাধানেও একে সাহায্য করতে পারত। এই ব্যাপারে নান্‌ নিজেই দোষী।

তাদের কথাবার্তা যখন বেশ সহৃদয়তার সুরে চলছিল তখন নান্‌ চাষের জমিগুলো ঘুরে ঘুরে দেখার সময় কি কি দেখেছে তার বর্ণনা দিতে লাগল। নান্‌ দুয়োঙ্‌-এর কাছে ফলন সত্যিই ভীষণ ভালো হয়েছে, এমনকি আমাদের বাড়ির লাগোয়া জমি পর্যন্ত। জমিচাষের এক আদর্শ নিদর্শনের মতো। আমার তো প্রথমে মনে হয়েছিল এ যেন হেক্টরে দশ টন উৎপাদন ক্ষমতাসম্পন্ন জমি। কিন্তু তারপর দেখলাম—না, এ অন্য সমবায়ের জমিরই মতন ফলন। একথা আমাদের স্বীকার করতেই হবে যে অন্য সমবায় সমিতিও খুব ভাল কাজ করছে।

চিন্‌ মুখ উঁচু করে ঠোঁটের কোণটা মুছে বললো—"আজ্ঞে হ্যাঁ, ও তো আমাদের বীজ। কিছুদিন আগে ওদের দিয়েছি আমরাই..."

"হ্যাঁ তাহলেও এটা স্বীকার করতেই হবে যে ওই বীজগুলোতে ওরা খুব খেটেখুটে সুন্দরভাবে ফসল ফলিয়েছে। আর একথাও শুনলাম যে ওরা ওদের সঞ্চয়ও বেশ বাড়িয়ে ফেলেছে এর মধ্যেই। বাইরে থেকে ওদের গুদোমটা খুব চোখে না পড়লেও ভেতরটা ভারি সুন্দর। সমবায়ের উন্নতির জন্যে ওরা বিশেষজ্ঞের খোঁজে হাই হুঙ্‌ পর্যন্ত ছুটেছে। খুবই খেটেছে ওরা।" এক মুহূর্ত একটু ইতস্তত করে নান্‌ বললো "আমি ভাবছি একবার দলবদ্ধভাবে ওখানে গিয়ে ওদের কাজ দেখলে আমরাও অনেক কিছু শিখতে পারব। বিরাট দল নিয়ে যাবার কোন দরকার নেই, একটা ছোট্ট দল নিয়ে গেলেই চলবে..."

হঠাৎ চিন্‌ স্বপ্নোত্থিতের মতো হয়ে উঠল। হাসিতে ফেটে পড়ল সে—কি শিক্ষা? কাদের কাছ থেকে? নান্‌ দুয়োঙ্‌-এর খোঁয়াড়ের ঐ জন্তুগুলোর কাছ থেকে? চিন্‌-এর অজান্তেই নান্‌ তার কাছে আরো অসহ্য আরো অপদার্থ হয়ে উঠতে লাগল। সে তার খোঁপার দিকে এক নজর দেখল একটা লেবুর মতো ঘাড়ের পেছনে দুলছে। কঠোর বিদ্রুপের সঙ্গে সে ভাবল—"এই মেয়েটা একেবারে অপদার্থ, আর এই কিনা বসে আছে উঁচু সারি কর্মীর দলে। এ একেবারেই অসহ্য ব্যাপার!"

চিনু-এর অন্য সময়ের মতো রাগ বা বিরক্তি জাগল না। তার মনে জেগে উঠল অনুকম্পা। নানু-কে দেখে তার করুণা হলো। সে ভাবল ছোট্ট বাচ্চাকে যেভাবে বোঝানো হয় একেও সবকিছু সেইভাবে বোঝানো তারই কর্তব্য। "তোমার কথা আমি সর্বান্তঃকরণে সমর্থন করছি যে আমাদের পরস্পরের কাছ থেকে অনেক কিছু শেখার আছে, কিন্তু এটা তো আমাদের আগে বুঝতে হবে যে শিখব কাদের কাছ থেকে। সেই জানাতেই যদি ভুল থাকে তাহলে পন্ড-শ্রম হয়ে যাবে আমাদের সবটাই। শোনু একটা দল গড়তে হলে অন্তত দশজন লোক নিতে হবে, আর যদিও জায়গাটা বেশি দূরে নয় তবুও আধবেলা নষ্ট হবে তো! শুধু তাই নয় একদিন গেলেই তো হবে না, আরেক দিন যেতে হবে, তাই নয়? শুধু গতানুগতিক মত বিনিময়ের জন্যে একটা পুরো কাজের দিন নষ্ট করা হবে? কিসের বিনিময়ে? আমরা সময় নষ্ট করব, অপরের কাছে নিজের হীনতা স্বীকার করব আর অপরের হাসির খোরাক হয়ে উঠব? যেমন তুমি এখন বলছ নাম দুয়োঙ স্কুল থেকে শিক্ষা নিতে···। সে লজ্জায় লাল হয়ে উঠল এই কথাটা মুখে উচ্চারণ করেই কারণ সে নিজে কি করে এতটা নিচে নামবে যে ঐ বোকা থাকু তাকে উপদেশ দেবে কি ভাবে কাজ করে এগিয়ে যেতে হয় আর তাই শুনবে চিনু। সে গম্ভীরভাব বজায় রাখার জন্যে বিশেষ চেষ্টা করতে লাগল। "হ্যাঁ, কি বলছিলাম? ও হ্যাঁ, নাম দুয়োঙ-এর কাছ থেকে শিক্ষা নেওয়া। সবিনয়ে বলছি তোমার চেয়ে নাম দুয়োঙ সম্বন্ধে অনেক বেশি জানি আমি। স্বীকার করছি যে কিছুদিন হলো তারা কয়েকটা ব্যাপারে খানিকটা এগিয়েছে। কিন্তু এই এগিয়ে আসার ফলে এবারে তারা আমাদের পদাংক অনুসরণের যোগ্যতা অর্জন করেছে। কিন্তু আমাদের ছাড়াতে হলে এখনও আরো আরো অনেক অপেক্ষা করতে হবে তাদের। ওদের কাছ থেকে শেখবার মতো কিছুই নেই আমাদের। তুমি শিখতে চাও? ভালো কথা আমি বলি কি আমাদের নিজেদের কাছ থেকেই শিক্ষা শুরু কর সেটাই যথেষ্ট হবে।" চোখ বড় বড় করে সে বললে—"তোমায় আমি যথার্থই বলছি গরমকালে কি করে 'আজোলো' বীজ জলে রাখতে হয় তা শিখতে চাও? তাহলে চলে যাও সাত নম্বর বাহিনীর কাছে। সার কি করে তৈরি করবে জানতে চাও? তিন নম্বর বাহিনীতে যাও। কাজকর্ম কিভাবে করতে হয় শিখতে চাও? তাহলে এক আর আট নম্বর বাহিনীতে যাও। প্রত্যেকটি বাহিনী উচ্চাঙ্গের। নবম বাহিনী যাদের কথা বলছিলে তুমি, ওরা শুধু এবছরেই তাদের উপযুক্ত মানে পৌঁছতে পারে নি—অন্যান্য বার এরাই কি চাষ আর ফসল তোলার সময় অপূর্ব কাজ করে নি?"

নানু আশ্চর্য হয়ে গেল—মন ভরে উঠল বিষাদ আর হতাশায়। চিনু-এর

ছলনা আর একনায়কত্ব বুঝতে আবার ভুল হলো তার, আবার সে বুঝতে ভুল করল।

নানু চেয়ে রইল ওর দিকে কিন্তু ওর একটা কথাও শুনল না সে। এখুনি কি বললো ও? ও হ্যাঁ, নামু দুয়োঙ-এর যে প্রধান সচিব সে বোকা আর কোন মতিস্থিরতা নেই তার। আর কি? এটা সত্যি যে থাকু-কে দেখে তোমার খুব প্রতিভাবান মনে হবে না, কিন্তু ওর কি মতিস্থিরতা নেই? মোটেই না, সে শুধু একটু বেশি কথা বলে, কিন্তু অত্যন্ত আগ্রহের সংগে ও অপরের কথা শোনে আর নিজের ভাবনা চিন্তাগুলোও অন্যকে জানাতে চায়। একদিন নানু ওকে ধানের চারা লাগাচ্ছিল যে মেয়েগুলো তাদের মাঝখানে গাছের গুঁড়িতে বসে থাকতে দেখেছে ওর চারপাশে আগাছার স্তূপ। কাঠের তক্তা, চায়ের কাপ আর একগাদা বাটি। মেয়েরা যারা চাষ করে আর যারা চারা পোতে—এই দু'দলের মজুরির ফারাক নিয়ে খুব সমালোচনা করেছিল, থাকু নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে শুনে যাচ্ছিল ওদের কথা। তার শোনার ধরন দেখে মনে হচ্ছিল সে যেন বিশ্লেষণ করে চলেছে এরা যা বলছে তার কতটা ঠিক আর এ ব্যাপারে তার বিচার কতটা ভ্রান্ত বা অভ্রান্ত। এমন লোকের কাছ থেকে কিছু তো শেখবার আছে আমাদের অন্তত তার এই বিনয়ী স্বভাবটাও তো শিক্ষণীয়। সর্বনাশের পথে এগিয়ে যাচ্ছে চিনু।

পাঁচ

সর্বনাশের পথে এগিয়ে চলেছে চিনু এই কথা ভেবে সেদিন ভয় পেয়েছিল নানু, কিন্তু সেই চরম সর্বনাশ যে ঘটবে এতো তাড়াতাড়ি, মাত্র দু'মাসের মধ্যে সে কথা কল্পনাও করতে পারেনি সে। কিছুই হয় নি, কোন নতুন কিছুই ঘটে নি। বছরের প্রথমে ফসল তোলার পর ব্রুঙ কুয়ান অন্য সব সমবায়ের মধ্যে আপন স্থান অক্ষুন্ন রাখল হেক্টর প্রতি সাত টনের ওপর ফসল হবে বলে।

নবম শুক্লপক্ষের কাছাকাছি দ্বিতীয় দফার ফসলের ধানের গাছগুলোতে যখন সোনালী রঙ এলো, প্রশাসন শাখার কমরেডদের সংগে সমস্ত জমিগুলো মোটামুটি দেখে এসে চিনু বেশ আশাবাদী এবং নিশ্চিন্ত হলো। ব্যাগটাকে কোমরের পেছনে সরিয়ে হাতদুটো রগড়াতে রগড়াতে উচ্ছ্বসিত হয়ে বললো—"দারুণ ব্যাপার। মনে হয় হেক্টরে চার টন করে হবে—কি কেউ বাজি রাখতে চাও? আচ্ছা ঠিক আছে, একটু কমের দিকেই ধর, তিন টন সারে তিন টনই সই—(সে মনে মনে হিসেব করতে লাগল) সাড়ে তিন টন, তার মানে ১৩ বস্তা প্রতি "সায়ো"-তে (Sao)। নাঃ, দেখে যা মনে হচ্ছে এটা শেষ পর্যন্ত চোদ্দ পনের বস্তায় পেঁছবে। হ্যাঁ, হ্যাঁ তোমরাও দেখ আমার হিসেব ঠিক কি না।"

সমিতির একজন সদস্য সংশয়ের সুরে বললো—"হ্যাঁ এটা ঠিক যে খুব খেটেছি আমরা, কিন্তু তবু আমার মনে হচ্ছে নামু দুয়োঙ-এর থেকে পিছিয়ে পড়ব আমরা"। কথার সমর্থন পাবার আশায় চারিদিকে চাইল সে। "ওদের ধানের ফলন সত্যিই খুব ভালো হয়েছে। আমাদের যদি হেক্টরে সাড়ে তিন টন হয় তো ওদের চার অথবা চার পয়েণ্ট দুই মতন হবে।"

চিনু-এর মুখ নিষ্প্রভ হয়ে গেল, কালো হয়ে উঠলো মুখটা। মাঠেও এই কিছুক্ষণ আগেই সে নামু দুয়োঙু-এর ধান ক্ষেতের প্রশংসা শুনে এসেছে। ঠিক আছে, ওদের চাষ ভালোই হয়েছে, তা বোলে আমাদের থেকেও ভালো? এটা বেশি বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে! একথা বিশ্বাস করলে তো নিজেদের কর্ম-ক্ষমতাকে খাটো নজরে দেখতে হয়।

কিন্তু জেলা স্তরে একটি সভায় যখন এবারের ফলনের একটা সাময়িক হিসেব করা হচ্ছিল তখনই চিনু একেবারে অবাক হয়ে গেল। মনে হলো মাথা নিচু করে হাঁটিতে হাঁটিতে হঠাৎ যেন তার মাথাটায় পাথরের ধাক্কা খেল। নামু দুয়োঙ যাকে সে সব থেকে ওঁচা বলে মনে করত এবারে তারাই কিনা হেক্টর প্রতি চার পয়েণ্ট নয় টন ফসল ফলিয়েছে? এ হতেই পারে না। এ হিসেবে নিশ্চয়ই কিছু কারসাজি আছে। যেমন ধরো—তার চোখ উজ্জ্বল হয়ে উঠলো—ওরা হয়তো কম আবাদী জমিগুলো অর্থাৎ কিনা পুকুরপাড়ের জমি, হয়তো তুঁত গাছের গা পর্যন্ত যে জমিগুলো আছে, যেগুলোর ফসল খুবই কম হয়—ঠিক তাই! ওগুলো নিশ্চয়ই দেখায় নি ওরা এই হিসেবের মধ্যে—ওঃ এই কৌশল করেই ওরা হেক্টর প্রতি ফলন আকাশছোঁয়া করে দেখিয়েছে। দীর্ঘশ্বাস ফেলে ভাবলো…আর তাছাড়া মানুষ যদি অসৎ হতে চায় তাহলে কৌশলের কি আর অভাব আছে।

হিংসের জ্বালায় মাথা খারাপ হয়ে গেল চিনু-এর। ওর সন্দেহের কথাগুলো বলবার জন্যে জেলা পরিষদের সচিবকে খুঁজে বার করতে ছুটলো। সে যে ব্যাপারে কথা বলতে গিয়েছিল সেটাকে সে যথাসম্ভব সাধারণভাবেই বলতে চেয়েছিল কোন বিশেষ বিষয়ে ইঙ্গিত না করে, তবুও তার বক্তব্যের মধ্যে তার ভেতরের চাপা রাগ দুঃখ চাপা রইল না।

জেলাসচিব খুব বুঝদার আর প্রাণবন্ত মানুষ। তিনি ভাবলেন ওর যা যা বলার আছে বলুক। সব শোনার পর উনি ওর পিঠ চাপড়ে অট্টহাসিতে ফেটে পড়লেন। "ওহে বাপু শোন, তিন বছর আগে তো তোমরা সকলের পেছনে পড়েছিলে! তারপর হলো দারুণ উন্নতি। তোমরা ছাড়িয়ে গেলে গুয়েঙ ডুয়ান, টানুল্যাপ আরো আরো অনেককে। কিন্তু তুমি যেমন নামু

দুয়োঙ-এর উন্নতিতে সন্দেহ করছ, তোমাদের উন্নতিতে কেউ তো সন্দেহ করে নি তখন। সেটা মনে করে দেখ তো বাপু!"

কিন্তু বার্ষিক খতিয়ানের সময় রাগে জ্বলে পুড়ে গেল চিনু। শুধু নামু দুয়োঙ যে তাদের প্রথম স্থানটি দখল করে নিয়েছে তাই নয় তারা দ্বিতীয় স্থানটিও পায় নি। এমন কি জেলার উচ্চ ফলনশীল সমবায়ের তালিকা থেকে অদৃশ্য হয়ে গেছে য়ুওং কুয়ান-এর নাম। চিনু অবশ্য চেষ্টা করেছিল অনেক কিন্তু ও জানতেও পারে নি যে সারা জেলার সব সমবায়ের উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা হেক্টর প্রতি পাঁচ থেকে সাত টনে পেঁাছে গেছে।

তাই বার্ষিক সমাবেশে সবাই যাকে খুঁজছিল, সবাই যার দিকে চেয়ে দেখছিল, যাকে শ্রদ্ধা জানাচ্ছিল সে চিনু নয়—সে হলো থাকু। সেই বিসদৃশ চেহারার কিম্ভূতাকার লোকটি নিজেকে খুব নগণ্যই মনে করছিল, তাই সবাই যখন তাকে প্রাপ্য সম্মান জানাচ্ছিল, সে খুব বিব্রত বোধ করছিল তাতে। এই বস্তুতান্ত্রিক মানুষটি জীবনে অনেককেই দেখেছে…

চিনু-এর মনে হলো (যদিও এই মনে হওয়াটা তার সম্পূর্ণ ভুল) লোকে তাকে ভাবছে নির্লজ্জ, ভাবছে তার এখানে উপস্থিতির আর কোন প্রয়োজন নেই সেটা যেন চিনু বুঝতে পারছে না। অন্যান্য বছরের মতন সে এবছরেও খানিকটা জোর করে প্রথম সারিতে বসল। কিন্তু পরক্ষণেই সে বুঝতে পারল সবকিছু একদম পাল্টে গেছে। তার সম্বন্ধে কেউ কিন্তু মন্তব্য করে নি। নেতারা আগের মতই হেসে কথা বলেছে। তবুও স্পষ্ট মনে হচ্ছিল প্রথম সারিতে তার স্থান আর নেই। আগেকার মুখচেনা ফটোগ্রাফাররা যখন বেশ মোলায়েম করে তাকে একটু এপাশে সরে আসতে বললো কারণ তারা থাকু-এর ছবি তুলতে চায় ভালো করে তখন তো ব্যাপারটা আরো স্পষ্ট হয়ে গেল।

সব থেকে বেশি আঘাত লাগলো কিন্তু তার মনে যখন সমবায়ের প্রধান কার্যালয়ের সামনের রাস্তা ধরে দলে দলে ফিল্মের লোক আর প্রতিনিধিদের দলগুলো নামু দুয়োঙ-এর দিকে এগিয়ে চললো ঠিক তেমনিভাবে যেভাবে একদিন তারা এসেছিল য়ুঙ, কুয়ান-এর দিকে। শিশুরা পরিবর্তনের খবর রাখে না কোন। তারা আগের মতই চিৎকার করে বললো—"জেলা কমিটির গাড়ি!" "প্রদেশ কমিটির গাড়ি" আসছে বলে। তারা তাড়াতাড়ি তাদের অভ্যর্থনা জানাতে রাস্তায় লাইন করে দাঁড়িয়ে গেল। কিন্তু তারা যখন দেখল কোন নামী গাড়িই য়ুঙ কুয়ানু-এ থামলো না তখন প্রচণ্ড আহত হলো ওরা। একটার পর একটা গাড়ি এমন তীব্র বেগে এগিয়ে গেল যে মনে হলো য়ুঙ কুয়ান-এ কোন সমবায় সমিতিই নেই।

চিনু ভুলে যেতে চেষ্টা করল তার সেই অন্যান্য সমবায়ের মুখের ওপর ছুঁড়ে দেওয়া প্রতিদ্বন্দ্বিতার চড়া চড়া বুলিগুলো। আর ওই "বুড়ো স্কুল মাস্টার" থাক্ যে বোকা সেজে নিজের সম্বন্ধে সমালোচনাগুলো শুনে মজা পেত, আর আজ সে ভাসছে আনন্দের সাগরে। তার সম্বন্ধেও যে সব মন্তব্য করেছিল চিনু সেগুলো সে ভুলতে চেষ্টা করল।

চিনু এত রোগা হয়ে গেছে যে লোকে দেখলে ভাববে তার খুব ভারি কোন অসুখ হয়েছে। তিক্ততার সংগে ভাবছিল সে যে তাকে আরো অপদস্থ হতে হবে। এবারে নানু নিশ্চয়ই পার্টির জমায়েতে তাকেই খাড়া করে সব কিছুর জন্যেই তাকে দোষী সাব্যস্ত করবে। যখন সে কোন গলতি করে নি তখনই নানু কত সমালোচনা করেছে আর আজ তো আর পাঁচজনের সংগে মিলে তার গায়ে সব ত্রুটিবিচ্যুতির মার্কা মেরে খুব আনন্দ পাবে।

ছয়

নানু গায়ের মুখে পেঁছিতে না পেঁছিতেই সন্ধে হয়ে গেল। সমবায়ের প্রধান কার্যালয়ের সামনে দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে নানু দেখল নুগোই দাদু ছোট্ট আলো নিয়ে প্রতিদিনের মতো চারিদিকে দেখে শুনে নিচ্ছে ভালো করে। আগামীকালের সভার কথা মনে পড়তেই নানু তার সাইকেল থামালো।

আলোটি একটু উঁচু করে তুলে বৃদ্ধ চড়া গলায় প্রশ্ন করল—"কে নানু নাকি? তুমি কি এখানে কর্মরত কোন লোককে খুঁজছ? হি বসে আছে, ও বসে রিপোর্ট তৈরি করছে।"

"না দাদু, আমি তোমাকেই খুঁজছিলাম"—হেসে উত্তর দিল নানু। "আগামীকাল এখানে বিশেষ সভার সদস্যরা একত্রে জমায়েত হবে। একটা কি দুটো বড় কেটলি চা তৈরি করে রাখবে? টেবিল চেয়ারগুলো ঠিক করা আছে তো?"

বৃদ্ধ মাথা চুলকে বললো—"মহা ঝামেলা হয়েছে। ট্যাঙ্টা একটা কুঁড়ের বাদশা! গতকাল ওর ছেলের বিয়ে গেছে তাই ও আমার কাছ থেকে টেবিল চেয়ার এমন কি জল গরম করার পাত্রটিও চেয়ে নিয়ে গেছে। ও কথা দিয়েছিল আজ সকালেই ফেরত দেবে সব কিন্তু এখনও পর্যন্ত টিকিটি দেখা নেই! যাক্ সেজন্যে ভেবো না, আমি কাল ভোরেই নিজে গিয়ে চেয়ে আনবো। সাড়ে সাতটা—আটটার আগেই সভা বসবে না তো?"

হি বাইরে বেরিয়ে এসে তাড়াতাড়ি করে এগিয়ে এলো নানু-এর কাছে। "শুভসন্ধ্যা, জেলা সমাবেশ থেকে ফিরছ? কি ভাগ্যি, আমরা অধৈর্য হয়ে তোমারই অপেক্ষা করছিলাম···তুমি না থাকলে সভা জমবে না একেবারেই।"

এই লোকটির আগামী সভার ব্যাপারে এত উৎসাহ দেখে নানু-এর খুব খারাপ লাগল। নানু নীরস গলায় বললো - "সভা জমবে না কেন? সহ-সচিব চিনু—তো নিশ্চয়ই থাকবে সভাতে।"

হি হেসে গলার স্বরটি বেশ মিষ্টি করে বললো—"তা বটে, চিনু-ও সভাপতিত্ব করতে পারে। তবে কথা হচ্ছে" ওর গলার স্বরটা ফিস্‌ফিসানিতে নেমে এলো যেন খুব গোপনীয় কথা বলতে। "তুমি তো খুব ভালো করেই জানো, তোমার চোখে তো এড়ায় না কিছুই, কমরেড চিনু এখন বিজিত মনোভাবের শিকার হয়েছে।—যা হচ্ছে হোক—এইভাবে সে কাজ চালাচ্ছে। আমি অবশ্য ওকে প্রাণবন্ত করার আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি, ও কিন্তু সারাদিন বসে বসে দীর্ঘশ্বাস ফেলে যাচ্ছে। কিন্তু যা ঘটছে তার সবকিছু ওর নির্দেশমতই হয় নি কি? কিছুদিন আগে যদি সে তার কমরেডদের কথা একটু শুনতো তাহলে আজ এই অবস্থা আমাদের হতো কি? কখনোই হতো না।"

নানু বিরক্ত হয়ে উঠল। কারুর কথা না শুনে চিনু খুবই ভুল করেছে। কিন্তু এই লোকটা তো সারাক্ষণ ছলনায় খোসামোদ করে গেছে আর আজ ওর কি অধিকার আছে চিনু-এর বিচার করার? হি ডোবাতে চাইছে চিনুকে। কিন্তু কেন? গ্রাম এবং জেলা সমবায়ের নেতা হিসেবে ও চিনুকে সরিয়ে নিজে মনোনীত হতে চাইছে, তাই না? তা হি নেতা হবার স্বপ্ন দেখুক যত খুশি! নানু কখনো এই ধরনের লোককে বিশ্বাস করবে না। এদের সঙ্গে কাজ করতে করতে চরম বিরক্তির সময়েও ও হি-কে বিশ্বাস করে তার কথায় কোন কাজ করে নি।"

নানু নীরস স্বরে বললো।—"বিশেষ সভায় আত্ম-সমালোচনা করা উচিত।"

সঙ্গে সঙ্গে হি বলে উঠলো—"নিশ্চয়ই। আর এই সমালোচনা নির্ভুল হওয়া উচিত। কারণ এভাবে যদি আমাদের নেমে যেতে হয়…"

নানু তার দিকে রাগত দৃষ্টি হেনে বললো—"আমি সমবেত আত্ম-সমালোচনার কথা বলছি! আমাদের সংগঠন ভেঙে গেছে তার জন্যে শুধু কি একজনই দায়ী? তোমার আমার করবার কিছু নেই?"

হি-কে অপদস্থ অবস্থায় দাঁড় করিয়ে রেখে চলে গেল নানু।

নুগোই মুখ বেঁকিয়ে হি-কে বললো—"কেমন, আক্কেল হয়েছে তো? এবার যাবে? দরজাটা বন্ধ করবো আমি?"